নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

সুন্দর প্রকাশন

প্রথম সংস্করণ—১লা বৈশাখ, ১৩৭০

প্রকাশক :

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী,

স্নন্দর প্রকাশন,

৮এ, কলেজ রো,

কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :

শ্রীঅজিত ঘোষ

শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী,

৬৪এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১৩

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

আর্ট সেণ্টার,

কলিকাতা—১৩

মূল্য : ১ম খণ্ড

বারো টাকা

নেতাজি ঃ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

প্রশস্তি

সুভাষ সম্পর্কে কোন লেখা হাতে এলে মনে যেমন আনন্দ হয় তেমনি একটু আশংকাও যে না হয় তা নয়। আমার জীবনে সুভাষের সঙ্গ একান্তভাবে পেয়েছিলাম, আর সুভাষের প্রসঙ্গ আমার কাছে পরম মুল্যবান। তার সম্বন্ধে কোন লেখায় যথার্থ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাব ঘটেছে মনে করলে আমি পীড়িত হই। অথচ আজ সময় এসেছে তার কথা যত বেশী লিখে রাখা যায়, তার কর্মময় জীবনের বিচিত্র তথ্য যত বেশী লিপিবদ্ধ করে রাখা যায় ততই মঙ্গল। সাধারণ মানুষের স্মরণ-শক্তি বড় দুর্বল, আমার সুদীর্ঘ জীবনকালে এ-কথা বহুবার উপলব্ধি করেছি।

"নেতাজি ঃ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ"-এ লেখক ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর নেতার ছবিটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। নেতার আদর্শের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস, ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর লেখাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সুভাষকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ লেখকের হয়েছিল। যারা সুভাষকে প্রত্যক্ষভাবে কখনো পায়নি, এই বইয়ের মাধ্যমে তারা যদি সুভাষের সঙ্গ আস্বাদ করতে পারে, যদি তার মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করতে পারে, তবে তাই হবে লেখকের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

এই বৃহৎ গ্রন্থের পরবর্তী দুটি খণ্ডে সুভাষের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে আরো প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে আশা করব।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার নিয়ে "সুন্দর প্রকাশন" দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করেছেন বলেই মনে করি। স্নেহভাজন লেখকের মত তারাও আমার আশীর্বাদার্হ।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ
১৩৭০

বাসন্তী দেবী

নবজীবনের সঙ্কটপথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম মাঝে পথ করি দিবে,—
জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী, আছে আছে।

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

'নেতাজি : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' জীবন-চরিত নয়, এ কথাটা পূর্বাহ্নেই বলে রাখা ভালো। নিবিড় ও নিগূঢ় সান্নিধ্যে এসেও সুভাষচন্দ্রের জীবনী লেখবার দুঃসাহস আমার হয়নি। যোগ্যতার অভাব তো আছেই, তা ছাড়া কোনও একক লেখকের পক্ষে এই মহাজীবনের পরিপূর্ণ আলেখ্য ফুটিয়ে তোলা আদৌ সম্ভবপর কিনা, এ চিন্তা আমাকে কম সতর্ক করেনি। বস্তুত নেতাজির জীবনের ন্যায় ঘটনাবহুল জীবন সমসাময়িক যুগে বিরল না হলেও যে স্বল্পতম, সে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

বন্ধু-বান্ধব অনেকেই নেতাজির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের খানিকটা সংবাদ রাখেন এবং এই কারণেই গত কয়েকটা বছর ধরে তাঁরা আমার জানা নেতাজির জীবন নিয়ে কিছু লিখতে উত্তেজিত করবার চেষ্টা পেয়েছেন। আমি সাড়া দিইনি,—কেননা ভেতর থেকে সাড়া আমি তখনও পাইনি।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার আমেরিকা ভ্রমণকালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। ফিরে এলে অনেকে এর কারণ জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—"শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে না ফেলি এ ভয়টা আমার ছিল"। নেতাজি সম্পর্কে এতদিন যে কিছু লিখিনি তার কারণটা ঐ। আজ যে শুরু করেছি, সেটাও নিজের ইচ্ছায় ঘটেনি। বন্ধুবর শ্রীকালী বাগচী পাশে বসে হাতে কলম গুঁজে না দিলে আজও হ'ত না।

নিছক ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রিয় স্মৃতি লিখে যাব, এই ছিল আমার প্রারম্ভিক কল্পনা। বাড়তি অংশ এসে গেল আপনা-আপনি। পুরানো খাতায় অনেক কথা লেখা ছিল, তা ছাড়া ছিল অবিস্মরণীয় স্মৃতি। আমার বিচার ও বিশ্লেষণ সকলের মনঃপূত হবে, এমন দুরাশা করবার মত মূঢ়তা আমার নেই; কিন্তু এও একটা দিক, তাতেও আমার সংশয় নেই।

সমসাময়িক লেখা ও বিবরণ দেখতে গিয়ে বিস্ময় জেগেছে প্রচুর, কিন্তু কৌতুকও আমার কম জাগেনি। ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া নামজাদা লোক, তাঁর 'কংগ্রেসের ইতিহাস' প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রথম খণ্ডে ১৯৩৪ পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্য-বিবরণী স্থান পেয়েছে। এই সময়কার সুভাষ বোস শুধু নগণ্যই নন,

কৃপারও পাত্র। কিন্তু স্বর পাল্টে গেছে দ্বিতীয় খণ্ডে। সুভাষ বোস তখন নেতাজি। লেখকও বাধ্য হয়েছেন স্বতন্ত্র হতে, নির্ভীক হতে, এবং অনেকখানি সত্যপ্রিয় হতে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলা, তৎকালীন নির্বাচন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি পণ্ডিত জহরলালের মুখ দিয়ে নেতাজি সম্পর্কে যে-সব কথা বলিয়ে ছেড়েছিল, তাদের সাময়িক মূল্য ছাড়া কোনও স্থায়ী মূল্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাবে না, এই সহজ উপলব্ধি জহরলালের ছিল। তাই তাঁর বদান্যতাও অতি-মুখরতায় উচ্ছল। কিন্তু স্থায়ী লেখায়, 'ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়ার' বহু স্থানে জহরলাল যে-সব কথা নেতাজি সম্বন্ধে স্পষ্ট করে এবং ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন,—কঠোর বা প্রগল্‌ভ বলেই সেগুলির বিরুদ্ধে মনে প্রশ্ন জাগে না, জাগে মিথ্যা বলে।

১৯২২ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগা-যোগ ছিল, এবং এর স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন ইংরেজের কাগজে-পত্রে। সম্প্রতি বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবী জীবনের অনেক স্মৃতি ও শ্রুতি প্রকাশিত হয়েছে। কার প্রেরণায় ও কার দুর্বার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সুভাষচন্দ্র বিপ্লব-ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এ সম্বন্ধে আজও পর্যাপ্ত গবেষণা সম্ভবত হয়নি। এবং কোনদিন যে হবে সে সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। প্রায় প্রত্যেকটি ভূতপূর্ব বিপ্লবী—কেউ একটু খুলে, আবার কেউ কেউ আকারে ইঙ্গিতে,—নিজের নিজের কৃতিত্বের দাবী পেশ করেছেন অকৃপণ হয়ে। ফলে গোজামিলেরও অন্ত নেই।

এদের কারও কারও লেখায় ডাঃ পট্টভির ধরন ধরা পড়েছে। ১৯৩১ থেকে নেতা বাংলার বিপ্লবীদের প্রভাবমুক্ত এবং এই কারণে এইসব স্মৃতি ও শ্রুতির কতকগুলি শুধু নেতার প্রতি নির্দয়ই নয়, পরন্তু খানিকটা জিঘাংসুও। কিন্তু পরবর্তী কালের ঘটনা যে নব ইতিহাসের সমুজ্জ্বল বর্ণ ও রেখায় অপরূপ হয়ে দেখা দিল, তাকে স্বীকার না করেও এদের গত্যন্তর ছিল না।

তবে ঢালের উল্টো পিঠও আছে, এবং আছে প্রভূত। সব ছেড়ে একটাই শুধু উল্লেখ করব। তবে সেই একটাই একশো। ১৯৩৯এ নেতা শান্তিনিকেতনে যান কবির আমন্ত্রণে। গুরুদেব যে-ভাষায় তাঁকে অভিষিক্ত করেছিলেন দেশের অধিনায়ক বলে, আমরা শিক্ষিতেরা নিশ্চয়ই সেদিন তা পড়েছিলাম; কিন্তু তার চেয়েও বড় ও বেশি নিশ্চিত তথ্য এই যে, আমরা তা ভুলে গেছি।

বাংলা দেশের হয়ে সুভাষচন্দ্রকে বরণ করে কবি সেদিন বলেছিলেন :

"গীতা বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।······বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পর, আজ, আর এক অবকাশে বাংলা দেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।"······

সুভাষ সেদিন নেতাজি হননি। শুধু নেতা। মহাকবির ধ্যান-দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রের সেই অনাগত কিন্তু অবশ্যম্ভাবী মহানায়ক রূপ ধরা পড়েছিল সেই-দিনই। আর তাই কবি অমন করে গীতার অধিনায়কের পাশাপাশি সুভাষ-চন্দ্রকে অবলীলায় বসাতে পেরেছিলেন। কবির কণ্ঠে সেই দিনই নতুন মহা-কাব্যের ভূমিকা রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল।

'নেতাজি : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' সম্ভবত তিন খণ্ডে সমাপ্ত হবে। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়-বস্তুর আলোচনা-কাল ১৯৪০এর ৩রা জুলাই থেকে ৫ই ডিসেম্বর। এই সময়ের অধিকাংশ দিন নেতার সঙ্গী ছিলাম আমি একা, এবং ছিলাম প্রেসিডেন্সি জেলে। এইখানেই দেশান্তরে যাবার পরিকল্পনা স্থির হয়েছিল।

'আজাদ হিন্দ সরকারের' প্রতিষ্ঠাতা, পরাধীন ভারতের সর্বশেষ মুক্তি-যোদ্ধা ও মুক্তিদাতা নেতাজি অকস্মাৎ মাটি ফুঁড়ে বার হননি, এই কথাটি পরিস্ফুট করতে আমাকে প্রথম খণ্ডে একটু বিশদ ও ব্যাপক হতে হয়েছে। তবু কাট-ছাট করতে হয়েছে প্রচুর। কংগ্রেস-নেতা, শ্রমিক নেতা, ছাত্র ও যুব-নেতা সুভাষের জীবন শুধু বৈচিত্র্যে ভরা এই কথাটিই যথেষ্ট নয়, সে-বৈচিত্র্যের পরিধি ও পরিমাণও অপরিমেয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আমি বরাবর 'নেতা' শব্দ ব্যবহার করেছি—নেতাজি নয়। নেতাজি শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ-জ্ঞাপক শব্দ। তাই, সুভাষ-জীবনে যখন অধিনায়কত্ব এল একটি বিশেষ দিনে, সেই দিন তিনি নেতা থেকে হলেন নেতাজি।

সঙ্ঘমাতা বাসন্তী দেবী 'নেতাজি : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ'কে আশীর্বাদ করেছেন। মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের জীবনে মাতা বাসন্তী দেবী কীভাবে এবং কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, লেখকের তা অজানা নয়। তবু, লেখকের ভাগ্যে এ আশীর্বাদ সম্ভবপর হয়েছে জেনে লেখক ধন্য ও কৃতার্থ।

'নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর' সম্পাদক স্নেহাস্পদ শ্রীশিশির বোস আমাকে

নানাভাবে সাহায্য করেছেন। অধিকাংশ ছবি দিয়েছেন তিনি এবং শান্তি-নিকেতনে তোলা অভ্যর্থনার ছবিখানা তাঁর আনুকূল্যেই পেয়েছি। ছবিখানা তুলেছেন শ্রীলি গোতামি। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র একখানা ছবির অনুকৃতি নেবার অনুমতি দেবার জন্যে ধন্যবাদার্হ।

নেতাজি-অনুরাগী অনেক বন্ধু-বান্ধব আমাকে প্রভূত উৎসাহ দিয়েছেন। এঁদের নাম আমি ইচ্ছে করেই উল্লেখ করব না। ভারত-মহানায়ক নেতাজিকে শুধু আমিই দেখিনি, দেখেছি আমরা।

ছাপার কিছু কিছু ভুল চোখে পড়েছে। খুব সম্ভব তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে এটা ঘটেছে। দুটি স্থানের ভুল সংশোধনের অপেক্ষা রাখে: ৯৭ পৃষ্ঠায় ১৯২১ এর প্রথমটা না হয়ে হবে শেষটা, আর ১৬১ পৃষ্ঠায় ১৯৪৫এর স্থানে হবে ১৯৩৫।

সবশেষে একটা কথা বলব; যাঁর সম্বন্ধে বলব, আমি জানি, তিনি অপ্রসন্ন হবেন, কিন্তু না বললে আমার অধর্ম হবে। আমার প্রথম যৌবনের সুহৃদ্ প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া 'নেতাজি: সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' পুস্তকাকারে হয়তো প্রকাশিতই হত না। কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ দেব না। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই 'সুন্দর প্রকাশনে'র প্রীতিভাজন শ্রীকালিদাস চক্রবর্তীকে। তাঁর তৎপরতা, অনুরাগ ও উদ্যোগ সত্যই উল্লেখযোগ্য। অলমিতি—

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

৪৭, নিউ বালিগঞ্জ রোড,
কলিকাতা—৩৯
১লা বৈশাখ, ১৩৭০

বম্বে মিউনিসিপ্যালিটির সম্বর্দ্ধনার পর—১৯৩৮

এক

১৯২১এর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পূর্বেই আমার হয়ে গেল কারাদণ্ড। ‘দেশের ডাকে’র ফল। ‘দেশের ডাক’ লেখবার এবং ছাপাবার পর এত তাড়াতাড়ি ডাক আসবে তা কিন্তু ভাবিনি। ১৯২৪এর প্রথমটায় পেলাম মুক্তি। শুধু একটা দিনের একটুখানি অবকাশের ভেতর সাক্ষাৎ হয়েছিল। যেদিন মুক্তি পেলাম তার পরদিন। সেটা ছিল ফেব্রুয়ারী মাস।

বহরমপুর থেকে কলকাতায় এসে উঠেছিলাম শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর বাড়ীতে। শুধু পাবনার অধিবাসী বলে নয়, যাঁদের স্নেহে ও প্রেমে নিজেকে আজও ধন্য মনে করি, শ্যামসুন্দর ছিলেন তাঁদেরি একজন। পাগল শ্যামসুন্দর। আত্মভোলা শ্যামসুন্দর। দেশের প্রেমে আকণ্ঠ ভরপুর শ্যামসুন্দর।

খর্বাকৃতি শিশুর মত এই মানুষটির চরিত্র এক বিচিত্র উপাদানে তৈরী ছিল। পাণ্ডিত্যের একটা বিরাট বোঝা মাথায় করে ঘুরে বেড়াতেন পথে পথে। খোলা গা, পায়ে থাকত ছেঁড়া চটি ; কখনও-বা নগ্ন। তৈলবিহীন অযত্নবিন্যস্ত ঝাঁকড়া চুলের রাশি ঝুলে পড়ত কপালে, কাঁধে, কানের পাশে। মুখ-ভরা কাঁচা-পাকা দাড়ি। দূর থেকে দেখলে মনে হত কার্ল্ মার্ক্স্। ওঁর কাগজ ‘সার্ভান্টের’ তখন শেষ দশা।

দুপুরবেলা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। সোজা ‘ফরোয়ার্ড’ আফিসে। দেখা হল উপেনদার সঙ্গে দোরগোড়ায়। উপেন বাঁড়ুজ্যে—অগ্নি-যুগের উপেনদা।

না জানিয়েই ঘরে ঢুকে পড়লাম। শব্দ শুনে মাথাটা উঁচু করে একবার তাকালেন। ঠোঁটের কোণে ফুটতে-চাওয়া হাসিটা চেপে ঘাড়

গুঁজে আবার ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। লিখছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম। দেখছিলাম আর নিঃশব্দে হাসছিলাম।

কী সুন্দরই না লাগছিল সেই ভঙ্গীটি। সুকুমার অবয়বের সবটা জুড়ে ফুটে উঠেছে একটা ব্যক্তিত্বের ছায়া। কায়া ধরেনি তখনও। কিন্তু বাকিও নেই যেন। টাক পড়েনি—উদ্যোগপর্ব চলছে। চাপতে-চাওয়া মনের খুশি ছড়িয়ে দিয়েছে সারা মুখে রক্তের ছোপ। অপরূপ হয়ে উঠেছে মুখখানা।

মস্ত বড় সেক্রেটারিয়েট্ টেব্‌ল্। নিখুঁত তার সজ্জা। দোয়াত-দানি আর কলম, বই আর সাময়িক দু-একখানা পত্রিকা—সব সাজানো। ওর কোনটাই সরানো চলে না। সরালে সজ্জা ভেঙ্গে যাবে। ছন্দের পতন হলে কবিতার থাকল কী?

"খেয়ে এসেছেন জানি। চা চলবে?"

চাএর ট্রে হাতে ধরে বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল। একটা কাপ আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে আবার বললেন,—"কেন, গাড়ী স্টেশনে যায়নি?"

"গিয়েছিল। শ্যামবাবুর হাত এড়াতে পারলাম না যে। তা ছাড়া—"

"জানি।"

সেটা ছিল 'নো-চেঞ্জার' আর 'প্রো-চেঞ্জারে'র ধস্তাধ্বস্তির যুগ। দেশবন্ধু ছিলেন পরিবর্তন-পন্থী। বরদলীর পর আর যে গান্ধী-মত পুরোপুরি চালানো যাবে না, দেশ গ্রহণ করতে চাইবে না, এটা দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। গান্ধীজির পরিকল্পিত সর্বাঙ্গীন অসহযোগের পরীক্ষা হবার সুযোগ আর যে আসবে না—আর কেউ সেটা বুঝতে না পারলেও দেশবন্ধু বুঝেছিলেন।

সর্বাঙ্গীন অসহযোগের ভেতরকার বিপ্লবী পরিকল্পনা গান্ধীজি করে-ছিলেন তত্ত্বের দিক থেকে। আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। আফ্রিকার সাফল্য তাঁকে উৎসাহিত করেছিল, প্রেরণাও যুগিয়েছিল। কিন্তু আফ্রিকা আর ভারতবর্ষের পার্থক্য সেদিন গান্ধীজির চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

উঠল বরদলীর পর। কিন্তু ততক্ষণে গান্ধীজির প্রারম্ভিক চেতনা-দীপ্তি স্তিমিত হয়ে এসেছে। গান্ধীজি আর তাঁর মত বেঁচে থাকল দৈবাৎ ইংরেজের বোকামিতে। ইংরেজ গান্ধীজিকে জীবন্ত করে রাখল তাঁকে কারাদণ্ড দিয়ে।

শ্যামসুন্দর ছিলেন গান্ধী-পন্থী। তাঁর হাত এড়িয়ে সুভাষ বোসের বাড়ী এলে তিনি আর আমার মুখদর্শনই হয়তো করতেন না। বামুনে মেজাজ ছিল শ্যামবাবুর পুরোপুরি। রাগলে বস্ত্র কটি-চ্যুত হয়ে পড়ত বার বার।

বাড়ী গেলাম একদিন বাদে। ২৫শে অক্টোবর নেতাকে ধরে নিয়ে গেল ইংরেজের পুলিশে। মুক্তি পেলেন ১৯২৭এ। '২৭ থেকে '২৯,—ছেঁড়া আর টুকরো ঘটনার অভাব নেই আমার খাতায়। মাঝে মাঝে বলব পরে।

১৯২৯। এক বিশেষ দিনে আর বিশেষ ক্ষণে এই বছরটি নেতার জীবনে দেখা দিয়েছিল।

১৯২৭এর ১৫ই মে নেতা মুক্তি পান। ১৯২৪এর সুভাষ, আর ১৯২৭এর সুভাষ সম্পূর্ণ আলাদা। পার্থক্য স্পষ্ট—প্রত্যক্ষ। অগ্নিশুদ্ধ হয়ে এসেছেন নেতা। উগ্র তপস্যায় দেহ হয়েছে বিশীর্ণ। মন তীক্ষ্ণ। পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণের শক্তি ফুটে উঠেছে মুখে চোখে সর্বাঙ্গে।

দলগত প্রভাব অতিক্রম করবার শক্তি এসেছে। স্বাতন্ত্র্য-বোধ ফুটে উঠেছে চিন্তার স্তরে স্তরে। কর্মী সুভাষ, দেশভক্ত সুভাষ, বৈরাগী সুভাষকে ডাকছে নেতৃত্বের আসন। বাংলার নেতৃত্ব—সর্বভারতীয় নেতৃত্ব।

চিন্তা অতিমানস-লোক থেকে ধ্যানের আলো খুঁজে পেয়েছে। আর অস্পষ্ট নয়, কুয়াশা নয়, এলোমেলো নয়—স্পষ্ট, সুসংবদ্ধ, গভীর। পারম্পর্যের সূত্রে গাঁথা দিব্য লক্ষ্য। আদর্শে সমুজ্জ্বল, বিশ্বাসে অটল। নিশ্চয়তায় অবশ্যম্ভাবী।

নেতা ও গুরু দেশবন্ধু নেই। যাঁর নিশ্চিন্ত ছত্রছায়ায় অকুণ্ঠ আজ্ঞাবহতাই ছিল জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য, তারই পরিণতির রূপ নিয়ে যে অমোঘ দায়িত্ব নির্বিশেষ ও অনিবার্য হয়ে দেখা দিল অজানা ভবিষ্যতের বিপুল ও বিঘ্নসঙ্কুল যাত্রাপথে,—হোক সে বন্ধুর, হোক সে ক্ষুরধার—নিঃসংশয় নিশ্চয়তায় তাকে বরণ করা ছাড়া আর কি কোন পথ ছিল? দেশবন্ধু নেই, কিন্তু তাঁর ধ্যানগম্ভীর প্রজ্ঞা! তাঁর তপোশুদ্ধ অন্তরের চিরকাম্য ও চিরপূজ্য বাংলার শ্যামস্নিগ্ধ পেলব রূপ! তাঁর মা ও জননীর সেই স্বপ্নভরা অপরিম্লান দিব্য ছবি!

সুভাষ সভাপতি হলেন বাংলা কংগ্রেসের। আর একই দিনে নেতা।

নিশ্চিন্ত ব্যক্তি-জীবনের শত প্রলোভন পেছন থেকে ডাকে বৈকি। ডাকে সংসার, ডাকে গৃহ, পরিবার, ডাকে সুখ, শান্তি, পারিপার্শ্বিক স্বপ্ন। কিন্তু এর চেয়েও বৃহৎ, মহৎ ও নৈর্ব্যক্তিক আকুতি তার অজস্র উপচার হাতে করে মনের প্রত্যন্তসীমায় যে অপরূপ রহস্য আর অনবদ্য মাধুর্য নিয়ে ধরা দিল, তাকে তিনি উপেক্ষা করবেন কেমন করে? অতীত মুছে গেল। পেছনে পড়ে থাকল শবের স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে। আদর্শ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল কঠিন, রূঢ়, আর তার তাপসী মহিমা নিয়ে।

নিজে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু যারা রইল কারাগারের কালো গর্ভে পড়ে, তাদের কথা কি ভোলা যায়? ১৯২১এর আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেছে। ব্যর্থ হয়েছে কত কল্পনা—কত আশা। ব্যর্থতার ছিন্ন সূত্রই-না জোড়া লাগাতে হবে! জুড়ে জুড়ে গড়ে তুলতে হবে এক নতুন মালা। সেই মালায় গাঁথা থাকবে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা আর অভীষ্ট। কিন্তু কাদের নিয়ে এই বিপুল দায়িত্ব তিনি মাথা পেতে নেবেন?

মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুললেন সুভাষ। সভায় মিছিলে দেশ ভরে উঠল।

১৯২৮এর কংগ্রেসে নেতা তুলেছিলেন সর্তবিহীন স্বাধীনতার

প্রস্তাব। আপোষ-বিশ্বাসীরা সে-প্রস্তাবে সায় দেয়নি—সমর্থন তাঁকে করেনি। কিন্তু ১৯২৯?

১৯২৮এ তিনি হেরে গেলেন। কিন্তু সহসা পরাজয়ের সকল গ্লানি ছাপিয়ে যে গর্ব আর গৌরবের অতুল্য অজস্র ধারা জাতির প্রাণ-গঙ্গায় নতুন রূপ নিয়ে ছুটে আসছে, তাকে রুখবে কে?—ভাসিয়ে দেবে না? হোক সে ঐরাবত, হোক সে অচলায়তন হিমাচলের তুঙ্গশৃঙ্গ,—দিশাহারা উন্মাদিনী জাহ্নবী কি কোনদিন তাকে স্বীকার করে নেবে?

না। নেবে না—নেয়নি। দেশের বুকে দিকে দিকে মত্ত মাতন দোলা দিল। কাল-বৈশাখীর সূচনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গাজনের দল। নেতা নয়—দেশ এগিয়ে চলে নেতার আগে।

গান্ধী দেখেন। আর দেখে ইংরেজ। দেখে দেশকে। দেখে দেশের বুকে নবাগত একটি মানুষকে, দেখে একটি আবির্ভাবকে।

লক্ষ্য করে চলেন গান্ধীজি। গান্ধী জানতেন, তাঁর ডাকের প্রত্যাশায় জাতি চিরকাল প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে না। সদ্য ঘুম-ভাঙ্গা জাতি এগিয়ে যেতে চাইছে। এর সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে তিনি তলিয়ে যাবেন, ভেসে যাবেন, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। যেমন গেছেন সুরেন্দ্রনাথ, বেসান্ত আর মেটা-রা।

কিন্তু গান্ধী সুরেন্দ্রনাথ ন'ন, বেসান্ত কিংবা মেটাও ন'ন। গান্ধী গান্ধীই।

গান্ধী লক্ষ্য করে চলেন সুভাষকে।

ওঁকে বাঁধবার প্রলোভন আসে শতমুখী হয়ে। কংগ্রেসের সম্পাদক, তার সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য-পদ। একান্ত বর্তমান, আর অনাগত ভবিষ্যৎ দেয় হাতছানি। আসে অতুল্য সম্ভাবনা। আসে সীমাহীন বাস্তব প্রাপ্তির আমন্ত্রণ। আসে গান্ধীর কাছ থেকে। ভারতবর্ষের মুকুটহীন সম্রাট গান্ধী।

সাধক ঐশ্বর্য চায় না, চায় সিদ্ধি। সুভাষ এগিয়ে চলেন।

গান্ধী সুভাষকে পেলেন না। তাই সুভাষের সমকক্ষ আর এক-জনকে তিনি চাইছিলেন। সুভাষের মতোই যাঁর দ্যুতি আছে, প্রখরতা, আছে, আর আছে দুর্নিবার আকর্ষণ—জহরলাল নেহেরু।

১৯২৯-এ জহরলাল গান্ধীজির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন—করলেন লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিত্বের বিনিময়ে। আর এই কংগ্রেসেই সেই স্বাধীনতার প্রস্তাব গান্ধীজি নিজে উপস্থাপিত করলেন, এবং তা গৃহীতও হল, যে-প্রস্তাব এক বৎসর পূর্বে গান্ধীজির ছিল ধারণা-বহির্ভূত।

তন্দ্রা-ভাঙ্গা জাতি পূর্ণ-স্বাধীনতা চাইবেই। তার এই দুর্নিবার চাওয়ার গতি রোধ করা সম্ভবপর নয়, এ-কথা গান্ধী বুঝেছিলেন। তাই এমন একজনের মারফৎ সে-চাওয়াকে তিনি স্বীকার করে নিলেন যার কাছে আর যে-কোনও আশঙ্কাই থাক, তাঁকে অতিক্রম করে যাবার আশঙ্কা নেই। লাহোরে গান্ধীজি জহরলালকে টেনে আনলেন নিজের অন্তরঙ্গ চক্রের অতি নিকটে, আর হারালেন সুভাষকে।

নতুন ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষের স্থান হল না।

না হোক। ওয়ার্কিং কমিটির চাইতেও কংগ্রেস বড়। কংগ্রেসের চাইতেও দেশ বড়। আর সেই দেশের স্বাধীনতা সবচেয়ে বড়। গান্ধীজি তাঁকে ত্যাগ করুন, কংগ্রেস ত্যাগ করুক—কিন্তু দেশ? তাঁর জাতি?

মেতে উঠলেন নেতা, আর মেতে উঠল সমগ্র দেশ। ডাকের পর ডাক আসে,—পাঞ্জাবের ডাক, মহারাষ্ট্রের ডাক—তরুণের ডাক, নও-জোয়ানের ডাক।(১) তিনি বলে চলেন,—ওঁরা বিজ্ঞ, ওঁরা বিচক্ষণ।

---

(১) ১৯২৯এর একটা বছরে সুভাষচন্দ্র বহু সভা ও সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন। ফেব্রুয়ারী মাসে পাবনা যুব-সম্মেলন, ৩০শে মার্চ রংপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, ২২শে জুন যশোহর-খুলনা যুব-সম্মেলন, ২১শে জুলাই হুগলী জেলা ছাত্র-সম্মেলন, ১৯শে অক্টোবর পাঞ্জাব ছাত্র-সম্মেলন, ১লা ডিসেম্বর অমরাবতী ছাত্র-সম্মেলন, ২৯শে ডিসেম্বর মেদিনীপুর যুব-সম্মেলন এবং এই বছরেই চট্টগ্রাম জেলা-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

আমি আর আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের সর্বস্ব ওঁদের পায়ে বিলিয়ে দিলেই কি ব্রত সমাধা হবে? I do not believe in surrendering our judgment to older politicians.

ঠিক দু'মাস আগের কথা। ডিসেম্বর মাসে হল কংগ্রেসের অধিবেশন। তারই আগের অক্টোবর, ৩১শে অক্টোবর। বড়লাট আরউইন ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের আশ্বাস-ঘোষণা প্রচার করেছেন এক ইস্তাহারে। এই ঘোষণায় নাকি ইংরেজের সদিচ্ছার প্রমাণ ফুটে উঠেছে। ওঁরা—বড়রা পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন। খুশিতে গদগদ হয়ে তারিফ করেছিলেন ইংরেজের রাজ-প্রতিনিধিকে। আর এই তারিফের বার্তায় যাঁরা সেদিন সই করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জহরলালও।

নেতা সই করেননি। শুধু তাই নয়, উল্টো-ঘোষণায় এই আপোষী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তারস্বরে। ইংরেজের আশ্বাসে প্রলুব্ধ না হতে সাবধান করেছিলেন। দু'মাস পরে পূর্ণ-স্বাধীনতার মহান ঘোষণা যে-জাতি বিশ্বের দরবারে পেশ করবে, তার মুখে আপোষের কথা কেন? তার হয়ে এই বিজ্ঞ আর বড়দের এমন করে জাতির মর্মবাণীর বিকৃত ও বিকলাঙ্গ ঘোষণার অধিকার দিলই-বা কে?(১)

প্রবুদ্ধ জনমত চাপা দেবার জন্যে পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলেই যে ইংরেজের সঙ্গে আপোষের সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে না, এ-কথা সেদিনকার নেতারা জানতেন। সেদিন তাঁরা প্রস্তাবটাকেই শুধু দায়ে পড়ে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, পূর্ণ-স্বাধীনতার কামনাকে নয়। তাই লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হবার পরমুহূর্তেই মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি প্রচার করে সকল দুশ্চিন্তার

---

(১) সুভাষচন্দ্রের পাল্টা ঘোষণা-পত্র :৮ই নভেম্বর, ১৯২৯, প্রকাশিত হয়।

অবসান ঘটিয়ে দিলেন এই বলে যে, প্রস্তাবটা কংগ্রেসের আদর্শমাত্র। মোদ্দা কথা স্বায়ত্ত-শাসন পেলেই তিনি ও তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন।

লাহোর-কংগ্রেসের প্রাক্কালে গান্ধীজি, বড় প্যাটেল ও মতিলাল বড়লাট আরউইনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আর বলেছিলেন তাঁদের প্রাণের কথা, কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরেও এসেছিলেন। সহসা বাজ ভেঙ্গে পড়ল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে। বড়লাটের ট্রেন ডিনামাইটে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য সফল হয়নি। দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। শঙ্কা আর উদ্বেগের কালো ছায়া পড়ল নেতাদের মুখে চোখে আর বুকের অন্তঃস্থলে। পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাবের সঙ্গে আর একটি প্রস্তাব জুড়ে দেওয়া হল। দৈবের অভয় দাক্ষিণ্যে বড়লাট প্রাণে বেঁচে গেছেন,—সমগ্র দেশ তথা কংগ্রেস আনন্দ আর স্বস্তির অদম্য উচ্ছ্বাস চেপে থাকবে কেমন করে ?(১)

আরউইন সেদিন প্রাণে বেঁচে গেলেন। প্রাণে বেঁচে গেলেন আর একটি প্রাণ নেবার জন্যে—যতীন দাসের প্রাণ। কিন্তু তার পূর্বেই ইংরেজ গ্রেপ্তার করল সুভাষচন্দ্রকে। সেটা ছিল আগষ্ট মাস।

যতীন দাসের মৃত্যু হল ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে। মরণজয়ী যতীন দাস, পূর্ণ তেষট্টি দিন ধরে যে-যতীন দাস মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছে। সুভাষ-সঙ্গী যতীন দাস।

সেদিনের কথা ভোলবার নয়। জামিনে নেতা বাইরে এসেছেন। যতীনের মৃত্যু-সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা মানুষটার রূপ আমূল পাল্টে গেল। পাংশু মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, আর তার কোণে টলমল করছে অশ্রুর ফোঁটা। একটা অসহ্য বেদনায় ঠোঁট দু'খানা বেঁকে গেল। নেতা কেঁদে উঠলেন। শিশুর মতো ফুলে ফুলে সে কী কান্না !

স্মৃতি-তর্পণ হল টাউন হলে। হল ভরে, সিঁড়ি ভরে উপচে পড়ল জনতা রাস্তায়, মাঠে, অনেক দূরে। সভাশেষে নেতার সঙ্গে

(১) ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্, ১৯২১ থেকে ১৯৩৪, ২৪১ পৃঃ

গেলাম উড্‌বার্ন পার্কের বাড়ীতে। সারাদিন ত্ব’জনেই উপোসী ছিলাম। উপোস তখনও ভাঙ্গা হল না। নেতা বললেন,—

“সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাড়ী এসে গেছেন। ওঁর ওখানে তুমি যাও। বরিশালে যেতে হবে। সতীনবাবুও বোধ হয় চললেন। সেনগুপ্ত যেতে পারবেন কি না জেনে এস।”

বরিশালের সতীন সেন প্রায়োপবেশন করছিলেন। একটানা উপোস চলছে কুড়ি-পঁচিশ দিনের ওপর। জেলের ভেতর থেকে দিনের পর দিন উদ্বেগজনক সংবাদ আসছে। দেহ নির্জীব হয়ে পড়েছে। কিড্‌নির দোষ ধরা পড়েছে। সঙ্গে অনিদ্রা। আরও অনেক উপসর্গ দেখা দিয়েছে। জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা হয়েছিল—সফল হয়নি। খাবার পেটে ঢোকাবার পরই উগ্‌রে ফেলছেন।

ঘরে আর ঢোকা হল না। গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলাম সোজা সেনগুপ্তের বাড়ী। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন থাকতেন এল্‌গিন রোডের একতলার একটা ফ্লাটে। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম ১৯২৪এর মাঝামাঝি। তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহের তখন পুরো মরশুম। প্রায়ই দেশবন্ধুর সঙ্গে সভায় যেতাম। দেশবন্ধুর প্রায় সব সভাতেই সেনগুপ্ত উপস্থিত থাকতেন। এমনি একটা সভায় পরিচয় হয় প্রথম।

ঘনিষ্ঠতা ক্রমে তর উৎরে তমে গিয়ে উঠল বীরভূমে ১৯২৭এর নির্বাচন-উপলক্ষে। উভয়েই অধ্যাপক জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন-সাহায্যে বীরভূম গিয়েছিলাম। এরপর ১৯৩২এ আলিপুর জেলে সেই পরিচয়ের পূর্ণতা ঘটে। কত ত্বঃখ ও বেদনার ভেতর দিয়ে এই মানুষটির সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম, সব বলবার স্থান এটা নয়। কিন্তু একটা সহজ অনাড়ম্বর সৌহার্দ্যের যে নিবিড় সম্পর্ক আপনা-আপনি গড়ে উঠেছিল তার স্মৃতি ভোলবারও নয়।

তবু একটু বলি। ত্ব’জনায় রামপুরহাট গেছি। জিতেনবাবুর অন্দর-মহলে খেতে বসেছি পাশাপাশি। ভুরি-ভোজনের বিপুল আয়োজন ছিল, এ-কথাটা বলবার মতো কিছু নয়। কিন্তু সব উপকরণ ছাপিয়ে

একটার ওপরেই সেনগুপ্তের নজর পড়ছিল ঘন ঘন। বেশ বড় বাটি-ভরা ঘন আটা দুধ, আর পাশে একখানা রেকাবিতে দুটো করে খোসা-ছাড়ানো মর্তমান কলা, বেশ পুরুষ্টু। সামনে বসে জিতেনবাবুর ভাইঝি শ্রীমতী চারু দেবী। ইনিও একদা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বলা যায় না এমন একটা অস্বস্তি সেনগুপ্তের মুখে আর চোখে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল। এদিকে ভোজনপর্বের শেষও আসন্ন। না বলেই-বা থাকা যায় কতক্ষণ! সেনগুপ্ত ফিস্ ফিস্ করে বললেন,—

"এই মশাই, আপনিও তো বাঙাল ?"

"তা আর বলতে !" জবাব দিলাম আমি।

"কলা দুধ চটকে ভাত মেখে খেতে বড্ড ইচ্ছে করছে—যেমন খেতাম দেশের বাড়ীতে।"

"আটকাচ্ছে কোথায় ?"

"কিন্তু ওঁরা কী ভাববেন ?"

"শুরু করুন, আমি আছি সঙ্গে।"

সঙ্গে সঙ্গে বাটিটা থালার ওপর সটান উঠে এলো। কব্জি ডুবিয়ে বড় বড় থাবায় সেই খাওয়া—আজও ভুলতে পারিনে। বাঙালী হয়েও বাংলার নিজস্ব রুচি আর আচার চেপে চেপে থাকতে হত ওঁকে। কিন্তু বুভুক্ষু বাঙালী-অন্তর নিভৃতে ওঁর কাঁদত।

বসবার ঘরেই সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা হল। সবে এসেছেন সভা থেকে। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন,—

"আবার কী মনে করে এখুনি ? উপোস ভেঙ্গেছেন ? না ? ব্যস্—নেলী—"

"আরে আরে থামুন তো।" বাধা দিয়ে উঠলাম, বললাম,—"এখনও চান করিনি। খেতে পারব না।"

"চমৎকার লেডিকেনি আছে ঘরে। জমবে ভালো—" সঙ্গে সঙ্গে

সেই ঘর-কাঁপানো হাসি। উদার, উন্মুক্ত, দরাজ হাসি। সব বললাম ওঁকে। শুনে বললেন,—"সুভাষ তো যাবেনই। আবার আমায় কেন?"

রাজী করিয়ে ফিরে এলাম।

খুলনা পর্যন্ত ট্রেনে। তারপর ষ্টীমার। রাত হয়েছে। চা খেয়ে সেনগুপ্ত নিজের কামরায় ঢুকেছেন। আমরা দু'জনায় ডেকে। অন্ধকার রাত্রি। ডেকের আলোটা মিট্ মিট্ করছে। বসে আছি নিঃশব্দে অনেকক্ষণ। একটা চাপা নিশ্বাস নেতার বুক থেকে বেরিয়ে এল। ফিরে তাকালাম ওঁর দিকে। থম্থমে মুখখানা। যাদুমাখা চোখদুটির কোণে চিন্তার ছায়া।—চেয়ে আছেন সামনে। দৃষ্টি চলে গেছে দূরে, অনেক দূরে।

ভাবছিলাম এই মানুষটির কথা। কত মানুষই-না দেখলাম। কত বড় মানুষ। নামকরা, নামজাদা। আর সকলের সঙ্গে এই মানুষটির কতই-না পার্থক্য। সবারই ঘর আছে, সংসার আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে। কিন্তু এঁর? কিছু নেই, কেউ নেই, নিজের বলতে ছিটেফোটাও না।

অতীত চোখের সামনে রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। ফুটে ওঠে ছবির পর ছবি। কিশোর সুভাষ। পেলব কচি মুখখানায় শিশুর সারল্য, আর কমণীয় অবয়ব। সেই রূপ নিয়ে ছুটে চলেছে পাহাড়ে জঙ্গলে গুহায় আর মন্দিরে।

কিশোর বৈরাগী খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর। যার স্পর্শে সব-কিছু হয়ে উঠবে সোনা, উজ্জ্বল, অমূল্য। দুঃস্থ দেশ, পরাধীন দেশ, প্রাণহীন দেশ। শক্তির উদ্বোধন চাই। তবেই-না হবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। জড়ের কি মুক্তি আছে? কিন্তু জড়ও যে চেতন হয়ে ওঠে চৈতন্যের ছোঁয়াচ লেগে। মাটি-কাঠ-খড় সব হয়ে ওঠে চৈতন্যময়।

কিন্তু কে দেবে এনে এই চেতনা? কে সেই গুরু? নায়ক?

পাতি পাতি করে খোঁজে। গুহা খোঁজে, পাহাড় জঙ্গল আর মন্দির খোঁজে, পায় না। তবু খোঁজে, থামে না।

তারপর একদিন ধরা দেয় অ-ধরা। জানা যায় অজানাকে। আর কোথাও নেই সেই দুর্লভ পরশ-পাথর। আছে সে নিজের ভেতর, আত্ম-পুরুষ। ফুটে ওঠে বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস। কিশোর সরে যায়, এগিয়ে আসে যৌবন। সৃষ্টির দ্যোতক যৌবন, শক্তির পরম আধার যৌবন। ফুটে ওঠে প্রত্যয়। সম্মুখে জীবন্ত হয়ে দেখা দেয় সঙ্কল্প। পূজা হয় শুরু। মানুষের খোলস পরিত্যাগ করে প্রকাশ হয়ে পড়ে অনিন্দ্যসুন্দর ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি আমারই সম্মুখে।(১)

সহসা বলে ওঠেন নেতা,—"আচ্ছা গান্ধীজির সঙ্গে আর কতদিন চলতে পারব মনে হয় তোমার ?"

"সেটা চলতে যাবার সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে।" বললাম আমি। আমার কথার খোঁচাটুকু তিনি খেয়ালও করলেন না, বলেই চললেন,—"সত্যি, আমি ওঁকে ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে। দূর থেকে ওঁর কথা শুনে বেশ লাগে। কিন্তু কাছে গিয়ে যখন খুঁটিয়ে বুঝতে চাই—"

"ওটা শাস্ত্রে নিষেধ।"

"কী ?"

"মহাপুরুষের কাছে বেশি যাওয়া !"

"যাঃ !"

"সত্যিই। বেশি কাছে গেলে ওঁদের চোখ-ধাঁধানো রোশনাই চোখে সয়ে যায় কিনা।"

আর কথা নেই। নিশ্চল দেহ। অনেকক্ষণ পরে বললেন,—"কী জানো, গান্ধীজির জীবনে রয়েছে একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব। দেশকে উনি যথেষ্টই ভালোবাসেন, কিন্তু আমার মনে হয়, নিজেকে উনি ভালো-বাসেন আরও ঢের বেশি !"

(১) জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে আমাকে নিজে। নইলে আর কে করবে ?—এ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম, ১০৯ পৃঃ

"কথাটা আপত্তিজনক, আর যথেষ্ট কিন্তু মোলায়েমও নয়।" বললাম আমি।

"না। আমিও জানি তা। ওঁর জীবনে কতকগুলি পরীক্ষা ও নিরীক্ষা আজ বড় হয়ে উঠেছে দেশকেও ছাপিয়ে।"

ভোর হয়ে আসছে। জলে-ধোয়া ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগছে। কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে, ডেকে। পূবের দিকে ফর্সা হয়ে আসছে। সম্মুখে শুকতারা, জ্বলজ্বলে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি। চোখ দুটো দু'হাতে ডলতে ডলতে কাছে এসে দাঁড়ালেন নেতা। ঠোঁটে ফুটে উঠল একটুকরো মিষ্টি হাসি। আমি বললাম,—

"ঘুম হয়েছিল ?"

"বেশ ঘুমিয়েছি।"

"বরিশালের ঘাট দেখা যাচ্ছে।"

"এসে গেছি ?"

"হ্যাঁ। বরিশালের ঘাট বড় সুন্দর। বাংলার আর কোথাও এমনটি নেই !"

"তাই নাকি ?"

ষ্টীমারের ভেঁপু বেজে উঠল।

আমরা চুপ।

একদিন বাদেই সেনগুপ্ত ফিরে এলেন কলকাতায়। আমরা থাকলাম, নেতা আর আমি।

নেতা দেখা করলেন সতীনবাবুর সঙ্গে। নেতার কাছে সতীনবাবু কথা দিয়েছেন যে, তিনি উপোস ভাঙ্গবেন তখনি যখন বরিশালবাসী তাঁর সঙ্কল্প নিজেদের সঙ্কল্প বলে গ্রহণ করবে।

সভা হল। টাকা আর মেয়েদের গায়ের গয়নায় কোঁচর ভরে উঠল। এ্যাক্‌সন কমিটি গঠন করে আর বরিশালে আমাকে রেখে নেতা ফিরে চললেন কলকাতায়।

তিনদিনের মাথায় সন্ধ্যার পর নেতাকে তুলে দিয়ে এলাম ষ্টীমারে। পথে গাড়ীর ভেতর বললেন নেতা,—

"চেষ্টা ক'রো সতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। সামনে সংগ্রাম আসছে। জেলের মধ্যে বসে থাকা কিংবা মরবার সময় নয় এটা।"

"সংগ্রাম কি সত্যিই আসবে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"আসবে না? মুখ বাঁচাতেই গান্ধীজিকে কিছু করতে হবে। তা ছাড়া—" থেমে গেলেন নেতা। আবার বললেন,—"গান্ধীজি না করলেও দেশ বসে থাকবে না।"

ঘাটে পৌঁছে গেলাম। আলো-ভরা ঘাট। ঘাসে ঢাকা নদীর তটভূমি নীচু হয়ে মিশেছে স্বচ্ছ জলে। পাড়ের উপর বড় বড় ঝাউ-গাছের সারি। হাওয়ায় শব্দ ওঠে শোঁ শোঁ। জলে পড়ে আলোর ছায়া।

কামরায় বাক্স-বিছানা রাখবার পর এসে দাঁড়ালাম ডেকে। নেতা বললেন,—"দরকার হলে যাবে বৈকি। কিন্তু গলা বাড়িয়ে জেলে ঢুকো না। ইংরেজের জেলে নির্বিবাদে বাস করা আমাদের লক্ষ্য নয়।"

একটু থামলেন নেতা। আবার বললেন,—

"ভয় ভাঙ্গবার জন্যে ওটার দরকার ছিল। কিন্তু ও-অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। নেতিবাচক সংগ্রামেরও (negative fight)। ধোঁয়া নয়, স্পষ্ট করে আজ বলবার দিন এসেছে যে, ইংরেজকে এ-দেশ ছাড়তে হবে।"

বাঁশি বেজে উঠল। বিদায় নিয়ে নেমে এলাম। খানিকটা ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ষ্টীমার চলতে শুরু করেছে। নেতা রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, চেয়ে আছেন অপলকে।

দুই

বাইরের কাঠামোটাই লোকে দেখে, সৌধেরও ওপরটা। মাটির তলায় যেটা থাকল পড়ে থেঁৎলে-যাওয়া জমাট দেহ নিয়ে—সেটা আর কার চোখেই-বা পড়ল, পড়ল না। পড়েও না। ঐশ্বর্য আর উপচারের অপরিমেয়তা নিয়ে দেখা দেয় বাইরের ফুটন্ত রূপসম্ভার। মানুষ তাকেই দেখে, বিচার করে।

সুভাষ বোস একদিনে বড় হননি। কত তন্দ্রাহীন পীড়িত নিমেষ রয়েছে ঐ জীবনের পেছনে নীরব হয়ে প'ড়ে। তাকে কেউই দেখল না, জানলও না। তাই যখন ১৯২৯এর সুভাষ দেশের বুকে ফুটে উঠলেন একটা প্রদীপ্ত ব্যক্তি-প্রভা নিয়ে, লোকে আকস্মিকতায় চমকে উঠল।

১৯২৯ থেকে যে-সুভাষ দেখা দিলেন গান্ধীবাদের বিপরীতধর্মী রূপে, তার গোড়া-পত্তন হয়েছিল ১৯২৮এ, কলকাতা কংগ্রেসে। কিন্তু এই সুভাষ বোসেরও ভুল হয়েছিল। মুহূর্তের জন্যে হলেও প্রাণে জেগে-ছিল দুর্বলতা।

১৯২৮এর কংগ্রেস। এই কংগ্রেসেই নেতা অনাগত আজাদ হিন্দের কল্প-বোনেদ রচনা করেছিলেন তাঁর স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অতুল্য ও অসাধারণ গঠন-শক্তির ভেতর দিয়ে। এই কংগ্রেসেই নেতা জাতীয় পতাকার স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন অশোক-চক্র ভিত্তি করে। আর এই কংগ্রেসেই নেতা জাতির লক্ষ্য ও আদর্শ নির্ধারণ করতে গিয়ে জীবনের প্রথম—আর সেই শেষ—অন্যের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের আগের দিন। ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসেছে। সভায় নেহেরু কন্‌ষ্টিটুশ্যান পেশ করা হল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভা-পতিত্বে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ-শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছিল। এবং এর

মুখ্য আদর্শ ছিল ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্। আর তারই জন্যে ইংরেজের কাছে আবেদন। কমিটির অন্যান্য সভ্যের সঙ্গে সেদিন সুভাষচন্দ্রও নেহেরু কমিটির রিপোর্ট সই করেছিলেন।

সভাশেষে নেতা ফিরে এলেন নিজের শিবিরে। অগুণতি সহকর্মী সেখানে অপেক্ষা করছিল। তুমুল আলোচনা হল। বিচার হল প্রস্তাবের। গান্ধীজি স্বয়ং প্রস্তাবক, আর মতিলাল আজাদ সবাই ঐ দাবী সমর্থন করেছিলেন—মায় জহরলাল পর্যন্ত।

গভীর রাত্রি। প্রত্যূষের বাকি নেই। বাঙলার নেতা সুভাষ উঠে দাঁড়ালেন সহকর্মীদের সম্মুখে—মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন নিজের ভুল। ঢাকবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করলেন না নিজের দুর্বলতা।

জীবনে এই প্রথম হয়তো মোহ জেগেছিল, ক্ষণিকের মোহ। বৃহৎ আর মহৎ নেতৃত্বের সম্মুখে হয়তো সেদিন দ্বিধাও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সকল দ্বিধা, বাধা আর দুর্বলতা কাটিয়ে স্বরূপ প্রকাশ পেতে সময়ও লাগল না একটু। কণ্ঠ কাঁপল না, চরণ টলল না। অকুতোভয় যৌবন দৃঢ় পায়ে দাঁড়াল প্রকাশ্য অধিবেশনের সম্মুখে। পূর্ণ-স্বাধীনতার নিঃসংশয় আর নির্বিশেষ ঘোষণা ফুটে বার হল বুকের ভেতর থেকে :

"...মহাত্মাজি-উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আজ আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত।...আমার প্রস্তাবই প্রমাণ করবে যে, বর্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে দুটো মতবাদ দেখা দিয়েছে : প্রাচীন আর নবীন। আর এই দুই মতবাদের মধ্যে রয়েছে একটা প্রত্যক্ষ পার্থক্য, এবং সেটা মৌলিক।......ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ অথবা স্বাধীনতা, এর কোন্‌টা ভারতবর্ষ কামনা করে, এ-সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মত প্রকাশ করবার সময় আজ এসেছে।...

"বর্তমান আন্তর্জাতিক ঘটনা আলোচনা করলেই এ-কথা স্পষ্ট হবে যে, আবার একটা মহাসমর আসন্ন হয়ে উঠেছে। যে-কারণে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়, সে-কারণ সমুপস্থিত। ভার্সাই-সন্ধি অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। হয়নি ইটালীর, বলকানের, রাশিয়ার,

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর এবং আরও অনেকের। এশিয়ার কথা আজ বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশ জোট বেঁধেছে। এর পরিণাম আরেকটা মহাসমর। বিশ্বের সবগুলি স্বাধীন দেশ আজ যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের দাবী উপস্থাপিত করতে হবে। একটা আনকোরা নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে দেশের মনে। এই মানসিকতাই চাইবে পূর্ণ-স্বাধীনতা। স্বাধীনতার আদর্শ রাখতে হবে সমুজ্জ্বল করে। ধোঁয়া বা ধোকা নয়, স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন।......আমার প্রস্তাব কেউ যেন আমাদের বয়োবৃদ্ধ নেতাদের প্রতি সামান্যতম অসৌজন্য হিসেবে না দেখেন। শ্রদ্ধা ও প্রেম, সৌজন্য ও পূজা বড় গুণ সন্দেহ নেই, কিন্তু আদর্শের প্রতি ঐকান্তিকতা সর্বোত্তম গুণ।"...

গান্ধীজি চেয়ে রইলেন সুভাষের দিকে অবাক বিস্ময়ে। সম্মুখে নিখিল ভারতবর্ষের অগণিত প্রতিনিধি ও দর্শক। উন্মাদ হর্ষে আর বিপুল কোলাহলে কেঁপে উঠল সভাস্থল। গান্ধীর কপালে ফুটে উঠল চিন্তার রেখা। চোখে তাঁর বিস্ময়ের চমক, মনে ভবিষ্যতের সংশয়। শুধু প্রতিবাদ নয়, বিকল্প বিধানও নয়,—প্রতিদ্বন্দ্বী মূর্ত হয়ে দাঁড়াল অপ্রতিদ্বন্দ্বী গান্ধীর সম্মুখে। ভুল-ভাঙ্গা সুভাষ ফুটে উঠলেন আরও স্পষ্ট, আরও তীব্র, আরও উজ্জ্বল হয়ে।

জহরলালও সুভাষকে সমর্থন করেছিলেন বক্তৃতা দিয়ে। ভোটের সময় আর তাঁর পাত্তা মিলল না। ততক্ষণে পিতা মতিলাল আর 'বাপু'র অভয় পক্ষপুটের নীচে তিনি আত্মগোপন করে ফেলেছেন।

১৯২৮এর কংগ্রেস শেষ হল। সুভাষ ভোটে পরাজিত হলেন। তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হল না। না হোক। তবু দেশের সর্বসাধারণ এই প্রথম জানল, এমন একটি মানুষের আবির্ভাব হয়েছে যে গতানুগতিক নয়, চিরাচরিতও নয়।

আর একটা কথাও জানল। জানল যে, স্বরাজের ব্যাখ্যা,—দুর্বোধ্য আর অস্পষ্টই শুধু নয়, অনেকটা অতৃপ্তিজনকও বটে,—গান্ধীর

সেই ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। স্বরাজের ব্যাখ্যা পূর্ণ-স্বাধীনতাও হতে পারে। ধোঁয়া আর ধোকা নয়, স্বরাজের এই নতুন ব্যাখ্যায় সারা দেশ চকিত হয়ে উঠল।

১৯২৮এর পর ১৯২৯। কংগ্রেসের অধিবেশন হবে লাহোরে। আগে থেকেই সুভাষের অগ্নিশ্রাবী বাণী ছড়িয়ে পড়ল ভারতবর্ষের দিকে দিকে। শ্রমিক-সভায়, যুব-সভায়, ছাত্র-সভায় আর নানা রাজনৈতিক সম্মেলনে নেতার পূর্ণ-স্বাধীনতার ঘোষণা যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তুলল সমগ্র দেশের অন্তরে, লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব উপস্থাপিত করবার পক্ষে তা কতখানি সাধারণভাবে কংগ্রেস ও বিশেষ-ভাবে গান্ধীজিকে অনুপ্রাণিত ও বাধ্য করেছিল, ইতিহাস হয়তো একদিন তা আলোচনা করতে চাইবেই, কিন্তু সমগ্র দেশ এই নব-আবির্ভাবের কণ্ঠে যে বরমাল্য অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে ও শ্রদ্ধায় পরিয়ে দিল, তা আর কোনদিনই ম্লান হবার অবকাশ পেল না।

লাহোর কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলালকে হারিয়ে দেশের অগ্রগামী দল ক্ষতিগ্রস্ত হল নিশ্চয়ই, কিন্তু যে শক্তিধর মানুষটি সংগ্রামমুখী ভারতবর্ষের সকল দায়িত্ব একান্ত নিষ্ঠা ও চরম সঙ্কল্প নিয়ে তুলে নিল নিজের সুদৃঢ় স্কন্ধে, তা দেখে আশান্বিতও কম হল না।

জহরলালের এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্ময়ও কি কম জেগেছিল? বড় ক্ষোভে নেতা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, জহরলালের এ-পরিবর্তন এগিয়ে যাবার পথে দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। আর করেছিলেন গান্ধীজির বুদ্ধির তারিফ।—For the Mahatma the choice was a prudent one, but for the Congress left-wing it proved to be unfortunate. (১)

এই লাহোর কংগ্রেসেই নেতা দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করে-ছিলেন। পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব দেশের স্বাধীনতা সম্ভবপর করে

(১) ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, ১৯২১ থেকে ১৯৩৪, ২৩৭ পৃঃ

তুলবে না। তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। করতে হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি, যাতে করে ইংরেজ এদেশে তিষ্ঠোতে না পারে—চলে যেতে বাধ্য হয় উপায়ান্তর না দেখে। নেতা বলেছিলেন পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় সরকার গঠন করতে। যেমন করেছিল আয়র্লণ্ড। আর চেয়েছিলেন তারই অধীনে এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করতে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে নেতা চেয়েছিলেন ওয়ার্কিং কমিটিকে নির্বাচনের ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে। নেতার দুই প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হয়। নেতা হেরে যান।

গান্ধীর পন্থায় দেশের স্বাধীনতা যদি আসে ভালো। নইলে থাক্ পড়ে দেশ অথৈ জলের তলায়। শুধু স্বাধীনতা অর্জন নয়—গান্ধীর বিশেষ মতবাদ আর আদর্শ যাতে বিশ্বের বুকে স্থায়ী হয়, এ-চিন্তা গান্ধী আর তাঁর গোষ্ঠীকে সেদিন অন্য কোন পথ, মত বা আদর্শের কথা ভাবতে দেয়নি।

মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী আর গান্ধী-অনুগত নেতৃচক্রের বাইরে যে এক বিরাট ভারতবর্ষ রয়েছে, আর রয়েছে অগুণতি দেশবাসী, এ-কথা সেদিনের নেতারা মানতে চাননি। একটিমাত্র মানুষের খেয়াল আর খুশির মাধ্যমে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে, গণতন্ত্রের এ ব্যভিচার নেতা অস্বীকার করতে চাইলেন। সমগ্র দেশবাসী না হোক, অন্তত নিয়মতান্ত্রিক কংগ্রেস-সভ্যের অনুমোদিত প্রতিনিধি নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হোক, নেতার এই প্রস্তাবে সেদিন গান্ধী ও তাঁর গোষ্ঠী রাজী হননি। (আজও এ-নিয়ম প্রবর্তিত হয়নি।) এরই বিষময় পরিণতি যে তীব্র তিক্ত হলাহল সৃষ্টি করল অদূর ভবিষ্যতে, তাই ছিল ত্রিপুরী কংগ্রেসের পটভূমি।

নিজের তপস্যাসিদ্ধ বর-প্রাপ্তি হয়তো হল না, তবু আর পরবশতার অসহায় অঙ্গীকার নয়। পূর্ণ-স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ মুক্তি, ইংরেজের সম্পর্কশূন্য এক বিরাট মহাভারতের অপরিম্লান উজ্জ্বল রূপ। আজ না

হয় কাল হবে, এবং তা হবেই। তবু আর ঐ দু'মনা দু'নৌকোয় পা রাখা নয়।

নেতা পরাজয়ের সকল গ্লানি ভুলে গেলেন। জাতির বুকে আর মুখে ফুটে উঠল গৌরব আর গর্বের শতদল পদ্ম। সমগ্র না হলেও সংগ্রামমুখী ভারতবর্ষ খুঁজে পেল এক বলিষ্ঠ আশ্রয়। (১)

পরবর্তী কালে কংগ্রেস ও গান্ধীজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল, তার সূত্রপাত একদিনে হয়নি, আর তা আকস্মিকও নয়। উভয়ের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর রূপ ছিল ভিন্ন। আর সে ভিন্নতা ছিল একান্তই মৌলিক। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, যাত্রাপথের কর্মধারা এবং পরাধীনতার প্রতি অন্তরের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার তারতম্যই এই বিভেদ দিনে দিনে তিলে তিলে আকার দান করে আসছিল। এ-কথা বুঝতে না চাইলে এই সংঘাতের মানসিকতা অবোধ্যই থেকে যাবে।

লাহোর কংগ্রেস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নেতা কংগ্রেসের ভেতর থেকেই নতুন সংস্থা গড়বার কল্পনায় মন দিলেন। এর পূর্বে গড়েছিলেন 'স্বাধীনতা সঙ্ঘ' জহরলালকে সঙ্গে নিয়ে। জহরলাল পেছনে পড়ে গেলেন—হোঁচট খেলেন শুরুতেই। নেতা এবার গড়ে তুললেন 'কংগ্রেস ডেমোক্রাটিক' পার্টি।

মাতা বাসন্তী দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে সেদিন নেতা তার বার্তায় বলেছিলেন,—"পারিপার্শ্বিকতা আর দলে-ভারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই এই পৃথক ব্যবস্থার সূচনা হল, যেমন হয়েছিল গয়ায়।(২) গুরু দেশবন্ধুর শক্তি আর তোমার অমোঘ আশীষ আমাদের সম্বল হোক।"

---

(১) সুভাষচন্দ্র সি, আর, দাশের ভাবরূপ। যেখানে অনাচারের বিভীষিকা সেখানেই দেখা যায় সুভাষের যোদ্ধৃরূপ। জাতীয় গৌরব অর্জনের যুদ্ধে সর্বদাই তিনি অগ্রণী।—লাহোর কংগ্রেসের সমালোচনা প্রসঙ্গে ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে।

(২) গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেছিলেন।

১৯২৯ শেষ হয়ে গেল। এল ১৯৩০। নির্মোকমুক্ত নবজীবনের পূজারী তাকে স্বাগত জানাল নিজের জীবনে। মরুকান্তার আর দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে এগিয়ে আসে অনাগত ভবিষ্যৎ। চোখ থেকে তার স্বপ্নের মোহ-কাজল উবে গেছে—ফুটে উঠেছে স্থির যাত্রা-পথের অবিচল ইঙ্গিত।

মেজর সোমদত্ত আর মেজর পাট্নি। দু'জনেই জেল সুপার। ফৌজি ডাক্তার ছিলেন দু'জনেই। সোমদত্তই সম্ভবত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের প্রথম ভারতীয় সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট।

১৯৩০এর ২৩শে জানুয়ারী নেতার কারাদণ্ড হল। বন্দি-মুক্তি আন্দোলনের শোভাযাত্রা পরিচালনার অপরাধে নেতা অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অভিযোগ ছিল রাজদ্রোহের। সঙ্গী ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ যতীন দাশগুপ্ত, সত্য গুপ্ত আর ধীরেন মুখুজ্যে। এর কিছুদিন আগে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, সত্যরঞ্জন বক্সী আর অধ্যাপক নৃপেন বাঁড়ুজ্যেরও কারাদণ্ড হয়েছিল। সবাই রাজদ্রোহী। সত্যবাবু ছিলেন তখন 'লিবার্টি' কাগজের সম্পাদক। সবাই থাকতেন একই মহলে।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলাও শেষ হয় এই সময়েই। এর ফলেও অনেক যুবককে দণ্ডিত করে সেন্ট্রাল জেলে ঢোকানো হয়।

লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেছে। জেলে ঢুকছে সত্যাগ্রহীর বহর। সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্যের বান ডেকে উঠেছে। দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করেছিল জাতি এই দিনটির জন্যে। ইংরেজের আইন ভাঙ্গতে হবে। ওর কয়েদখানা বোঝাই করে দিতে হবে। ইংরেজকে করাতে হবে নতি-স্বীকার।

ইংরেজ প্রস্তুত হবার সময় পায়নি। ভাবতে পারেনি মরা আইন-অমান্য হুজুগ আবার মাথা খাড়া করে দাঁড়াবে। ইংরেজ ভেবেছিল গান্ধী মরে গেছেন। ১৯২১এর হঠাৎ-জাগা ভাবালুতা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাই ভাবতে পারেনি যে, সারা দেশ এমনি করে সাড়া দেবে। ভাবতে

চায়নি যে, সহস্র বৎসরের পরাধীন একটা জাত এমনি মরিয়া হয়ে উঠবে। কিন্তু উঠল। উঠল গর্জে। উঠল পরোয়া না করে। উঠল প্রত্যয় আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

ইংরেজ সত্যাগ্রহীদের রাজনৈতিক কয়েদী বলে স্বীকার করতে চাইল না। চোর আর পকেটমার কয়েদীদের মতোই ওদের থাকবার ব্যবস্থা হল। অর্থাৎ সাধারণ কয়েদী। 'সি' ক্লাস।

অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকল। প্রতিদিনকার অপমান জমতে লাগল মনের তলায়। জাগল প্রতিকার-কামনা। ওদের-দেওয়া ডোরা-কাটা হাঁটু-তোলা জাঙ্গিয়া ছুড়ে ফেলে দিল সত্যাগ্রহীরা। কানে গেল জেল সুপার সোমদত্তের। জবরদস্ত সোমদত্ত। মেজর সোমদত্ত।

ইংরেজের আসনে বসেছে সোমদত্ত। প্রথম ভারতীয় সুপার। তার মর্যাদা রাখতে হবে বৈকি। সোমদত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

নেতৃস্থানীয় বন্দীদের সঙ্গে সোমদত্তের আচরণ শুধু অমায়িক ছিল, তাই নয়, ছিল সৌজন্যে ভরা। সত্যাগ্রহী বন্দী আর নেতারা যে ভিন্ন গোত্রীয়, এ-কথা সোমদত্ত মুখে বলত না, আচরণে বুঝিয়ে দিত। এবং নিজের সুকুশলী বুদ্ধির মারপ্যাঁচে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করতে পেরেছে, এ ভেবে ওর আত্মপ্রসাদের অন্ত ছিল না। আর এই বিচার-বিভ্রান্তিই ডেকে আনল সংঘর্ষ। ফলে তার অপসারণও।

ছাপাখানার লাগোয়া ছোট একফালি মাঠ। নেতারা বিকেলে সেখানে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অনেকেই গেছেন। নেতাও। কাছেই জেল-গেট আর আফিস। অকস্মাৎ চিৎকার আর আর্তনাদ ভেসে এল। নেতা থমকে দাঁড়ালেন। জানতে পারলেন সত্যাগ্রহীদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী। নতুন একদল সত্যাগ্রহী জেলে এসেছে। ওরা জাঙ্গিয়া পরতে করেছে অস্বীকার। স্বীকার করাতে চলছে প্রহার। ফিরে এলেন নেতা নিজের মহলে। সংবাদ রটে গেল চারদিকে।

পরদিন সকালবেলা। সত্যাগ্রহীদের কয়েকজনকে ঢোকানো হল ম্যাজিষ্ট্রেট সেলে। শাস্তি কামরায়। দলে দলে বন্দীরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। বাজল পাগলা-ঘন্টি। বিপদের সঙ্কেত। বাঁশী বেজে উঠল। ঘন্টায় পড়তে লাগল একটানা ঘা। ঢুকল বন্দুকধারী সেপাই, লাঠি হাতে পাহারার দল। সে এক উন্মাদ কলরোল।

পাগলা-ঘন্টি বাজলে সব কয়েদীকে ঘরে ঢোকাতে হবে। দরজায় লাগানো হবে তালা। জেলের কানুন।

ঘরে ঢুকতে নেতা করলেন অস্বীকার। আর আর সঙ্গীরাও। আঙ্গিনায় নেতা দাঁড়িয়ে। পাশে সাথীরা। সম্মুখে এসে দাঁড়ায় সেপাইএর একটা পল্‌টন্।

দাঁড়িয়ে আছেন নেতা। জেলার এল। হুকুম হল কামরায় ঢুকতে।

নেতা করলেন অস্বীকার।

চিৎকার করতে করতে সোমদত্ত ঢুকল আঙ্গিনায়। ক্রোধে ও অন্ধ হয়ে গেছে। রক্তমাখা মুখ কদর্য হয়ে উঠেছে ওর। মুখোস খসে পড়েছে। হিংস্র, নোংরা, ইংরেজের বেতনভুক সোমদত্ত বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই তাকিয়ে ছিল নেতার দিকে। সমুন্নত স্থিরমূর্তি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নির্বাক। নির্ভীতির জীবন্ত আলেখ্য। নিস্পন্দ সেই দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা সঙ্কল্পে স্থির হয়ে গেছে তখন। সেনগুপ্তকে কয়েকজন ওয়ার্ডার ধরে নিয়ে সেলে ঢুকিয়ে দিল। ডাঃ দাশগুপ্তকেও। সামনের গোলাঘরে ঢুকিয়ে দিল নৃপেনবাবুকে।

সোমদত্তের তর সইছিল না। কণ্ঠ চিরে ওর বেরিয়ে এল একটানা হুঙ্কার। জানোয়ারের হুঙ্কার।

"জলদি ঢোকাও।"

সেপাইরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। নেতার দিকে তাকায়। পা ওদের ওঠে না।

উন্মাদ সোমদত্ত এগিয়ে আসে। ছুটে আসে বন্দুকধারী সেপাইদের পাশে। কণ্ঠ থেকে সহসা বেরিয়ে আসে,—"গুলি করো।"

নেতার দেহ একটু নড়ে ওঠে। সমগ্র দেহ সেই মুহূর্তে হয়ে ওঠে ইস্পাতের মতো। বুকখানা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ধীর-কণ্ঠে নেতা বলেন,—"সেই ভালো। করো গুলি।"

একটা মুহূর্ত। একটা ক্ষণ। তখনও পাশে সাথীদের কয়েকজন দাঁড়িয়ে। চোখ ওদের বন্ধ হয়ে যায়। বাংলার রক্তাক্ত ইতিহাসের একখানা পাতা ভেসে ওঠে চোখের ওপর।

পল্‌টনের হাবিলদার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কাঁধে ওর বন্দুক। ওরও দেহ স্থির। ও-ও ছিল নির্বাক। দৃঢ় ওষ্ঠ ওর খুলে গেল। বলে উঠল,—"না।"

বিস্ময় জাগে। তাকায় সবাই হাবিলদারের দিকে। দেখে ওকে। তখনও ও স্থির। অনাগত বিপ্লব মূর্তিমান হয়ে দেখা দিয়েছে।

দিশাহারা সোমদত্ত বাঁশী বাজিয়ে দেয়। আঙ্গিনায় ঢুকে পড়ে আর একদল ওয়ার্ডার। সোমদত্ত হুঙ্কার ছেড়ে বলে,—"যেমন করেই হোক সেলে ঢোকাতে হবে।"

ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়ার্ডারের দল। হাত-পা ধরে সত্য গুপ্তকে ঢুকিয়ে দিল একটা ঘরে। পাঁচ-সাতজন ওয়ার্ডার একসঙ্গে লাঠি ধরে সজোরে ধাক্কা মারল নেতার দেহে। নেতা সিঁড়ির মাথায় লুটিয়ে পড়লেন। তখন আর তাঁর সংজ্ঞা নেই।(১)

লবণ সত্যাগ্রহের ফলে পাবনা থেকে হল আমার কারাদণ্ড। ছ'মাসের মতো সেখানে কাটিয়ে ঢুকলাম আলিপুর জেলে। পাবনা জেলে বসেই নেতার জেল-কাহিনী শুনেছিলাম। সারা পথ একটা দৃশ্যই মনের চোখে ফুটে উঠেছে : উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সেপাইএর দল, আর তাদের সামনে বুক বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নেতা। পৌরাণিক উপাখ্যান মনে পড়ে যায় : উদ্যত অস্ত্র হাতে অসুররাজ,

(১) আমি তখনও আলিপুর জেলে আসিনি। বিবরণ দিয়েছেন সত্যরঞ্জন বক্সী।

আর তারই সামনে তপস্যাসিদ্ধ বীর্যধন্য ঋষি। অস্ত্র আর ঋষির মাথায় পড়ল না। স্তব্ধ হয়ে অসুরের হাতেই রয়ে গেল।

গেটের কায়দা-কানুন শেষ হল। ঢুকলাম ভেতরে। প্রথমেই দেখা হল পূর্ণবাবুর সঙ্গে। পূর্ণ দাশ। একখানা লম্বা তেলে-পাকা লাঠি। শুধু দৈর্ঘ্যই আছে, প্রস্থ নেই। চোয়ালের দু'পাশের দু'খানা শক্ত হাড় উঁচু হয়ে ফুটে উঠেছে। সামনের গোটা-দুই দাঁত বড় বড় আর উঁচু। বেরিয়ে থাকে সর্বক্ষণ। ঠোঁট নাগাল পায় না। গলার বকনালীটা যেন মৈনাক পর্বত। চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবাবু জড়িয়ে ধরলেন দুটি বাহু দিয়ে একেবারে বুকের মধ্যে। পূর্ণবাবু তখন ছিলেন আমাদের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিকর্তা।

১৯২৩এর কথা। বরদলই সিদ্ধান্তের পরই জেলখানা শূন্য হয়ে গেল। থাকলাম শুধু জনা-পাঁচেক। তার ভেতর থেকে অধ্যাপক জিতেন বাঁড়ুয্যে আর আমাকে পাঠানো হল বহরমপুর জেলে। সেইখানে দেখা হল পূর্ণবাবুর সঙ্গে। রাজদ্রোহীরা সেদিন মুক্তি পায়নি। পরে আমাদের দল ভারী করলেন সতীন সেন, নজরুল ইসলাম, বিজয় চাটুয্যে, শিবরাম চক্রবর্তী—আরও অনেকে—

সেই পূর্ণ দাশ। সেদিন তাঁর নামে ছড়া তৈরী হয়েছিল :

পূর্ণচন্দ্র দাশ,
জেলেই যাঁর বাস।

সেই পূর্ণ দাশ। এঁরই হাতে-গড়া চিত্তপ্রিয় আর নীরেন ইংরেজের বিরুদ্ধে মুখোমুখী লড়েছিলেন বুড়িবালামের তীরে। বাঘা যতীনের সঙ্গী হয়ে।

সোমদত্ত চলে গেছে। এসেছেন মেজর পাট্নি। সিন্ধু প্রদেশের বাসিন্দা। বিপুল দেহ। আর মনটাও। এসেই পাট্নি নেতার সঙ্গে দেখা করলেন। অগুণতি সত্যাগ্রহীর আগমনে জেলখানা টলমল

করছে। নেতার সাহায্য আর সহযোগিতা চাইলেন পার্টনি। নেতা সানন্দে রাজী হলেন। নেতার প্রতিনিধি পূর্ণ দাশ।

শুধু কি সত্যাগ্রহ? চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, ঢাকা—সাঁড়াশি-আক্রমণ চলছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ, পক্ষী সমান পরিপূর্ণ করে ফেলল ইংরেজের জেল। বাংলার দু'মুখী আক্রমণে ইংরেজ তখন দিশেহারা। আর হয়তো খানিকটা সন্ত্রস্তও।

বেদনা-জর্জর জাতি অনেক আগেই রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিল। নেতারা ভরসা পাননি। সাইমন কমিশনের পরিকল্পনা যেদিন উত্তাল গণ-বিক্ষোভে ব্যর্থ হয়ে গেল,—তখনি। গান্ধীজি তখনও ইসারা পাননি। অন্তর্দেবতার নির্দেশের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। নেতা করজোড়ে নিবেদন করছিলেন গান্ধীজিকে বেরিয়ে আসতে আশ্রমের নির্জন বাস ছেড়ে। গান্ধী রাজী হন নি।(১)

ভকৎ সিংএর বোমার আওয়াজ এঁদের আলো দিতে পারেনি। পারেনি চট্টগ্রাম তার বুকের তাজা লাল রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে।

ঘুম ভাঙ্গল। ভাঙ্গল সুদীর্ঘ আট বৎসর পর।

পূর্ণবাবুর জিম্মায় জিনিসপত্তর দিয়ে ছুটলাম নেতার কাছে। দাঁড়ালাম সামনে। নিয়ে গেলেন ঘরের ভেতর। সাক্ষাৎ হল কিরণ-বাবুর সঙ্গে।

চমৎকার মানুষ ছিলেন এই কিরণশঙ্কর রায়। জমিদারের ছেলে। তা ছাড়া ব্যারিষ্টার। কিছুদিন প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপনাও করে-ছিলেন। কিন্তু এ-সব ওঁর পরিচয় নয়। বাড়তি উপকরণ। ভেতরের

---

(১) ···the writer (Subhas) visited the Mahatma in May, 1928, at his Ashram of Sabarmati, he...begged him to come out of his retirement and give a lead to the country···the reply of the Mahatma was that he did not see any light.—Indian Struggle from 1921 to 1934.

মানুষটি ছিলেন রসিক, হালকা আর বন্ধুবৎসল। মার্জিত শালীনতা ছিল কথা আর আচরণের সর্বস্তরে।

চরিত্রে দুর্বলতা ছিল। মেরুদণ্ডও খুব অটুট ছিল না। কিন্তু দেশকে ভালোবাসতেন। সাধ ছিল স্বাধীনতা পাবার, কিন্তু সাধ্য ছিল সীমিত। বেঁটে মানুষটি। একটু স্থূলও। কোঁকড়া একরাশ চুল মাথায়। গোলপানা মুখ। পরিপাটি করে মাথাটা আঁচড়ানো থাকত সর্বক্ষণ।

কিরণবাবু ছিলেন আমাদের গোষ্ঠীর চাণক্য। ওঁর নিপুণ আর কুশলী বুদ্ধির প্রাখর্য একটা প্রবাদে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। বাংলা কংগ্রেসের ছিলেন সম্পাদক। দলগত প্রাধান্য উনি থাকতে হাত-ছাড়া হবে না, এ-বিশ্বাস আমাদের চাইতেও প্রতিপক্ষের মনে ছিল সদা জাগ্রত। তাঁরা ডাকতেন ওঁকে 'কেরেনেস্কি' বলে।

নিজের গলদ আর বিচ্যুতি কিরণবাবু শুধু জানতেন না, স্বীকারও করতেন। কথায় কথায় বলতেন,—"আপনাদের সঙ্গে আমার থাকবার কথা নয়, তবু আছি এবং হয়তো আরও কিছুদিন থাকবও।"

"কিছুদিন কেন?" প্রশ্ন করতাম আমি।

"শেষ অবধি থাকা চলবে না, কথাটা আমার বিশ্বাস নয়, সত্য।" বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতেন অন্যদিকে। ঘন কালো ভ্রূর নীচে দুটি বড় বড় চক্ষু। দীর্ঘ পল্লবে ছাওয়া। ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত দুটি কালো চোখের সরল দৃষ্টি। বলেই যেতেন,— 'আমার সব আমিটা আর ওর পারিপার্শ্বিকতা আপনাদের সঙ্গে থাকবার বিরোধী। তবু আছি কেন জানেন?"

"কেন?"

"না থেকে পারিনে বলে।" একটু থামতেন। আবার নিজের মনেই বলে চলতেন,—"ঐ যে আপনাদের বোকা নেতাটি, ওরই জন্যে। ওর ব্যক্তিত্ব নয়, দেশভক্তি নয়, দুর্লভ বীর্যও নয়,—আমাকে টানে ওর চরিত্র।"

"চরিত্র !" কণ্ঠে আমার বিস্ময় ফুটে উঠত।

"হ্যাঁ চরিত্র।" বলতেন কিরণবাবু।—"সব ছিল। আর কতই-না হতে পারত! কিন্তু সব হারিয়ে ও হল সর্বরিক্ত। ওর এই রিক্ততা আমাকে টানে। ওকে দেখে নিজের না-পাওয়া আর হারানো সবই ম্লান হয়ে ওঠে। নিজেকে মনে হয় বড় অকিঞ্চিৎকর।"

সেনগুপ্তের কাছে গেলাম। শুয়ে ছিলেন আরাম-চেয়ারে। বারান্দায়। হাতে একখানা ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। হাত ধরে বসালেন পাশের চেয়ারে। উচ্ছ্বসিত হাসি আর কথা ছিটকে পড়ল চারদিকে। ঠোঁটে-চাপা চুরুটের শেষটুকু বাইরে ছুড়ে দিয়ে বলে উঠলেন,—"এত দেরি করে এলেন যে বড় !"

যেন আসাটা আমার ইচ্ছাধীন, আর দেরি হওয়াটাও আমারই গাফ্‌লতি ! জিজ্ঞেস করে বসলেন,—"কী খাবেন বলুন ?"

"খাবো ! এখন ? কিন্তু—" কে শোনে আমার কথা। টেনে বের করলেন বাক্স থেকে একটা আইসক্রীম সোডা।

এই সেনগুপ্তের সঙ্গে বাইরে কতই-না বাক্-যুদ্ধ করেছি সভাক্ষেত্রে। কঠোর সমালোচনা করেছি নির্মম হয়ে। ভাষাও সব সময় শালীনতার ব্যাকরণ মেনে চলত না।

জেলখানা আর জেলখানা থাকল না। হট্টমন্দির হয়ে দাঁড়াল। একটা চরম বিপর্যয়। শাসন আর শোষণ, নিয়ম আর শৃঙ্খলা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল।

ছেলের দল দল-বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে সেখানে আড্ডা জমায়। মহলের ভেতর তো কথাই নেই। নাচে গানে কথায় আর বিতণ্ডায় জেলখানা হয়ে উঠল জমজমাট।

এত আনন্দই-বা ছিল কোথায় ? ঘর-বাড়ী ছেড়ে সবাই জেলে ঢুকেছে। কেউ ছ'মাস। কেউ তিন মাস। বছরও বাদ যায়নি।

আসবার সময় সারা বাংলার আনন্দ ওরা লুঠ করে জেলে এনে জমা করেছে।

সন্ধ্যার পূর্বে আহার পর্ব সমাধা হয়ে যায়। তারপরই শুরু হয় আনন্দ-সম্মেলন। একজন গান গায়, তাল ঠোকে আর পাঁচজন। এ্যালুমিনিয়ামের থালার পিঠে তালের বোল ফুটে ওঠে। মুখে বলে ধা ধা ধিন্ ধিন্—। চিরুণির দাঁতে সিগারেটের পাতলা কাগজ জড়িয়ে তৈরী হয় ওদের বাঁশী। সুর ককিয়ে ওঠে ঠোঁটের চাপে। রবীন্দ্রনাথ সশরীরে দেখা দেন চয়নিকা হাতে নিয়ে। বলাকা তার শুভ্র ডানা মেলে এসে বসে কাঁটা কম্বলের শয্যায়।

বড়রাও বাদ পড়েন না। তাসের আড্ডা জমে উঠে। কচে-বারোর শব্দে কানে তালা লাগে। ওরই একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে দুই বুড়ো দাবার ছক বিছিয়ে নেন।

নেতা ভাবিত হয়ে উঠলেন। এই ছেলের দল,—কেউ এসেছে স্কুল ছেড়ে, কেউ কলেজ। এদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে না? ওঁর মনে জাগে ১৯২১এর কথা। সর্ববিদ্যায়তন। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ধারে সেই লাল বড় বাড়ীটা এখনও কি আছে!

সেদিনও ছেলেরা এমনি করেই সব ছেড়ে পাগলের মতো ছুটে এসেছিল। চিরদিন ওরাই আসে সকলের আগে। আত্মভোলা পাগলের দল। বেহিসেবী। কিন্তু আসে কেন? যুগে যুগে ওরা আসে। সর্বদেশে আসে। আসে সর্বকালে। আসে কেন? এসে কী পায়? পরেই-বা কী পাবে?

পায় না। পায় না কোনও দিন। পাবেও না। কিছুই না। তবু ওরা আসে! আসে বার বার। আসা ওদের ধর্ম।

পরামর্শ সভা বসে সত্যবাবুর ঘরে। আসেন পূর্ণবাবু, কিরণবাবু, জীবন চাটুজ্যে, অশ্বিনী গাঙ্গুলী। আসেন নেতা আর আসি আমি। আলোচনা হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। ছেলেদের জন্যে নিয়মিত ক্লাস

বসাতে হবে। পড়াশুনা ওরা করুক। যে যেমন পারে সাহায্য করুক ওদের। আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হোক শৃঙ্খলার সঙ্গে। মাঝে মাঝে জলসা হবে। বসবে আলোচনা সভা আর বিতর্ক সভা। নাটকের মহড়া চলে।

ওদের অনেকে কাপড় পায়নি। অনেককে জুতো দেওয়া হয়নি। সময় মতো কম্বল আর বিছানাও পৌঁছোয় না। হাসপাতালের ব্যবস্থাও খুবই ত্রুটিপূর্ণ।

সারা বিকেলটা নেতার কাটে এ-মহল আর ও-মহল করে। হাস-পাতালে যান রোজ। রোগীদের খোঁজ নেন। কাছে বসেন। সান্ত্বনার কথা শোনান। কাজের কি অন্ত আছে ? ঐ ওরা,—গান্ধীর পথে না যেয়েও যারা চায় দেশের স্বাধীনতা, অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজের ওপর, টুঁটি চেপে ধরে,—ওরাও তো কম আসেনি জেলে। কেউ এসেছে বোমার মামলায়। কেউ অস্ত্র আইনে। আর কেউ কেউ ষড়যন্ত্রের অভিযোগে। ওদের দিকে চাইতে হবে না ? ওদের অনেকে আবার তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। নিজেদের ভাগ থেকে একটু বাঁচিয়ে ওদের দিলে ওরা মুখ বদলাতে পারে।

আর ঐ ওরা, পকেটমার আর চোর হয়ে যারা জেলে ঢুকেছে। ওদেরও-তো দেশ, ওরাও-তো দেশেরই। ওরা সবাই নেতাকে বলে বড়বাবু। চোখ-মুখ ওদেরও পাল্টে গেছে। মনে জেগেছে নতুন আশা। এই ডামাডোলে ওদেরও একটু সুবিধে হয়েছে। জুলুম কমে গেছে। কথায় কথায় বেতের ঘা, পেটির বাড়ি আর অকথ্য গালাগালি। ভেতরের মানুষটা ফুঁসতে থাকে কিন্তু নিরুপায় কয়েদী থাকে মুখ বুজে। চোখ তুলে ওরাও চায়। খাবারের ভোল বদলেছে। পচা মাছ কমে এসেছে। সপ্তাহে দুদিন ওদের মাছ পাবার কথা। একদিন মাংস। সবই ছিল খাতায়। খাতা থেকে পাতেও পড়ে। ওরা জানে এ-সবই স্বদেশী বাবুদের দৌলতে।

মতির কাছ থেকে নেতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেন। মতি মেট।

কন্‌ভিক্‌ট্‌ ওয়ার্ডার। মতি পাগলা। মতির দেশ ছিল জয়নগরের ধারে। খুনে কয়েদী। ভালো কাজ আর আচরণ দেখিয়ে ওর পদোন্নতি হয়েছে। হয়েছে মেট। ছুপুর বেলা মতি বড়বাবুর ঘরে ঢোকে। খাটের পাশে মাটিতে নেপ্‌টে বসে। নেতার পা ছুখানা টেনে নেয়। কপালে দেয় হাত বুলিয়ে।

মেয়াদ কাটিয়ে মতি আবার ঘর বাঁধবে। একরত্তি একটা মেয়ে রেখে মতি জেলে এসেছিল। কত বড়টি হয়েছে যেন সে। ঘর বাঁধবে তাকে নিয়ে। ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেখে। তারপর ? আকাশের গায়ে ঝলমল করে ওঠে রংএর খেলা।

মতির গতায়াত সর্বত্র। কোমরে ওর পেটি আছে। কেউ রোখে না। ওকে দিয়ে চলে খবরাখবর। পাঠানো হয় জিনিষ পত্তর। এ-মহল থেকে ও-মহল।

কিন্তু এ-ব্যবস্থাও স্থায়ী হল না। মেজর পাট্‌নির সদিচ্ছার অভাব ছিল বলে নয়, সরকারী তৎপরতায়। লাল ফিতে বাগড়া দিল। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল ছেলের দল। পাট্‌নিও নেতাকে নিজের অসহায়তার কথা জানালেন।

শুরু হল প্রায়োপবেশন। পূর্ণবাবুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। জনা-দশেক শুরু করল প্রথমে। তারপর থেকে সংখ্যা বাড়তে থাকল নিয়মিত। সপ্তাহের মধ্যে ত্রিশের কোঠায় সংখ্যা দাঁড়াল। পরি-কল্পনা পূর্বাহ্নে করা ছিল। গতি বাড়াতে হবে দিনে দিনে। ধাপে ধাপে ফেঁপে উঠবে আন্দোলন। তাছাড়া, জেলে শুধু বসে না থেকে ভেতর থেকে ইংরেজকে ধাক্কা দেবার প্রলোভনও-তো কম নয়।

এক সপ্তাহের শেষে আমার আবেদন পেশ করলাম নেতার কাছে। রোজ ছুবেলা আসতেন নেতা আমাদের মহলে। ছেলেদের কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করতেন। জনে জনের কাছে বসে হালকা কথায় আর টুকি-টাকি বার্তায় ওদের খুশি করে তুলতেন।

সেদিনও এসেছিলেন বিকেলে। ঐ পথেই হাসপাতাল হয়ে যাবেন।

সঙ্গে নিলেন আমাকে। পথে বললাম মনের কথা। হাঁ, না, কিছু না বলে সোজা ঢুকে গেলেন হাসপাতালের অঙ্গনে। ডান দিকে মাঠ। তার ওপাশে ভাটিখানা। অঙ্গনের ভেতর নেবু গাছের সারি। মাঠে গিয়ে বসলেন। পাশে আমি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—"না আমি করব না। কিন্তু যখনি ভাঙ্গতে বলব, ভাঙ্গবে, কথা দাও।''

কথা দেবার কি প্রয়োজন ছিল ? না, আর কোন গত্যন্তরই ছিল আমার ? তবু কথা দিতে হল। দশদিন পর আমাকে পাঠানো হল হাসপাতালে। ভয়ানক হিক্কা হচ্ছিল। আগেই গেছে আরও অনেকে।

বিকেলে এলেন কিরণবাবু, ডাঃ সুরেশ বাঁড়ুজ্যে আর ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত। ওঁদের পরই এলেন নেতা। আমার ওজন অনেকটা কমে গেছে। দেহও হয়েছে শীর্ণ। একটা কথাও বললেন না। মাথায় হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন।

প্রভাত এল। এল বাইরের মতোই আলো নিয়ে, পাখীর গান নিয়ে, হাসি নিয়ে। কিন্তু নিমেষে সব থেমে যেতে সময়ও লাগল না। মুহূর্তের মধ্যে সারা জেলখানায় রটে গেল বার্তা। নেতা প্রায়োপবেশন শুরু করেছেন।

জেলখানা থম্‌থম্ করছে। সবাই মনমরা, উদ্বিগ্ন। অমন যে বেহিসেবী ছেলের দল, ওরাও আর হাসে না, গান গায় না। থালার পিঠে আর তাল ঠোকে না। আবার দিন। আসে আবার রাত্রি। ঝিম ঝিম করে মাথা। শুয়ে শুয়ে ভাবি নেতার কথা।

পরদিন। তারও পরদিন। দুপুর গড়ে যায়। অপরাহ্ন। ঘন্টা বাজে ঢং ঢং করে। তন্দ্রা-ঘোরে পড়েছিলাম। অনেকগুলো পায়ের শব্দে জেগে উঠলাম। চেয়ে দেখি এক দঙ্গল ছেলে আর তাদের সঙ্গে কিরণবাবু। নেতা উপোস ভেঙ্গেছেন। মাতা বাসন্তী দেবী এসে

নিজ হাতে খাইয়ে গেছেন ফলের রস। বিছানায় উঠে বসলাম। সারা দেহ উত্তেজনায় কাঁপছিল। আমরা জয়ী হয়েছি ?

কিরণবাবুর হাত থেকে গেলাশটা টেনে নিলাম। কমলানেবুর রস।

হাসপাতাল থেকে বাইরে যেতে ছটফট করলে কী হবে ? হাস-পাতাল ততক্ষণে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। যাওয়া হল না। বিদায়-ব্যথার বেহাগ সুর বেজে উঠল জেলের মহলে মহলে। নেতার দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব জুড়ে ছিল সারা জেলখানা। ভীতি আর লাঞ্ছনা রেখেছিল বহুদূরে সরিয়ে, যাবার কথা উঠতেই ওরা যেন দূর থেকে দাঁত বের করে দাঁড়াল।

মুক্তির আগের দিন। বারান্দার পুবদিকের রেলিং ধরে দু'জনায় দাঁড়িয়েছিলাম। বড় বড় শিকের বন্ধ রেলিং। ওরই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সবুজ গাছের সারি। তার ওপারে বড় বড় গাছ। তারও ওপার থেকে দেখা যায় সরকারী আদালত। বিকেলের আলো পড়েছে বারান্দায়। নরম আর মিষ্টি আলো। আস্তে করে নেতা বললেন,—"ছাড়া পেয়ে সোজা কিন্তু আমার ওখানে যাবে। কেমন ?"

শুধু কি নেতা উনি ? রাজনৈতিক নেতা ? যারা চিরদিন চ্যালা আর অনুগামীদের মাথায় পা রেখে ওপরে ওঠে ? বড় হয় ? প্রভুত্ব আর শক্তির অধিকারী হয় ? তারপর পা দিয়ে সরিয়ে দেয় মাথাগুলো ? নিষ্কণ্টক হয় মাথাগুলো ছেঁটে ?

সন্ধ্যার একটু আগে বসল সভা কিরণবাবুর ঘরে। কত কথাই আলোচনা হল। বেশিই হল ভবিষ্যৎ নিয়ে। বাইরের সংবাদ আসে নিয়মিত। কাঁথি, মহিষবাথান, লক্ষ্মীকান্তপুর, নীলা,—বাংলার কোনও জেলা বাকি নেই। ইংরেজের বর্বর আক্রমণে হয়ে উঠেছে পাংশু। মেয়েদের ওপর চলছে অকথ্য অত্যাচার। চট্টগ্রাম রক্তাক্ত। মেদিনীপুর রুদ্ধশ্বাস।

নেতা বলে চলেছেন। মুখ আরক্ত। চোখ থেকে বেরোয় আগুনের ফুল্‌কি। বহ্নি-বন্যা নেমে আসে সে-চোখের কোণ্ থেকে।

গান্ধীজি অনেক দিয়েছেন। জাতি চিরদিন সে-কথা মনে রাখবে। ওঁকে পূজো দেবে। জয়গান করবে। কিন্তু তাঁরও দানের দৈন্য দেখা দিয়েছে। ব্যক্তির সত্য জাতির জীবন-সত্যের চাইতে বড় হয়ে উঠেছে। সাধনার কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে যে-আন্তর-তৃপ্তি ওঁর জীবনকে পূর্ণ করে তুলেছে কানায় কানায়, জাতিরও যে ওতেই হবে পরম ও নির্বিশেষ কল্যাণ, এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত করবার অধিকার ওঁকে দিল কে? আর কখনি বা? অন্তরের ছলনা কত ভাবেই-না মানুষকে বিভ্রান্ত করে! ওঁকেও যে করেনি তার কি কোন প্রমাণ আছে?

"সর্বস্বের বিনিময়ে আদর্শের পায়ে যে অকুণ্ঠ অবলীলায় নিজেকে বিলিয়ে দিল, তার বলিদান হল মিথ্যে, পাপ,—আর—"

নেতার কণ্ঠ ধীরে নেমে আসে। তারপর থেমে যায়। পরক্ষণেই বলে ওঠেন,—

"কবির কথাই হয়তো ঠিক :

পুরাণো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা আর চলিবে না।"

১৯৩০এর সেপ্টেম্বর। ২৩শে সেপ্টেম্বর। সকাল বেলা। সহসা কারাগারের পাঁচীল-ঘেরা বাতাসের বুক চিরে হুঙ্কার উঠল, বন্দেমাতরম্! এ মহল থেকে ও মহল, সব মহলে ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিধ্বনি গর্জে উঠল বাইরে। কারাগারের দ্বারে জয়ধ্বনি বেজে উঠল।

আলীপুর জেলের আলো নিভে গেল। কলকাতার বুকে ফুটে উঠেছে একটা বড় আলো। দপ্ দপ্ করছে। গায়ে ওর দিব্য দ্যুতি।

সুভাষ কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র—১৯৩১

তিন

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পেলাম নভেম্বর মাসে। সামান্য কয়েকটা দিন গৃহে ছিলাম। টেলিগ্রাম গেল নেতার। কলকাতায় চলে এলাম।

লবণ-আইন ভাঙ্গার আন্দোলন ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। প্রাথমিক বেগ-বন্যা নিঃশেষ হয়ে গেছে। দেশের চারিদিকে একটা অস্বস্তিকর চাপা গোঙরানি। ছেলের দল জেল থেকে বাইরে আসছে। প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় সামনে। সবলে ধাক্কা দিতে থাকে অনেকেরই অন্তরে। কী হল? কেন হল? কবে হবে? কেমন করে হবে?

তাঁতের মাকুর মতো একবার জেলে ঢোকা আবার বেরিয়ে আসা,—এতেই কি হবে অভিষ্টের পূর্ণতা? আসবে স্বাধীনতা? মহাজ্ঞানী মহাজন নেতা মহাত্মাজি বলেছেন,—এতেই আসবে। কিন্তু ১৯২২? সংশয় জাগে বৈকি!

কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরে বসে থাকলেই কি স্বাধীনতা দেখা দেবে? কাছের, সামনের প্রতিবেশীদের মধ্যেও যে আজ আলোড়ন দেখা দিল। প্রতিবেশী মহাচীন আর ঐ একটু দূরের রাশিয়া। বিশ্বের যে যেখানে ছিল কেউ তো ওকে রেহাই দেয়নি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, পরাজিত জার্মাণী, বিজয়ী ফ্রান্স,—কেউ না।

কিন্তু কী ছিল ওর অপরাধ? অনেক অনেক দিনের পুরোণ পচা নালি-ঘা কেটে, পঙ্গু অসাড় অঙ্গ ছেঁটে নিজের দেহটাকে সুস্থ সবল করে তোলবার চেষ্টা ছাড়া আর কি কোনও অপরাধ রাশিয়ার ছিল? নিজের দেশের, নিজের জাতির ভালো কী করে হবে, তাও কি জেনে নিতে হবে অন্যের কাছ থেকে? ওদের অনুমতি আর পছন্দ মাফিক ফরমাইশি রূপ যদি সে না-মঞ্জুর করেই থাকে, সেইটাই হল এমনি অমার্জনীয়

অপরাধ যার ফলে পৃথিবীসুদ্ধ বনেদি লুটেরেরা তার ওপর পড়ল ঝাঁপিয়ে, করে তুলল রক্তাক্ত, অনাহার আর মহামারি দিল লেলিয়ে, বিশ্বাসঘাতকদের ডেকে এনে, দেশদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়ে পরিপুষ্ট করে তুলল বিরোধী পক্ষ ?

আর ঐ ছোট্ট আয়র্লণ্ড। ইংলণ্ডের গা-ঘেঁষা। বাংলার একটা জেলার মতোই যার পরিধি। ছ'শো বছর একটানা ইংরেজের কাছে চাবুক খেয়েছে যে আয়র্লণ্ড। জনবুলের ভারী বুটের তলায় ছোট্ট দেহখানা থেঁতলে গেছে বার বার। গুঁড়ো হয়ে গেছে হাড় গোড়। মহাযুদ্ধের বিজয়ী ইংরেজকে দেখে সে তো ভয় পেল না।

লাহোর-কংগ্রেসে নেতা স্বাধীনতার প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্যে বলেছিলেন ওরই কথা। আয়র্লণ্ডের মতো যদি পাশাপাশি স্বাধীন সরকার ঘোষণা করা যেত, তোলা যেত একদল সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক গড়ে,—কেঁপে উঠত না ইংরেজ ?

মুষ্টিমেয় যুবক কী কাণ্ডই-না করল চট্টগ্রামে। মেদিনীপুরে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসতে সহসা আর রাজী হয় না। ঢাকা, কুমিল্লা, ডালহৌসি স্কোয়ার,—মহাত্মাজি নাকি বেদনা পান। তাঁর মহা তপস্যা-লব্ধ প্রজ্ঞার গায়ে হয়তো উত্তাপও লেগেছে ; কিন্তু উপায় কী ?

ব্যক্তির প্রজ্ঞা, তা যত বড় হোক আরম হৎই হোক, একটা জাতির পুনর্জীবনের পক্ষে পর্যাপ্ত না হতেও তো পারে। তাছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন নির্বিশেষে একই মাত্র পথের নির্দেশ কি কোন দিন ছিল ? সনাতন ভারতবর্ষের দেখা তো কোনও দিনই এক-চোখো নয় ; আর তাই-না এর দর্শনও ভিন্ন ভিন্ন।

অগণিত নতুন কারখানায় দেশ দিনকার দিন ভরে উঠছে। ঐ বোবা-কালা শ্রমিকের দল, মেহনতি মানুষ,—জীবন-ভোর যারা শুধু মার খেল ওপরওয়ালার মর্জির ওপর আর মুদ্রার লোভে, তাদের দিকে না তাকালে চলবে কেন ? ওদের সহিষ্ণুতা আর কর্ম-ক্ষমতার সঙ্গে একবার চেতনার সংযোগ যদি গড়ে তোলা যায়,—তাছাড়াও আছে :

সমাজের বিভিন্ন স্তরে ঐ যে অনুন্নত মানুষের শ্রেণী, মানুষের গড়া কৃত্রিম বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে এদের কণ্ঠে তুলতে হবে স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীণ দাবী। আর্থিক, সামাজিক আর সর্বোপরি রাজনৈতিক দাবী। দয়া আর করুণার দান নয়।

নেতার কাছে স্বাধীনতা মাত্র ক্ষমতার হস্তান্তর ছিল না। বার বার তিনি একথা নানা ভাবে নানা ক্ষেত্রে বলেছেন,—"বিপ্লব আনতে হলে আমাদের চোখের সামনে এমন একটা আদর্শ তুলে ধরতে হবে যা বিদ্যুতের মত আমাদের করবে সচকিত। এই আদর্শ স্বাধীনতা··· স্বাধীনতা অর্থে আমি বুঝি ব্যক্তি ও সমাজ, নর ও নারী নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতার ছত্র-ছায়ায় মানুষের সমস্ত সম্ভাবনা আশ্রয় পাবে।"

হাওড়া-সম্মেলনের পর বাণী আরও স্পষ্ট, গভীর আর ব্যাপক হয়ে উঠল আমরাবতী আর বেরারের ভাষণে : "আমরা আজ যে-সমাজ গড়ে তুলতে চাই তার মূল কথা হবে সকলের জন্যে সমান অধিকার, সমান সুযোগ, ধন-সম্পত্তিতে সকলের সমস্বামিত্ব, সমাজের বৈষম্য-মূলক বিধান প্রত্যাহার, জাতিভেদ প্রথা লোপ এবং সর্বোপরি বিদেশী শাসন থেকে অব্যাহতি।"(১)

কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত হয়েছে। কংগ্রেসের সবকিছু নিষিদ্ধ। মায় নামটাও। কিন্তু তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? গোপন এ্যাক্‌সন কমিটি গঠন করা হল নেতার নেতৃত্বে। কমিটির প্রথম সভ্য হলেন, পূর্ণদাশ, ডাঃ যতীন দাশগুপ্ত, ঊর্মিলা দেবী, রাজেন দেব, কিরণ শঙ্কর রায় ও আমি। পরে যোগ দিলেন কৃষ্ণদাশ। মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম বিশ্বস্ত অনুগামী হয়েও কৃষ্ণদাশ সুভাষচন্দ্রের ছিলেন গুণমুগ্ধ ভক্ত। ত্যাগে, নিষ্ঠায়, দেশের প্রতি অনাবিল প্রেমের দুর্জয় প্রেরণায় যে-ব্যক্তি অনন্য, তাঁকে

---

(১) ১৯২৯

উপেক্ষা করবার মত মূঢ়তা, গোঁড়ামি ও ক্ষুদ্রতা কৃষ্ণদাশের ছিল না।

এ্যাক্‌সন কমিটির হাতে কংগ্রেসের কাজ ছেড়ে দিয়ে নেতা নিজে বেরিয়ে পড়লেন বাইরে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এবং বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের নানা জেলায় চলল ওঁর অভিযান। জানুয়ারী মাসে নিয়ে গেলাম পাবনায়।

পাবনা সহর তখন ছিল বুনোণী শিল্পের আমেদাবাদ। পাবনার গেঞ্জী, মোজা ও হরেক রকম পোষাক বাংলার সবস্থানে আর বাংলার বাইরেও হত বিশেষ ভাবে আদৃত। তিন দিন অবিরাম চলল নেতার কাজ। জনসভা থেকে কর্মিসভা, সেখান থেকে কারখানা,—তারপর গ্রামাঞ্চল। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও-বা গাড়ীতে,—সে এক অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ।

নেতার বিদায়ের দিনে ঘটল এক কৌতুকজনক ঘটনা। ঈশ্বরদি স্টেশনে জনতার স্রোত ঢুকে পড়ল প্রবল ও প্রচণ্ড আকারে, পুলিশের নিষেধ, ওপরওয়ালার চোখ রাঙানি বাধা দিতে পারল না। জনতার এ-বেয়াদপি বরদাস্ত করা পুলিশের পক্ষে একটু কষ্টকর হয়ে উঠল। নেতার গাড়ী ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠল। আটক পড়লাম আমরা জনা দশেক। নেতার বিদায়ী বন্দেমাতরম্ তখনও জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে ; সে ধ্বনি তীব্রতর হল আমাদের অভ্যর্থনায়।

নাটোরের গাড়ীতে চাপিয়ে পুলিশ নিয়ে গেল আমাদের নাটোর জেলে। পুলিশের দৃষ্টির অগোচরে জনৈক ইউরোপীয় রেল কর্মচারী আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেলেন একখানা পেট-মোটা খাম। গাড়ীর ভেতর খুলে দেখি প্লাটফর্ম টিকিট, আর ঠিক দশ খানাই।

দিন কয়েক পর বিচারের প্রহসন সাঙ্গ হল। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিনা-টিকিটে প্লাটফর্মে ঢোকা। কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টার সাড়ম্বরে অভিযোগ পেশ করে বসবারও সময় পেল না। আমি

বিচারকের সম্মুখে এগিয়ে দিলাম দশখানা টিকিট। ততক্ষণে শীত ছাপিয়ে পুলিশের কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ফিরে সেই অফিসারটিকে খুঁজে বের করেছিলাম। জাতে উনি ছিলেন আইরিশ, আর একদা ছিলেন সিন্‌ফিন্ সঙ্ঘের সভ্য।

১৯৩১এর ২৬শে জানুয়ারী।

মুক্তি-ব্রতের বাৎসরিক সংকল্প গ্রহণের দিন।

সারা কলকাতায় ইংরেজ সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে। সভা হতে দেবে না। মিছিল বন্ধ রাখতে হবে।

বে-আইনী কংগ্রেসের গোপন কাজ চলছিল এ্যাক্‌সন কমিটির মারফৎ। কমিটির বৈঠক হচ্ছিল এক-একদিন এক একজনের বাড়ীতে। সেদিনেরটা হয়েছিল উড্‌বার্ন পার্কেই।

ইংরেজ পণ করেছে অনুষ্ঠান রুখতে হবে। দেশবাসীর পণ ব্রত পালন করতে হবে। জীবনের বিনিময়েও করতে হবে। আশা আর নিরাশা তোলপাড় করে বুকের ভেতর। বেশি লোক কি সাড়া দেবে? উদ্ধত ইংরেজের পাশবিক শক্তি মাংসাশী দন্ত বের করে দাঁড়িয়েছে। রক্তলোলুপ ওর জিহ্বা। ধারালো নখর তীক্ষ্ণ করে তুলেছে অস্থির পদক্ষেপে। কপিশ চক্ষু-কোণে রক্ত উঁকি মারে। মনে কি ভয় জাগল? জাগল মৃত্যুভীতি?

দেড়শো বছরের নাগপাশ। অমনি করেই ও ভয় দেখিয়েছে চিরকাল। আর এই ভীতির ওপর গড়ে তুলেছে বিরাট সাম্রাজ্য। ভয়কে ভয় দেখাবার সময় এসেছে। এ-মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয় জাল। ওদের শেকল পরেই ছিঁড়তে হবে লোহার শেকল খান খান করে। পাশ-জর্জর জাতি আর কতকাল বইবে এই কলঙ্ক-জিঞ্জিরের গুরুভার?

এ্যাক্‌সন কমিটির গোপন বৈঠকে নেতা আলোচনা করছিলেন পরিস্থিতি। সত্যাগ্রহের উদ্বেল জোয়ার মন্থর হয়ে এসেছে। চারদিক

থেকে ভেসে আসছে চাপা গুঞ্জন। গান্ধীজি নাকি ইংরেজের সঙ্গে রফা করতে চাইছেন। আবার সেই আপোষের অভিনয়। দর কষাকষি। বিবৃতি আর পাল্টা জবাব। সত্যিই কি গান্ধীজি আপোষে রাজী হবেন? সমগ্র জাতিকে সংগ্রামে নামিয়ে দিয়ে আচমকা থেমে যাবেন?

১৯২২এর কথা ওঠে। সেদিনও ঘুমন্ত জাতির জাগরণ-মুহূর্তে আবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল। নেতিয়ে পড়ল সমগ্র জাতি। একবছরে স্বরাজ হবে! কী দুর্বার কল্পনার মুক্ত ধারা জাতিকে পাগল করে তুলেছিল!

রণোন্মাদ জাতির কানে বেজে উঠল তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ। "নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।" ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা বাতাসে উড়ছে না? বার বার কি এমনি করেই ভাগ্য তার জীবন আর অদৃষ্ট নিয়ে পরিহাস করবে?

ঘুম-ভাঙ্গা জাতির মনের বুকের আগুন সে রাখবে কোথায়? কী দিয়ে চাপা দেবে? আর চাপতে চাইলেই কি চাপা যায়!

সংগ্রামের গতিরুদ্ধ করে কীই-বা পাওয়া গেল? বিশাল ভারতবর্ষের কোন-এক কোণে তুচ্ছ একটা অনাচার,—কিন্তু সংগ্রাম থামিয়েই কি অনাচার আচার হয়ে উঠল?

বাংলার শ্যামল বুকে লাল আর উষ্ণ রক্তের যে-স্রোত বইল, ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল সোনার চাঁদ ছেলের দল, তার দায়িত্ব বহন করবে কে?

তাছাড়া স্বাধীনতা আর পরাধীনতার ভেতর রফার কথা, আপোষের কথা কীই-বা থাকতে পারে? বিদেশী ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে হবে। এক বছরে হোক, আর শতবর্ষে হোক। আমি না পারি, আমার পুত্র, পৌত্র, পরবর্তী বংশধর এ-সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। আমার ক্লৈব্য আর অক্ষমতার কলঙ্ক স্বীকার করবার শক্তি যদি নাই থাকে, জাতির ভবিষ্যতের বুকে এমন করে পাষাণ চাপা দেবার অধিকার আমায় কে দিল?

কিরণ শঙ্কর রায় বললেন,—"কিন্তু প্যাক্টের শুভ দিক কি কিছুই নেই ?"

"কী আছে আপনিই বলুন।" বললেন নেতা।

"এই সর্বপ্রথম ইংরেজ কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নিতে চাইছে।"

"না।" বললাম আমি। "জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়, শক্তিমান একটা প্রতিষ্ঠান বলে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে কংগ্রেসকে স্বীকার করলে ইংরেজের কূটনীতির সবটাই বাণচাল হয়ে যাবে।"

"ওটা ছাড়াও আরও একটা কথা আছে। প্যাক্‌টিই হয়তো শেষ কথা নয়। এর পর গান্ধীজিকে ওরা রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্সে ডাকবেই।" শেষ করলেন কিরণবাবু।

একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠল নেতার মুখে। এর মধ্যেই ফল ফলতে শুরু করেছে। এখনও প্যাক্‌ট্ হয়নি। হবে। আর সেই আশায় নিজের দরদী বন্ধুদের অন্তরেও পূর্বাহ্নেই দোলা লাগতে লেগেছে। একেই কি বলে সংক্রামকতা ?

নেতা কিরণবাবুর দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন। পরে বললেন,—"ওটা অনুমানের কথা নয় কিরণবাবু, ওটা পরিণতি। আর প্যাক্টের ওটাও হবে একটা সর্ত।" একটু থামলেন নেতা। হাতের কলমটা দুহাতে চেপে ধরে আবারও বললেন,—"ঐখানেই আমার আপত্তি।"

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর জাতি সংগ্রামমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার বার এমনি করে এর গতি ব্যাহত করলে পরিণাম কি শুভ হবে ? ব্যর্থ হতাশা দেখা দেবে না ? জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে না ? বহু সাধনায় পরাধীন জাতির ঘুম ভাঙ্গে। জাগবার পর-মুহূর্তেই তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিলে তাকে কি আর সহজে জাগানো যাবে ? তাছাড়াও, যে পরম বিশ্বাস নিয়ে জাতি অনন্ত দুঃখ আর ত্যাগের কৃচ্ছ্রতা বরণ করে নিতে উৎসুক হয়ে উঠেছে, সে বিশ্বাস কি অটুটই থাকবে ?

গভীর রাত্রে সভার কাজ শেষ হল। সিদ্ধান্ত হল, মনুমেন্টের

বেদীর ওপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। কলকাতার সর্বত্রই এ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে কিন্তু মূল মিছিল পরিচালনা করবেন নেতা। তাঁর সঙ্গে থাকবেন রাজেন দেব। রাজেনবাবু তখনও সেনগুপ্ত-গোষ্ঠীর সভ্য। পরবর্তীকালে রাজেনবাবু সুভাষ-গোষ্ঠীর একান্ত শ্রদ্ধেয় এবং নির্ভরযোগ্য নেতা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

এই অকৃতদার নির্ভিক বৃদ্ধ কেন-যে চির বিপ্লবী সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্ব অঙ্গীকার করে জীবন-সায়াহ্নে নির্যাতন আর দুঃখের নির্মম নিমন্ত্রণে সাড়া দেবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তুললেন, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বিচারের খেই হারিয়ে ফেলেছি বার বার। শুধু তো রাজেনবাবুই নন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই-বা সুভাষকে এমন অকৃপণ হয়ে আশীষসিক্ত করলেন কেন? আরও একটি মানুষ,—ললিতমোহন দাসগুপ্ত। সুভাষ-গোষ্ঠীর পিতামহ ভীষ্ম। মহাত্মা গান্ধীর উদার ও ত্যাগক্লিষ্ট ধর্মানুরাগ, তাঁর আচারনিষ্ঠা ও আনুষ্ঠানিক জীবনযাত্রা, সর্বোপরি তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস-মিশ্রিত রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি এঁরা আকৃষ্ট হবেন, এটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক। মহাত্মাজি কবিকে ডাকতেন গুরুদেব বলে। তবুও। কিন্তু কেন?

কবিকে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয়নি কিন্তু রাজেনদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে অনেক পরে। রাজেনদা বলেছিলেন,—"কী জানো, আমি হিন্দু বলে।" চায়ের বাটীতে চুমুক দিয়ে আরও বলেছিলেন,—"বিগ্রহের পূজোয় আমি বিশ্বাসী। সুভাষ অনাগত বিপ্লবের হবে স্রষ্টা। ওর ভেতর আমি দেখতে পাই সেই বিপ্লবের বিগ্রহ-রূপ।"

গভীর রাত্রি। উড্‌বার্ন পার্কের প্রকোষ্ঠে আমরা বসে, সুভাষ-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গেরা। সামনের রাস্তায় পুলিশের আনাগোনা জানতে বাকি থাকে না। মাঝে মাঝে মোটর সাইক্লের উগ্র ভট্ ভট্ আওয়াজ। তীক্ষ্ণ হর্ণ। সার্জেন্ট দেখে যায় পাহারাদারদের। নজর রাখে সাম্‌নের ঘর খানার ওপর। নেতার বসবার ঘর। কিন্তু সে-ঘর অন্ধকারে ঢাকা। শূন্য। আমরা বসেছিলাম পূব দিকের ঘরে। ছোট একটা আলো জ্বলছিল।

কিরণবাবু ও পূর্ণবাবু নেতার সঙ্গে থাকবেন মিছিলে। আর থাকবেন শৈলেন ঘোষাল ও ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ওরা কি সত্যিই মিছিল বের করতে দেবে? তার আগেই যদি সবাইকে বন্দী করে?

"রাতটা খুবই সতর্ক থাকতে হবে।" হাসতে হাসতে নেতা বলছিলেন। "আমাকে ওরা আটকাতে পারবে না। মিছিল বের করতেই হবে।"

আজ মনে পড়ে, এই কথা কয়টির প্রতিধ্বনি আর একদিন ঐ মুখ থেকেই বের হয়ে এসেছিল। অনেক পরের কথা। কিন্তু এমনি সাবলীল। এমনি বজ্রগর্ভ।

"ইংরেজ সর্বশক্তি দিয়েও ভারতের বাইরে আসা আমার আটকাতে পারেনি। আর যেদিন আমি ভারতবর্ষে প্রবেশ করব, সেদিনও ও রুখতে পারবে না।"

কিন্তু আমি? নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আমি অপেক্ষা করছিলাম। ললিতবাবুর দিকে তাকিয়ে নেতা বললেন,—"আপনি কিন্তু বাড়ীতেই থাকবেন।"

"কেন? বৃদ্ধ বলে অনুকম্পা হচ্ছে?"—বললেন ললিতবাবু।

"না, না।" একটু থেমে নেতা বললেন,—"যৌবনের দাবী মানবেন না?" অস্বস্তিতে মন বুক ভরে উঠছে। কণ্ঠ ঠেলে একটা প্রবল ধীক্কার বেরিয়ে আসতে চাইল। অমনি এক জোড়া শান্ত দৃষ্টি এসে পড়ল আমার মুখের ওপর। বললেন,—"তুমি যাবে না।"

কেন? অযোগ্য বলে? অভিমানে আমি ভেঙ্গে পড়লাম। আর কোন কথা আমার মুখ থেকে বেরোল না। শুধু বললাম,—"যাব না?"

"না।"

আমি পাথর হয়ে গেলাম।

একজন একজন করে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন উড্‌বার্ন পার্ক থেকে। রাত কত খেয়াল নেই। নেতা বেরিয়ে এলেন আমার হাত

ধরে। ল্যান্স্‌ডাউন রোড ধরে চলতে চলতে ট্যাক্সী ডেকে আমরা চেপে বসলাম। গাড়ী চলল আমার বাসার দিকে। রিচি রোডে।

বাকি রাতটুকু আর ঘুমোইনি। আমার ঘরখানার সামনেই ছিল মস্ত বড় ছাত। ছাতের আল্‌সে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

গাড়ীতে উঠেই নেতা বলেছিলেন,—"তুমি মনে কিছু করো না। সবাই একসঙ্গে গেলে এর পরের ব্যবস্থা চলবে কেমন করে?"

পরের ব্যবস্থার জন্যে আর কাউকেই কি পাওয়া গেল না? এই বিরাট যজ্ঞের কোনও অংশই নেবার আমার থাকল না। কিন্তু নেতার আদেশ। নিরুত্তরে সে আদেশ মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর রইল না।

যাবার সময় একটা ফাইল হাতে দিয়ে নেতা আমাকে বললেন,—"এর ভেতর সব পাবে। পর পর সাজানো আছে। আগুন যেন না নেভে। চলি। কেমন?"

ঘরে ঢুকে ফাইলটা খুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল—"আমরা সবাই যদি বন্দী হই, এর পর আমাদের পার্টির তরফ থেকে এ্যাক্‌সন কমিটির নেতৃত্ব করবেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী।" নেতার নিজের হাতের লেখা।

সকাল হল। শীতের সকাল। ছাতেই আমি পাইচারী করছিলাম। কে একজন এসে কাগজ দিয়ে গেল। কাগজে বড় বড় হরফে বেরিয়েছে, কিরণবাবু আর পূর্ণবাবুকে পুলিশ তাঁদের গৃহেই আটকে রেখেছে, বাড়ী ঘেরাও করে। নেতার বাড়ীর সাম্‌নেও অনেক পুলিশ মোতায়েন। হয়তো তাঁকেও বেরোতে দেবে না।

নিদারুণ পরাজয়ের কালি-কলঙ্ক চোখের সম্মুখে ফুটে উঠল। ব্যর্থ হয়ে গেল! এত বড় আয়োজনের এই হল পরিণাম? আর তাও এমন শোচনীয় ভাবে?

ইংরেজও হয়তো ভাবতে পারেনি যে, এত সহজে কার্যোদ্ধার

হবে। মনের বুকে পাথরের বোঝা। পরাজয়ের কালির পোঁচ মুখে লেপা। বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম বাইরে।

ম্যাডাক্ স্কোয়ার পেরিয়ে সবে ল্যান্স্ডাউনে পড়েছি। দূর থেকে দেখলাম হন্ হন্ করে ছুটে আসছে কুমুদ। কুমুদ ভট্টাচার্য। সেদিনের ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম নেতা। সুদর্শন যুবক। প্রাণবান। কুমুদ মারা গেছে। সাম্নে থমকে দাঁড়িয়েই কুমুদ বলে উঠল,—"কিসুছু ভাববার নেই। মিছিল হবেই। নেতাকে ওরা আটকাতে পারেনি।"

"তিনি কোথায় ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"কর্পোরেশনে।" বলেই কুমুদ হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, "কেউ বুঝতে পারেনি। ওরা ভাবছে উনি বাড়ীতেই আছেন। একগাদা পুলিশ বাড়ী পাহারা দিচ্ছে—হো-হো-হো..."

কুমুদের হাসি আর থামেই না।

উত্তাল উত্তেজনার ঝড় বইছে বুকে। জাতির শক্তি পরীক্ষার দিন। আহত সিংহ ক্ষেপে উঠেছে। ক্ষেপে উঠেছে ওর পরিপূর্ণ হিংস্রতা নিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়বে জাতির বুকে। তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা বসিয়ে দেবে জাতির হৃদ্‌পিণ্ডে। রক্ত ঝরবে। সে রক্ত উষ্ণ, গাঢ়, টক্‌টকে লাল।

দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। হাজার ছেলে জোগাড় করতে হবে যারা ভয়ে পালাবে না। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াবে বুক ফুলিয়ে। কুমুদ বলল,—"চারদিকেই সংবাদ গেছে। সবাই যোগ দেবে। নেতা হাজার চেয়েছেন। অনেক বেশি এসে পড়বে।"

আনন্দে গর্বে দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। জীবনের ভুল ও ভ্রান্তির বোঝা সব একত্র করেও-যে প্রাপ্তির পর্যাপ্তি ভারী হয়ে উঠতে চায়। জীবনের ক্ষয় আর অপচয়ের হিসাবই তো সব নয়। সহস্র ব্যর্থতার অপমৃত্যু যে বৃহৎ পাওয়া সৌরভে আর সুষমায় অপরূপ করে সাজিয়ে দিল তাকি একান্তই তুচ্ছ করবার মতো ? দুর্জয় হিমাচলের

মতো নেতা। যার গর্বোন্নত মাথা নোয়াতে পারল না কেউ কোন দিন। সেই নেতা নির্বাচনে তো ভুল করিনি। একি কম প্রাপ্তি?

বাড়ী ফিরলাম বেলা দুটোয়।

খাবার কথা মনেও এল না। উৎকর্ণ হয়ে থাকলাম। ময়দানের আওয়াজ শোনা যায় না? চাপা গুমগুম ধ্বনি? না। মোটর চলে গেল। চারতলার ছাত। অনেক দূর দেখা যায়। দেখা যায় হাইকোর্টের চূড়া। তার পাশে মনুমেন্ট। আশে-পাশে জনতা না? পিঁপড়ের সারির মতো চলেছে। চলেছে কাতারে কাতারে। হাজারে হাজারে।

ছুটে বেরিয়ে এলাম বাড়ী ছেড়ে। নেতার আদেশ অমান্য করা যাবে না। কিন্তু দেখবও না? এই বিরাট দৃশ্য, এই আশ্চর্য ইতিহাস, এই নবসৃষ্টির অপরিমেয় অবদান? না দেখে থাকব কেমন করে?

সারা কলকাতা কি ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে? এত মানুষও ছিল? ট্রামের গুমটি থেকে এপাশের পুকুরধার,—সবটা মানুষে ভরতি। ঠাঁসা। এদিক থেকে এগোবার উপায় নেই। লিন্‌ড্‌সে ষ্ট্রীট ঘুরে যেতে হবে।

লেড্‌ল্যর বাড়ীর সামনে। নিরেট পাঁচিল। মানুষের পাঁচিল। হৈ-হৈ করে পুলিশের বহর ছুটছে। হাঁকরাচ্ছে। হাতের লাঠি আস্ফালন করছে। বড় বড় লাঠি দু'জনায় ধরে মানুষ ঠেলে দিচ্ছে। পাঁচিল ভেঙ্গে যায়। মুহূর্তের জন্য। পুলিশ সরে যায়। পাঁচীল জোড়া লাগে। ওরই ফাঁকে এগিয়ে গেলাম। গেলাম ওপারে।

মনুমেন্টের চারদিকে অগুণতি পুলিশ। লালমুখো সার্জেন্ট। হাতে ওদের মোটা লাঠি। পেছনে কাতার-বাঁধা ঘোড়সওয়ার। মাথায় ওদের পাগড়ি। পাশে ঝোলানো লাঠি।

সহসা আকাশ ফেটে পড়ল। বাজের আওয়াজ। সহস্র কণ্ঠের বন্দেমাতরম্। তড়িৎ প্রবাহ বয়ে গেল জনতার হৃদয়ে হৃদয়ে। বাসুকি কি কেঁপে উঠল? দেখা দিল ঝাণ্ডার মাথা।

ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময় নেতা সকলের পুরোভাগে। হাতে পতাকা। নগ্ন পা। গায়ে উত্তরীয়।(১) দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। কোনও দিকে চোখ নেই। আগে, সম্মুখে, সুদূর আকাশের গায়ে একজোড়া স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিজয়ীয় দীপ্ত ভঙ্গী ওঁর সারা অঙ্গে। একটানা হুঙ্কার বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে—বন্দেমাতরম্। দু'পাশে ক্ষিতীশ আর শৈলেন।

আগে চল। আগে চল। উন্মাদ জনতা। মিছিলের সম্মুখ ভাগ ট্রাম লাইন পেরিয়ে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র হায়েনার দল। ইংরেজের পোষা হায়েনা। শিকারি হায়েনা।

বৃষ্টির ধারার মতো লাঠি পড়ছে নেতার ওপর। ডাইনে পড়ছে। পড়ছে বাঁয়ে। দৃকপাত নেই। এগিয়ে চল। আগে চল।

লালমুখো সার্জেন্ট একটা ঝাণ্ডা ধরে ফেলে। বজ্রমুষ্টি নেতার। কাড়তে পারে না। শৈলেন পাশ থেকে ছিটকে পড়ে। ক্ষিতীশ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। দৃপ্তসিংহ দু'হাতে পতাকার দণ্ড ধরে ঠেলতে থাকে পুলিশের পাঁচীল।

দলে দলে ছেলের দল মাটিতে ঢলে পড়ে। ফিনিক দিয়ে রক্ত ছোটে। লালরক্তে রাজপথ ভিজে ওঠে। কলকাতার রাজপথ। এলো-পাথারি অনর্গল লাঠি পড়ে নেতার মুখে, মাথায়, দেহের ওপর। সাম্‌নে জ্যোর্তির্ময়ী গাঙ্গুলী উন্মাদিনীর মতো চেঁচিয়ে ওঠেন,—"উনি কলকাতার মেয়র। ওঁকে অমন করে মেরো না।"

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছি নেতার। আমার সবল দু'টি বাহু প্রসারিত করে দিলাম দু'দিকে। নেতার দু'টো পাশ আর পিঠের দিকটা ঢেকে। ডান পাশ থেকে ছুটে আসে আরেকটা ফিরিঙ্গী সার্জেন্ট। হাতে তার

(১) নেতার একজন জ্ঞাতি এই সময়ে লোকান্তরিত হন। নেতা অশৌচ পালন করছিলেন।

বড় লাঠি। আরক্ত নয়ন থেকে নগ্ন হিংস্রতা ঝরে পড়ে। লাঠি তুলে নেয় মাথার ওপর। সবলে নেতার মাথা লক্ষ্য করে চালিয়ে দেয় লাঠি।

ধাক্কা মেরে নেতাকে সরিয়ে দিলাম বাঁদিকে। লাঠি পড়ল। পড়ল আমার ব্রহ্মতালুর ওপর। খুলি ফেটে গেল। চোখ-মুখ ভেসে গেল রক্তের স্রোতে। অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। ততক্ষণে নেতা এগিয়ে গেছেন আরও খানিকটা।

পতনোন্মুখ দেহটা আমার জড়িয়ে ধরলেন অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী। আমাদের এ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর অধিকর্তা। গাড়ীতে তুলে দিলেন আমার অবসন্ন দেহটা। পাশে বসলেন রাজকুমারবাবু। গাড়ী ছুটে চলল মেডিকেল কলেজের দিকে।

চার

৮ই মার্চ, ১৯৩১, গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হল। কিন্তু চুক্তির গোড়াতেই এমন একটা বিসদৃশ ও হৃদয়হীন আচরণ ইংরেজ-রাজ-প্রতিনিধির চরিত্রে প্রকাশ পেল যাতে করে এর ভবিষ্যৎ অনুমান করা হয়তো একান্তই ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু গান্ধীজির সহজাত অতি-বিশ্বাস-প্রবণতা ও নিজের প্রবর্তিত এক বিশেষ মতবাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য-কামনা তাঁকে এটা অনুমান করতে দেয়নি। ভাষ্যকার এই ভ্রান্তি, অক্ষমতা আর দুর্বলতাকে মহাত্মাজির অলৌকিক সারল্য, মহাপুরুষ জনিত উদারতা এবং তাঁর উদ্ভাবিত সত্যাগ্রহের অপরূপ মহিমা বলে ঘোষণা করুক,—কিন্তু ইংরেজের বাস্তব, ক্রূর ও দোকানদারী রাজনৈতিক সচেতনতা একে চিরদিন রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাই বলতে চাইবে।

মহাত্মাজি মনে করেছিলেন, পাদ্রী আরউইনকে তাঁর ধর্মের

পুট-পাকে তৈরী রাজনীতির নবরূপে মুগ্ধ করে তাঁর কাছ থেকে ভগৎসিং এর জীবন ভিক্ষা আদায় করে নেবেন এবং সেটা করা-যে তাঁর পক্ষে বেশি কঠিন হবে না এমর্মে তিনি দেশবাসীকে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু পাদ্রী আরউইন জানতেন যে, তাঁর সাম্রাজ্য টিকে না থাকলে ধর্মও অচল হয়ে একদিন পঞ্চত্ব পাবে। সেই সাম্রাজ্য গান্ধীজির নতুন টেক্‌নিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হয়তো কিছুকাল অথবা দীর্ঘকালও টিকে থাকতে পারবে কিন্তু ঐ-যে ভগৎ সিংএর দল, ওরা ভবিষ্যতের আর বিশেষ করে এইক্ষণের সব চাইতে বড় ও মারাত্মক শত্রু। আর, তাই, আরউইন গান্ধীজির সঙ্গে করেন প্যাক্ট আর ঝোলান ভগৎ সিং-শুকদেব-রাজ-গুরুদের ফাঁসি কাঠে। চুক্তির ফলে তখন সত্যাগ্রহ প্রত্যাহৃত হয়েছে।

২৬শে জানুয়ারীর জন্যে নেতার হয় ছমাসের কারাদণ্ড। ৮ই মার্চ অর্থাৎ যেদিন চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেই দিনই নেতা পেলেন মুক্তি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই—১৪ই মার্চ রওনা হয়ে গেলেন গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে বম্বে।

লাহোর কংগ্রেসের পর সবে একবৎসর কেটেছে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কি কাগজেই শুধু মূর্ত হয়ে থাকবে? দেখা দেবে না আকার নিয়ে? আপোষ আর চুক্তি করে-যে পূর্ণ স্বাধীনতা কোনও দিন কোনও দেশে সম্ভবপর হয়নি, ইতিহাসের এই সহজ সত্য অস্বীকার করে গান্ধীজি কাকে বোঝাতে চাইছেন তাঁর সত্যের প্রতি অচল আগ্রহ? নেতা প্রতিবাদ করলেন, বিতর্কের মাধ্যমে গান্ধীজির মত পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন বাংলায়।

আসন্ন করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনে এক চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার ফলাফল দেখবার জন্যে শুধু এদেশের লোকই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকল, তা নয়, দেশ-বিদেশের অনেকেই সেদিন চকিত হয়ে উঠল।

গান্ধী-নেতৃত্ব এই দ্বিতীয়বার বিরুদ্ধ ধাক্কার সম্মুখান হল। সেদিন প্রকাশ্যে গান্ধীজিকে শুধু অকুণ্ঠ কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা নয়,—সংগ্রামী ভারতবর্ষের অন্তরে দীর্ঘ দিনের পর এই-

বার বিশেষ করে গান্ধী প্রবর্তিত পন্থা ও গান্ধিবাদ সম্পর্কে সংশয়ও দেখা দিল।

১৯৩০এর সত্যাগ্রহ গান্ধী-জীবনের শেষ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়ে গেছে। গভীর রাত্রি। আমরা অনেকে নেতার ঘরে বসে ছিলাম। গান্ধীজি নেতাকে ডেকে নিয়ে গেছেন নিভৃতে।

পাঞ্জাব, বাংলা আর অন্যান্য প্রদেশের অগুণ্‌তি সংগ্রামমুখী যুবক করাচীর মুক্ত প্রাঙ্গনে জমায়েৎ হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে চলেছে বিচার। চলেছে আপোষের বিরুদ্ধে তীব্র তিক্ত সমালোচনা। নও-জোয়ানের দল আর অগণিত নির্যাতিত বিপ্লবী ঘুরছে এখানে ওখানে সেখানে। দীর্ঘ আলোচনার পর নেতা ফিরে এলেন শিবিরে।

গান্ধী-সুভাষ চুক্তি হয়েছে। নেতা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে গান্ধী-প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন না কিন্তু আর সর্বত্র তাঁর মত প্রকাশের থাকবে অবাধ স্বাধীনতা। গান্ধী এ সর্ত মেনে নিয়েছিলেন। (১) সঙ্কটময় জাতীয় জীবনে সেদিন কংগ্রেসের ভেতরকার মতান্তর যাতে করে অন্তত ইংরেজের চক্ষে ধরা না পড়ে, নেতা শুধু এই প্রশ্ন মনে রেখেই গান্ধীর সঙ্গে সেদিন আপোষ করেছিলেন। গান্ধীজিরও গত্যন্তর ছিল না। ঘনায়মান অবিশ্বাস জনতার মনে দানা বাঁধছে, লোক চরিত্রজ্ঞ গান্ধীর পক্ষে এটা বুঝতে পারা দুষ্কর ছিল না।

আরও একটা কথা ছিল : গান্ধীজি সেই দিনই একথা জানতেন যে, ইংরেজের কাছ থেকে পরবর্তী নিমন্ত্রণ আসবে গোল টেব্‌ল্‌ বৈঠকে যোগদান করবার জন্যে। অখণ্ড কংগ্রেস আর দ্বিখণ্ডিত কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকি। আর তার প্রতিনিধিত্বেরও।

কংগ্রেসে ভগৎসিংএর বীরত্ব আর দেশপ্রেমের স্তুতি গেয়ে প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। অতীত জ্যান্ত হয়ে উঠল

(১) ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, ১৯২০-১৯৩৪, ২৯০ পৃঃ।

শবাধার থেকে মোড় ফিরে। এই মহাত্মা গান্ধীই ১৯২৪এ গোপীনাথ সাহার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদনের বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর সঙ্গে কতই-না বাদানুবাদ করেছিলেন। এবং সেদিন বাংলার যে-কতিপয় গান্ধিভক্ত (যেমন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ) সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, গান্ধী-চাপে তাঁদের চরিত্রস্খালনের অপরাধ স্বীকার করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন। মানুষ অনেক কথাই সুবিধের খাতিরে ও গরজের তাগিদে ভুলে যায়। কিন্তু প্রকৃতি? নির্মম অনাসক্ত ক্ষমাহীন তার রূপ।

গান্ধী-সুভাষ চুক্তির কথা জানা-মাত্র কংগ্রেসের প্রধান আকর্ষণ কমে গেল। নওজোয়ান আর লাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে সভাপতি রূপে নেতার কণ্ঠে বজ্র ধ্বনিত হয়ে উঠল। গান্ধী-মতবাদ আর সুভাষ-মতবাদের পার্থক্য দেশের বুকে ফুটে উঠল আরও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ হয়ে। দেশবাসী দেখল, জানল, বুঝল যে, গান্ধী-প্রভাব অতিক্রম করে আর একটি শক্তি জাতির কর্ণধার হবার জন্যে এগিয়ে আসছে, যার নির্ভিক দুটি শক্তিশালী বাহুই শুধু নয়, অচিন্ত্য ও অভূতপূর্ব ক্ষুরধার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিভাও অদূর ভবিষ্যতে তাকে দেখিয়ে দেবে সুনিশ্চিত পথ আর সার্থক করে তুলবে বহু প্রতীক্ষার মুক্তি-এষণা।

১৯৩১এর জুন মাস। বম্বেতে ওয়ার্কিং কমিটির সভা। নেতা যাবেন,—ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হিসেবে নয়,—ওটা আগেই, ১৯২৯এ বাতিল করা হয়েছিল,—নেমন্তন্ন পেয়ে। আরও কারণ ছিল। গান্ধী আরউইন প্যাক্টের হিসেব নিকেশ। আর ছিল সুভাষ-সেনগুপ্তের মামলার বিচার। গান্ধীজিই তাই বিশেষ করে নেতার উপস্থিতি চাইছিলেন।

নেতার কার্যকলাপ সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কর্তৃপক্ষ বিচলিত হয়ে উঠেছেন। ১৯৩০ থেকে '৩১ পর্যন্ত বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে নেতা নাকি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। একথা অভিযোগকারীরা ঢেকে-চেপে বলেনি, বলেছে প্রকাশ্যে। মুখে বলেছে। লিখে

জানিয়েছে। অভিযোগকারীদের ভেতর ছিল গোঁড়া গান্ধিভক্তের দল, ছিল সুভাষ-বিরোধী দল,—বিরোধিতা করতে হবে বলেই যারা হয়েছিল বিরোধী। আর ছিল ইংরেজের সরকারী দল।

১৯২৫এর জুন মাসে দেশবন্ধু দেহত্যাগ করেন। নেতা তখন মান্দালয়ে। জীবিতকালে দেশবন্ধুর নেতৃত্ব বাংলায় অবিসংবাদী না হলেও ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেদিনও বিরোধী দল ছিল। ছিল খাদি-গোষ্ঠী, উত্তর কলকাতার অধিকাংশ, বেশির ভাগ সংবাদপত্র, আর এখানে ওখানে ছড়ানো দু'চার জন। স্বরাজ্য দল গঠন করে দেশবন্ধু যেদিন তাঁর কর্মধারা কংগ্রেস থেকে অনুমোদন করিয়ে নিলেন, গান্ধীজি সরে দাঁড়ালেন কংগ্রেস থেকে। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিভা তখন লোকে বুঝতে আরম্ভ করেছে। স্বীকার করে নিয়েছে ওর উপযোগিতা! কিন্তু বাংলা দেশের এই বিরোধী-নেতৃত্ব এবং প্রাধান্য এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞান প্রীতির সঙ্গে গান্ধীজি বা তাঁর অনুগামীরা স্বীকার করে নিতে পারেন নি।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর, তাই, গান্ধীজি বাংলায় এমন একজন নেতাকে চাইছিলেন, যিনি সর্বতোভাবে শুধু তাঁকে সমর্থন করবেন, তাই নয়,—গান্ধী মতের যিনি হবেন ধারক ও বাহক।

সুভাষচন্দ্র সেদিন কারাগারের বাইরে থাকলে কী হত বা হতে পারত, এ প্রশ্ন নিরর্থক। গান্ধীজির একান্ত বশংবদ অনুগামীদের মধ্যে বাংলায় এমন কেউ সেদিন ছিল না, যার ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব ও চরিত্র বাঙালীকে আকর্ষণ করবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারত। তাই গান্ধীজি বেছে নিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে! এর আগেই দেশবাসী যতীন্দ্রমোহনের নামের পূর্বে শ্রদ্ধাভরে জুড়ে দিয়েছে—'দেশপ্রিয়' শব্দটা।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে যতীন্দ্রমোহন তিন মাসের জন্যে আদালত বর্জন করেছিলেন এবং এই তিন মাস পর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যে-সব কারণে তিনি আবার আদালতের কাজে যোগ দিতে

বাধ্য হয়েছিলেন, অকপটে তিনি তা দেশবাসীর কাছে নিবেদন করে-ছিলেন। নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা ঢেকে মিথ্যাচারের আশ্রয়ে দুকূল বজায় রাখবার কাপট্য তিনি স্বীকার করে নেন নি। দেশবন্ধুর নেতৃত্ব তিনি রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সুভাষহীন বাংলার ত্রিরত্ন কপালে এঁটে দিয়ে যতীন্দ্রমোহনকে যেদিন গান্ধীজি বাংলার সার্বভৌম নেতৃত্বে বরণ করে গেলেন,—তাঁর মনোভাবের বিরূপ সমালোচনা না করেও একথা সেদিন অনেকে বলতে চেয়েছে যে, যতীন্দ্রমোহনের সবল ব্যক্তিত্বের ছত্র-ছায়ায় ঐ অবকাশে গান্ধিবাদ বাংলায় নিজেকে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা করবার একটা সুযোগ হয়তো পেয়ে গেল।

একথার বিরুদ্ধ-যুক্তি ছিল এবং তা থাকা স্বাভাবিকও। কিন্তু প্রশ্ন তবু থেকেই যায়। যতীন্দ্রমোহনের জীবন-যাত্রা, শিক্ষা, রুচি পারিবারিক অবস্থা, এবং সর্বোপরি তাঁর জীবন-দর্শন গান্ধিবাদ-বিরোধী একথা বলতে হয়তো বাধবে,—কিন্তু তিনি গান্ধিবাদ সমর্থক একথা বলবারও উপায় ছিল না। কিন্তু তবু তিনি পেলেন গান্ধীজির অকুণ্ঠ সমর্থন আর অযাচিত অজস্র স্নেহ।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভ থেকে বাঙালী একে কোনও দিনই প্রসন্ন মনে ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে চায়নি। এর ভেতরকার নেতিবাদ নয়,—বাঙালীকে আকর্ষণ করেছিল এর সংঘর্ষ-অংশ; সংগ্রামমুখী বিদ্রোহ-অংশ। ১৯২০র জানুয়ারী মাসে মুক্তিলাভ করে বাংলার বিপ্লবীরা যেদিন বাংলার কোলে ফিরে এল, ফিরে এল কারাগার থেকে, নির্বাসন থেকে, একমাত্র দেশবন্ধুই তাঁর অকুতোভয় দুটি প্রসারিত বাহু দ্বারা নিবিড় করে বুকের কাছে তাদের টেনে নিয়েছিলেন। তাদের কানে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, প্রেম দিয়ে তাদের নিরাশ অন্তরে আবার নতুন করে মুক্তির স্বপ্ন দেখবার পন্থা রচনা করে দিয়েছিলেন।

এক বছর। যুগ যুগ ধরে যে-সাধনা অব্যাহত চালাতে হবে, একটি বছর যদি বৃথাই যায়, ইতিহাস নিশ্চয়ই তাদের ক্ষমা করবে। ভবিষ্যৎ তাকে আরবার প্রতারণা নাও করতে পারে। তাছাড়া, এর ভেতরকার ভাবালুতা,—হয়তো বৃহৎ আদর্শ ও সমুন্নত মতবাদের কষ্ঠিপাথরে ওর মূল্য অকিঞ্চিৎকরই মনে হবে,—কিন্তু জনসাধারণের কর্মক্ষেত্রে তাও তো তুচ্ছ নয়। যা ছিল ক'টির মধ্যে, তা ছড়িয়ে পড়বে কোটীর মধ্যে। ছড়িয়ে পড়বে দূরে, অনেক দূরে।—চাষীর কুটীরে, অগণিত কুলি মজুর কারীগরি মেহনতি মানুষের বুকে মনে প্রাণে। উদ্বেগহীন স্বচ্ছন্দ পরবশতার বুকের ওপর আর কিছু না হোক একটা কিন্তুও তো ফুটে উঠবে!

আর যদি ব্যর্থই হয়, ঐ ব্যর্থতাই কি হবে চরম সত্য? শেষ কথা? ঐ ব্যর্থতার বুকের ওপর শব-সাধনার যে দিব্য আসন রচিত হবে, তাকে অস্বীকার করবে কে? কেমন করে?

একবছর কেটে গেল। মুমুক্ষু ভারতবর্ষের মুখের ওপর চেপে বসল আচম্‌কা একখানা কালো পর্দা। মোটা, কদর্য, অবিচল। গোটা আটটা বছর সে থাকল পড়ে সেই পর্দার আড়ালে।

ভারতবর্ষের আর কোন্ স্থানে সেদিন কেমন ও কতখানি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তার ইতিহাস জানা নেই কিন্তু বাংলা তাকে স্বাভাবিকও ভাবেনি, প্রসন্ন মনে তাকে অভ্যর্থনাও জানায় নি। সেদিন থেকেই বাংলার চির বিদ্রোহী সত্তা তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিয়েছিল। বেছে নিয়েছিল তার লক্ষ্য, তার পথের দাবী। এ-বাংলার সঙ্গে দেশপ্রিয়ের পরিচয় ছিল না।

১৯২৭এ নেতা এলেন বাংলায় ফিরে। গোপীনাথ বাংলার একটা ব্যতিক্রম বা বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়, একথা গান্ধীজি জানতেন। তাই সুভাষকে তিনি বাংলায় রাখতে চাননি। বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র তাঁকে বৃহত্তর নেতৃত্বের আমন্ত্রণ-লিপি-হাতে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা কম করেনি। কিন্তু নেতা দীর্ঘ কাল কারাগৃহের অন্তরালে বৃথাই

জীবন কাটান নি। সেখানে তিনি নিজেকে শুধু প্রস্তুত করেন নি, নিজেকে চিনেওছেন। অন্তরের শক্তি সাড়া দিয়েছে। প্রাণের পাবক-প্রবাহ জ্বলে উঠেছে নবজন্মের সূতিকাগার মান্দালয়ে।

মান্দালয়।

মান্দালয় শুধু কি কারাগার? বন্দীশালা?

মান্দালয় ভারতবর্ষের জাতীয় যজ্ঞের স্থণ্ডীল। হোমকুণ্ড।

তিলক আর লাজপতের মহা তপস্যার জ্যোতি রয়েছে না ওর সারা অঙ্গে? এ-তো শুধুই কারাবাস নয়, এ-যে তীর্থযাত্রা। হোমকুণ্ডে সমিধ দিতে হবে না? আর আহুতি?

ওকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। জাগিয়ে রাখতে হবে। জ্বালিয়ে রাখতে হবে অনির্বাণ। অগ্নিহোত্রী হোমাগ্নি জ্বেলে ঐ মান্দালয়ে যে অমোঘ সিদ্ধির একান্ত আশ্রয়ে নিজেকে ফিরে পেল, চিনে নিল, তাই-না অক্ষয় হয়ে ভবিষ্যতের যাত্রা-পথ রচনা করে দিল পরিপূর্ণ শক্তিসম্ভার আর আত্মার অফুরন্ত ঐশ্বর্য দিয়ে।

সিদ্ধির জয় মাল্য নিয়ে ফিরে আসে সাধক। ফিরে আসে বাংলার পেলবস্নিগ্ধ কোলে। অনাগত যুগে যে-নায়কের ভেতর দিয়ে একদা সমগ্র ভারতবর্ষ তার জীবন-সাধনার অনিবার্য মহিমা সার্থক ও সত্য করে তুলবে, শক্তি সাধনার মহাপীঠ এই বাংলা ছাড়া আর কোথায় হবে তার আসন প্রতিষ্ঠা?

এই বাংলা। বাংলা ছাড়া আর কোথাও নয়। ভারতবর্ষ তাঁর জগৎ জননী মা দুর্গা। কিন্তু বাংলা তাঁর মা জননী। বম্বের পথে বর্ধমান পেরিয়ে নেতা বললেন,—"বাংলা ছেড়ে আর কোথাও যেতে আমার মনে হয় বিদেশ যাচ্ছি। আচ্ছা, আমি কি প্রাদেশিক ভাবাপন্ন হয়ে পড়ছি?"

প্রাদেশিক! কেন? কিসে?

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও কি নিজের একটা আস্তানা থাকে না? কোনও গুহা? আশ্রম? কৌপিনের মায়াই না-হয় কাটানো গেল, তাই বলে উদোম হয়ে থাকতে হবে?

তাকিয়ে থাকলাম নেতার মুখের দিকে। শিশুর মতো সাদা সে চাহনি। বললাম,—"আচণ্ডালকে নিমাই কোল দিয়েছিলেন। কিন্তু তর্পণ করবার বেলায় নিজের মা ছাড়া আর কারও তর্পণ করেন নি।"

"বাংলার সবই আমার ভালো লাগে।" বলতে লাগলেন নেতা,—"বাংলার অবারিত শ্যামল মাঠ ; এর ষড়ঋতু, এর তুলসীমঞ্চ,—এর সব।"

গাড়ীর দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছেন নেতা। মুখের ওপর আলো ঠিকরে পড়ছে। চলমান গাড়ী। মন ছুটে চলেছে তালে তালে।

নেতার সঙ্গে আমরা ছিলাম চারজন। সতীন সেন, শামসুদ্দীন আহম্মদ, মনোমোহন ভট্টাচার্য আর আমি। হাওড়ায় এসেছিলেন অনেকে। কিরণশঙ্কর রায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, পুরুষোত্তম রায়—আরও কতজন।

সবাই মিলে একসঙ্গে যাব, এটাই ঠিক ছিল। কিন্তু তা হল না। মনোমোহন বাবু নেতার সামনে মুহুর্মুহু সিগ্রেট খাবেন কেমন করে ? আরও নানা অসুবিধে। ওঁকে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল দ্বিতীয় শ্রেণীর এক খানা কুপে।

বম্বে মেলের ভিড় এমনিতেই লোক-প্রসিদ্ধ। সেদিন ছিল মাত্রাধিক। উঠতে হল ঠেলাঠেলি করে। ইন্টার ক্লাসেও পা ফেলবার স্থান ছিল না। গাড়ীতে পা দিতে-না-দিতে চেঁচিয়ে উঠলেন মনোমোহন বাবু! মর্মান্তিক আর্তনাদ ওঁর কণ্ঠ চিরে বেরোচ্ছিল।

"আমার চস্‌মা ? আমার চস্‌মা কোথায় গেল ?"

বেশ মোটা বেশি-জোরী চস্‌মা ব্যবহার করতেন মনোমোহন বাবু। বেচারা চস্‌মা হারিয়ে অস্থির হয়ে উঠবেন এর ভেতর বাড়াবাড়ির কথা ছিল না কিন্তু নাকের ওপর অমন জলজ্যান্ত চস্‌মা এঁটে রেখে যে-লোকটা এতগুলো লোকের মধ্যে অমন বুক-ফাটা আর্তনাদ করতে পারে, তার প্রতি সহানুভূতি আসবে কোত্থেকে ? আর কেনই বা ?

শামসুদ্দীন বলে উঠলেন,—"নাকের ডগায় চস্‌মা আর চেঁচিয়ে মাত করছেন পাড়া !"

ব্যাকুল কণ্ঠে মনোমোহন বাবু বলে উঠলেন,—"একটায় কাঁচ নেই। স্রেফ ফ্রেম !"

শোন কথা ! বলতে হয় এতক্ষণ। এই অগুণ্‌তি মানুষের শ্রীপদের তলায় তিনি কি অক্ষতই আছেন ? খোঁজো, খোঁজো।

পাওয়া গেল। ওঠবার দরজার পাশেই লজ্জায় কুঁক্‌ড়ে উনি পড়েছিলেন। সবে জুৎজাত হয়ে সবাই বসেছি। একধারের বেঞ্চিতে সতীনবাবু, শামসুদ্দীন আর আমি। সাম্‌নে মনোমোহন বাবু। ওঁর পাশে একজন মাড়বার সন্তান। স্থূল তনুং তো বটেই, স্ফীতোদরং এবং চন্দ্রবদনংও। বেঞ্চের ওপর বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। তাকিয়ায় ঠেঁস-দেয়া তাঁর বসবার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, এই আয়াসটুকু আয়ত্তে আনতে ওঁকে কত আগে থেকে আসনটি দখল করতে হয়েছিল। মনোমোহন বাবু পাশে বসবার সময় ওঁকে পাছুটো একটু গুটোতে হল। এতেই তো ভদ্র পুঙ্গবের মেজাজটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠবার কথা। কিন্তু এর পরই যে-কার্যটি মনোমোহন বাবু করে বসলেন, তাতে মাড়বার সন্তানের যদি ধৈর্যচ্যুতি ঘটেই থাকে, দোষ দেওয়া যায় না।

"এই বাবু সাহেব, কাহে হামারা গায়ে পা দেতা হ্যায় ?"

মনোমোহন বাবুর মুখে এই বিশুদ্ধ হিন্দিবাত শোনবা-মাত্র তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠলেন বাবু সাহেব। সে কী অকথ্য উপদেশ ! আমরা থ। কোথা থেকে কী হল ? ঘটলই-বা কী ? উঠে গেলেন শামসুদ্দীন। হিন্দিবাতের সমজদার।

তুপক্ষের মাফ্‌-কিজিয়ের পর বিষয়টা আমাদের শ্রুতিগোচর হল। হিন্দীতে গায়ে বলে কোন শব্দ নেই। গায়ের 'য়' হয়ে উঠেছে মাড়বার সন্তানের কাছে 'ড়' এবং একজন ভদ্রসন্তানের পক্ষে নির্বিবাদে ঐ স্থানে পদসঞ্চালনের ইঙ্গিত সহ্য করা যায়ও না, সমীচীনও

নয়। কাজেই প্রতিবাদ সময়োচিত ও অনিবার্য। যতবার মনো-মোহন বাবু 'গায়ে, গায়ে,' বলছিলেন, ততবারই মাড়বার-নন্দন অগ্নিবর্ণ ধারণ করছিলেন। করবারই কথা।

সব মিটে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এবং তখনই মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করে ফেললাম যে, প্রাণ যায় যাক্, হিন্দীটা তার আগেই শিখে ফেলতে হবে।

কিন্তু এর চাইতেও বড় ফ্যাসাদ-যে আমার জন্যে গোকুলে বাড়-ছিল এবং সেটা ঘটবেও মাত্র তু'তিন দিন পরেই, এতথ্য সেদিন আমার অজানাই ছিল! সেটা বলব পরে।

সকাল হল বিলাসপুর স্টেশনে। নেতার কামরায় গেলাম। সবে হাত-মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে বসেছেন নেতা। সৌম্য প্রসন্নতায় মুখ-খানা ভরা। সস্মিত স্নিগ্ধতা গড়িয়ে পড়ছে সারা অঙ্গ থেকে। সাম্‌নে চাএর ট্রে। হাসি-ভরা চোখতুটি দিয়ে আমায় অভ্যর্থনা জানিয়ে টোস্টে মাখন মাখাতে শুরু করলেন। একটা কাপ ছিল। অথচ চা খাব তুজনায়। একজন করে খেতে হবে। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। চাওয়ালাকে পেলে আর একটা কাপ চেয়ে নিতে হবে।

চাইতে হল না। চাএর কাপটা আমার সাম্‌নে ধরে নেতা বললেন,—"ধরো তো।"

"সে কী?"

"হ্যাঁ ধরো। গলায় রুটি আটকে গেছে।"

তুধের জগে নিজের চা ঢেলে নিলেন। চিক্ চিক্ করে চা খাচ্ছেন আর মিটি মিটি হাসছেন।

এত বড় কিন্তু এত সুন্দর। এ কী বিচিত্র যোগাযোগ। দেহ, অবয়ব, মুখের হাসি, বর্ণ-সুষমা, পরিচ্ছদ,—সবই যেন অপূর্ব বলে মনে হল। এই মানুষটিকে এমনি করে গড়বার জন্যেই যেন বিধাতা স্বতন্ত্র করে এঁকে সাজিয়েছিলেন। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠতে চায় মানুষটির

মন। কী প্রশান্তি আর পর্যাপ্তিতেই-না ভরা। সব দিয়ে যেন অবিরাম সুন্দরের পূজো চলেছে। সাধারণ চ্যাচ্চেড়ে খদ্দরের কাপড় আর পাঞ্জাবী তো পরণে। কিন্তু ঐ অতি সাধারণ পরিচ্ছদ নয়নাভিরাম হয়ে উঠল এই মানুষটির অঙ্গে উঠে। রূপ আর রুচির এই বর্ণাঢ্য সামঞ্জস্য এঁর অঙ্গ ছাড়া আর যেন কারও মানায় না।

সহসা সতীনবাবুর প্রবেশ। ঢুকেই আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন,—"বেশ জমিয়ে তুলেছেন তো। কিন্তু ও-কামরা থেকে সট্‌কালেন কোন্ ফাঁকে ?"

আমি হাসতে হাসতে বললাম,—"পুরো দশটা বছর আপনার সাগরেদি করেও এটা যদি না শিখ্‌তে পারি—।" নেতার উচ্চ হাসিতে কথা আমার ডুবে গেল।

সতীনবাবু চা খান না। একটা ব্যাগে নেবু ছিল ? নেতা ছুটো নেবু সতীনবাবুর হাতে তুলে দিলেন। শুরু হল বম্বের কর্ম-তালিকার রূপায়ণ। মদনমোহন মালব্য, মৌলানা আজাদ ও সম্ভব হলে ভুলাভাই দেশাই এর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এবং সেটা করতে হবে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের অন্তত একদিন পূর্বে। এঁদের কাছ থেকে গান্ধীজি যদি ঘটনার অপর দিকটার খানিকটাও জানতে পারেন, হয়তো তাঁর বিরূপতা তেমন তীব্র না-ও হতে পারে।

সতীনবাবু বললেন,—"বরাবরই এদিকটা আমরা উপেক্ষা করেছি। বারবার শুনতে শুনতে মানুষের মন বিগ্‌ড়ে যাবেই। আমাদের কথাটা গান্ধীজির কানে তোলবার কেউ নেই।"

"আমি জানি।" নেতা বলতে লাগলেন,—"কিন্তু এই বলাবলি কি শেষ রক্ষা করতে পারবে ? একদিন তো শেষ পরীক্ষা দিতেই হবে। আর সে-পরীক্ষায় বলাবলি কি বেশি কাজে লাগবে ?"

একটা ছুর্জ্ঞেয় চিন্তার রেখা ওঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে। সমস্ত অবয়ব গাম্ভীর্যের অতলতায় ডুবে গেল। বাইরে দৃষ্টি মেলে বসে থাকলেন নেতা। আমরা তাকিয়ে থাকলাম ওঁর মুখের দিকে।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে। গাড়ীর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আশে-পাশে ধূসর মাটির রুক্ষ রূপ। শ্যামা বাংলার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। শ্যামা কালীর অঙ্গে উঠেছে শ্মশান কালীর বাস।

নেতা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—"গান্ধীজি বড়। অনেক বড়। তাঁর অবদান জাতি কোন দিনই অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু দেশ আরও বড়।"

থামলেন নেতা। সব কথা ফুরিয়ে গেল।

বম্বে যেয়ে আমরা উঠলাম কান্তির বাড়ী। কান্তিলাল পারেখ। কান্তির সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। ১৯২১ থেকে। ওর স্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী। প্রেসিডেন্সি জেলে তিনিও যেতেন কান্তির সঙ্গে আমায় দেখতে। দশ বছর পর আবার দেখা হল। দেখা হল ওদেরই নিজের গৃহে। কান্তি নেতার একান্ত অনুরাগী ও অনুগামী বন্ধু। শামসুদ্দীন গেলেন আজাদের ওখানে।

চট্‌পট্‌ স্নান ও চা খাওয়া শেষ করে সতীনবাবু আর আমি বেরিয়ে গেলাম মালব্যজির সঙ্গে দেখা করতে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য! যেয়ে শুনলাম তিনি স্নানের ঘরে। সেইখানেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। একতলায় কোণের একখানা ঘরে। বেশ প্রশস্ত। তখনও স্নানের ঘরে উনি ঢোকেন নি। উদ্যোগ পর্ব চলছিল। তৈল সেবা। মাত্র কৌপিন এঁটে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন মালব্যজি। সর্বাঙ্গ উদোম। তৈলসিক্ত। একটি সেবক গা মালিশ করে দিচ্ছে। 'সতীনজি' ও 'নরেনজি'কে বার কয়েক 'আইয়ে' জানিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন। সাম্‌নে দুখানা আসন পাতাই ছিল।

১৯২৮ এ সর্বপ্রথম মালব্যজির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কলকাতা

কংগ্রেসের অধিবেশনে এসেছিলেন। নেতাকে অনুরোধ করেছিলেন পণ্ডিতজি একজন লোক দিতে। নেতার বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর গঠন-কাজ চলছিল পুরোদমে। প্রচার বিভাগের কাজ থেকে আমাকে সরিয়ে নেতা পাঠিয়ে দিলেন মালব্যজির কাছে। বিড়লা পার্কে থাকতেন তিনি। রোজ সকালে যেতাম। বেলা দশটা-এগারটায় মিলত ছুটি। কাগজ পড়ে তার সারাংশ বলা, চিঠি লেখা, রিপোর্ট তৈরী করা,—এমনি সব কাজ। অনেকটা সেক্রেটারির কাজ। কংগ্রেসের সঙ্গে সেবার সর্বদল সম্মেলনের অধিবেশন বসে কলকাতায়। তারও উল্লেখযোগ্য অংশ নিতে হয়েছিল মালব্যজিকে।

অনেকবার দেখেছি এই ব্যক্তিটিকে। যতবার দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি। এমন অচঞ্চল প্রতিভা, ক্ষুরধার বুদ্ধি, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না।

মোটামুটিভাবে সেদিনের বাংলার রাজনৈতিক জীবন ও সমস্যা, তার পটভূমিকা, তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারত্ব আমরা মালব্যজির কাছে বর্ণনা করলাম। বিশেষ করে নেতার জীবন। কেন তিনি গান্ধীজিকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেন না, কোথায় আটকায়, তিনি কী চান,—সবই কিছু-কিছু বলা হল। মালব্যজি কিছুটা আগে থেকেই জানতেন। নেতার প্রতি বরাবরই ওঁর একটা সশ্রদ্ধ মমতা ছিল।

হঠাৎ মালব্যজি প্রশ্ন করে বসলেন,—"সুভাষের কথা তোমরা বলছ। সে-যে গান্ধীজিকে পুরোপুরি মানে না, একথা তো সবাই জানে। কিন্তু কে বা কারা মানে সেই কথাটা আমাকে বলতে পারো"?

প্রশ্নের ধাক্কাটা খুব মৃদু নয়। সামলে নিয়ে আমি বললাম,—"কেন, রাজাজি, মৌলানা, প্যাটেল, রাজেনবাবু, নেহেরু?"

"থামো তো।" হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন মালব্যজি। "গান্ধীজি যে-ভাবে মানতে ও মানাতে চান, তা কেউ-ই মানে না।" একটুক্ষণ চুপ

করে থেকে আবার পণ্ডিতজি বলে উঠলেন,—"অবশ্য গান্ধীজির সব কথা মানা যায় কিনা সেটাও একটা সমস্যা।" (১)

আবার একটু ছেদ। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই ব্যক্তিটি, যিনি বুদ্ধি ও জ্ঞানের পর্যাপ্ত ও গভীরতায় আকণ্ঠ, তাঁর কাছ থেকে কথা শুনতেই-না ভালো লাগে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বললেন উনি,—"জানো কি, অনেক প্রজ্ঞার ফলে এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা বর্ণাশ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একজনকে দিয়ে সব কাজ চলে না। গান্ধীজি চার বর্ণের আর চার আশ্রমের 'এ্যামালগাম'।"

কথাগুলো মগজের ভেতর সোজা ঢুকে গেল। বেশ টের পাচ্ছিলাম, সেখানে ওরা হৈহুল্লোড় শুরু করে দিয়েছে। রামা-শ্যামা-যদুর কথা নয়। মালব্যজির কথা। মৌলিকতা আছে বৈকি। পরের টুকু শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। উনি বলে চললেন,—"মানুষ হিসেবে ওঁর তুলনা হয় না। কিন্তু অনেকখানিই দুর্বোধ্য। হয়তো অনেক বড় বলেই আমরা বুঝতে পারিনে। সাধারণ মানুষ ওঁর থৈ পায় না। আর তাই মানতেও পারে না। আমি হয়তো দেখব না, তোমরা দেখো, গান্ধীজির জীবদ্দশায় যদি দেশ স্বাধীন হয়ে যায়, ওঁর ভক্তরাই ওঁকে জোর করে হিমালয়ে পাঠিয়ে দেবে।"

শ্রীমতী লক্ষ্মীর গৃহিনীপণায় আহার পর্ব চুকল। এবং চুকল সুচারুরূপে। দক্ষিণ-খোলা মস্ত বড় রন্ধনশালা। মেঝেটা মোজাইক করা। নিখুঁত পরিচ্ছন্নতায় ঝলমলে। কোনখানে বাড়তি একটু জিনিস

(১) গান্ধীর অহিংসানীতি আর অর্থনৈতিক ভাষ্য সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের কেউই মেনে নিতে পারেনি।

ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া—৪৭২ পৃঃ

নেই। একধারে পাচক তার ঘরকন্নার সাজ ও সরঞ্জাম নিয়ে নীরবে কাজ করে চলেছে। ছোট ছোট গোটাচারেক কাঠ কয়লার উনোন। একটায় 'ফুলকা' শেকা হচ্ছে। আর কয়টাতে ভাত ডাল বসানো। ঠাণ্ডা না হয়ে যায় তার ব্যবস্থা। চারজন আমরা খেতে বসলাম। প্রথমে নেতা, দ্বিতীয় সতীনবাবু, তারপর মনোমোহনবাবু, সবশেষে আমি।

ছোট ছোট কাঁদা-উঁচু পেতলের থালায় সামান্য চারটি ভাত। ঘীতে ভেজানো। ছোট বাটিতে ডাল। কতটা ডাল আর কতটা ঘী বোঝা দুষ্কর। থালার এক পাশে কয়েকখণ্ড ট্যাঢ়শ ভাজা। আর এক-ধারে তিন-চার প্রস্থ আচার। পুরোপুরি দু'বারও লাগল না। ভাত ফুরিয়ে গেল।

চোখ তুলে চাইবার অবকাশ হল না। প্রায় নিঃশব্দে পাতে এসে পড়ল একখানা ঘৃতসিক্ত ফুলকা। কাগজের মতো পাতলা আটার রুটি। ঘরখানার একধারে বসে পাচক অবিশ্রাম নেচি কাটছে, বেলছে, শেকছে, ঘীএ চুবিয়ে এক-এক জনের পাতে ফেলে দিচ্ছে। বসেই। একচুল এদিক ওদিক নয়। থালার মাঝখানে। কী হাতরে বাবা! নেতার দিকে চাইলাম। দেখি, তিনিও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন। তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। বললাম,—"কী টারগেট।"

"রিক্রুট করবার মতো। তাই না?" নেতা বলে উঠলেন।

হাসিতে ঘরখানা গম গম করে উঠল।

সামান্যক্ষণ বিশ্রাম করেই নেতা বেরিয়ে গেলেন। একখানা মোটর এসেছিল নিতে। বেলা পড়তে না পড়তে সতীনবাবু আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। ব্যাক্ বের ওপর কান্তির বাড়ী। সেখান থেকে সোজা আমরা গেলাম ডকে। পরিচ্ছন্ন ছিমছাম সহর এই বম্বে। আয়তনে ও জৌলুসে হয়তো কলকাতার সমকক্ষ নয়; তবু ওর অঙ্গে আকর্ষণের মাদকতা আছে। ওর সাগর সৈকত, ওর মসৃণ চলার পথ, ওর বেপরোয়া আব্রুহীন নারীর সচ্ছন্দ চলা সত্যিই হাতছানি দেয়। ডাকে। কাছে টেনে নেয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরে এলাম ব্যাক্ বের বালুচরায়। আধখানা চাঁদের মতোই সাগরিকা এগিয়ে এসেছে। দুপাশে দুখানা কোমল বালুর বাহু ওকে আঁকড়ে ধরেছে। বিছিয়ে দিয়েছে নরম তনুলতা।

কাতারে কাতারে নরনারী জমা হয় বালুচরায়। ছেলে বুড়ো জোয়ান। ঝক্‌ঝকে হাসি, ঝল্‌মলে বসন। তীক্ষ্ণচটুল চোখের কোণ। নেপটে বসে বালুর ওপর। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে বালুর বুকে। বালু ঝেড়ে ছোটে গা দুলিয়ে।

ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম তিলকের মূর্তির সামনে। বালগঙ্গাধর তিলক। ভারতের ললাট-তিলক তিলক। ঘনায়মান সন্ধ্যার নীলাঞ্চল ঘনিয়ে এল সমুদ্রের ওপার থেকে। নীল সমুদ্র। শান্ত স্থির সমুদ্র।

সতীনবাবু হাঁটেন গোঁ ধরে। কোন দিকে না চেয়ে। সোজা বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লেন। আমি চল্লাম ধীরে ধীরে। চারদিকে দেখতে দেখতে। বাড়ীর সামনে এসে গেছি। আবছা অন্ধকারে মনে হল, কে যেন সরে গেল। সরে গেল পাশের গলির ভেতর। এগিয়ে গেলাম। একটি মেয়ে। শাড়ী পরা। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন। বিড়লার বাড়ীতে মহাত্মাজি থাকেন। সেখানেই মস্ত বড় বাড়ী। সামনে মানুষের ছোট-খাটো ভিড়। স্বেচ্ছাসেবকেরা দরজায় দাঁড়িয়ে। নেতার সঙ্গে আমরা ভেতরে গেলাম। সতীনবাবু আর আমি। মনোমোহনবাবু আসেননি।

দোতলায় উঠে সোজা গান্ধীজির ঘরে নেতা আমাদের নিয়ে ঢুকলেন। নিজে পায়ে হাত ছুঁইয়ে মহাত্মাজিকে প্রণাম করলেন। পরিচয় দিলেন আমাদের। সতীনবাবুর দিকে চেয়ে গান্ধীজি বললেন,— "কবে আবার তোমার হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু হবে ?"

হাসি ওঁর মুখে লেগেই আছে। বেশ মোটা গদির ওপর বসে আছেন গান্ধীজি। পাশে বৃহৎ তাকিয়া। পা গুটিয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন।

গান্ধীজির সঙ্গে বার-তিনেক এর আগে আমার দেখা হয়েছে। আমাকে মনে রাখবার তাঁর কথা নয়। নিশ্চিন্ত মনে প্রণাম সেরে এক-ধারে বসতেই বলে উঠলেন উনি,—"তোমাদের সেই ঠাকুর এখন কোথায় আছেন ?"

অর্থাৎ সৎসঙ্গের অনুকূল ঠাকুর। ১৯২৪এ পাবনা সহরে গান্ধীজি যখন গিয়েছিলেন, দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জনের আগ্রহে ওঁকে সৎসঙ্গে যেতে হয়েছিল। পাবনা সহর থেকে সঙ্গে করে আমিই ওঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

একজন মেয়ে ঢুকল ঘরে। একটা বাটি আর একখানা চামচ গান্ধীজির হাতে তুলে দিল। বাটিতে কাটা আমের খণ্ড। চামচে করে এক-একটা টুকরো গান্ধীজি মুখে ফেলতে লাগলেন। বেশ খানিক-ক্ষণ ধরে চুষে চুষে খেয়ে আবার আর একখণ্ড। এরপর এক বাটি খোসা ছাড়ানো কমলা লেবু। সবশেষে একবাটি ছাতু বা আটার মতো কোন দ্রব্য ঘন করে মাখা। গান্ধীজির খাওয়া চেয়ে চেয়ে দেখলাম। খেতে খেতেই নেতার সঙ্গে চলতে লাগল আলোচনা। কোন উত্তাপ নেই। নেই এতটুকু অভিযোগ।

চমৎকার লাগল পাশাপাশি দুজনকে। গান্ধী আর সুভাষ। শীর্ণকায়, মুণ্ডিত মস্তক কৌপীনধারী এক অতি সাধারণ অবয়বের একটি মানুষ, কিন্তু অসাধারণত্বের জ্যোতি-ফলক কপালে আঁটা। বৃহত্ত্বের পরিচয় ওঁর চোখে, তীক্ষ্ণ নাসিকায় আর প্রতিটি কথার শব্দ-মর্মে। সম্মুখে বসে আছে প্রদীপ্ত-যৌবন, শ্রী আর লালিত্যে যে অপরূপ, আত্মবিশ্বাস আর গতিবেগে যে উন্মুখ, গাম্ভীর্যে আর গভীরতায় যে মুখর। সনাতন ভারতবর্ষের কালজয়ী দেউল-অলিন্দে বসে আছে বর্তমান ভারতের মূর্ত কামনা। কণ্ঠে ওর বোধনের মন্ত্র।

বিড়লা-বাড়ী থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম সন্ধ্যার পর। নেতা চলে গেলেন অন্যত্র। সতীনবাবু আর আমি গেলাম মালাবার হিলে। বম্বের ওপর তলার বাসিন্দাদের নিকেতন ওখানেই। ঘুরে ঘুরে সব

দেখলাম। দেখলাম ফিরোজসা মেটার বাড়ী। জিন্নার বাড়ী। আরও অনেকের। সবাই কেউ-কেটা। নাক-তোলাদের দল। উপবন-ঘেরা সব বাংলো। রম্য। নয়নাভিরাম। পাশে অপার সমুদ্র। বিক্ষোভহীন। ওখান থেকে সোজা জুহু বীচের রাস্তায়। সমুদ্রের ধার-ঘেঁসা পথ। নীচে সমুদ্র। বেলাভূমি ঘুমিয়ে আছে। চাং চাং পাথর বুকে। কালো পাথর।

ফিরতে একটু রাতই হল। সতীনবাবু ঢুকে গেলেন বাড়ীর ভেতর। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বালুচরায়। মনে ভেসে উঠল একখানা ছবি। একটি মেয়ের ছবি। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। পরণে শিল্কের শাড়ী। শুধু কয়েকটি রেখা। আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল মোটা হয়ে।

কে ও? কেন এসেছিল? কোথায় এসেছিল? কান্তিদের কেউ? হবেও বা। এগোচ্ছি ধীর পায়ে বাড়ীর দিকে। মোড়ের মাথায়। ওখান .থকে দেখা যায় কান্তির বাড়ী। সামনে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। পায়ে নাগরা। খোলা মাথা। মাথায় এলো খোঁপা। পরণে শিল্কের শাড়ী। দাঁড়াল একেবারে বুকের সামনে।

বিস্ময়ে পা ছুটো গেঁথে গেল মাটির সঙ্গে। কথা ফুটল না মুখে। চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। পাশের নরম আলো এসে পড়েছে সে-মুখের ওপর। নিটোল শুভ্রতায় মুখখানা ভরা। চোখ ছুটি বড় নয়, কিন্তু মনোরম।

কণ্ঠে অগাধ আগ্রহ নিয়ে মেয়েটি বলে উঠল,—"ভাইজি!"

আমি নিষ্পন্দ। আবারও ডাকল মেয়েটি,—"ভাইজি!"

সংবিৎ ফিরে পেলাম। মাথাটা ঝাঁকিয়ে বিস্ময় কাটিয়ে উত্তর দিলাম, "কী বোন!"

"উনি কোথায়?"

উনি! কে উনি? কার কথা ও বলতে চায়? বললাম,—"কার কথা জিজ্ঞেস করছ বোন?"

"সুভাষ।"

বোবা হয়ে গেলাম। চোখ দুটোও যেন পাথর হয়ে গেল। পাথুরে চোখে কি দেখা যায়? ঝাপসা হয়ে উঠল সব। মন পর্যন্ত। মরিয়া হয়ে তবু বললাম,—"তুমি চেনো তাঁকে?"

"না। শুধু দেখি।"

"শু—ধু দে—খো!"

"হাঁ। রোজ দেখি। প্রতিবার দেখি। আজ দেখতে পাইনি।"

ভেতরটা শির্‌শির্ করে উঠছে। এক সীমাহীন বিস্ময় আর রহস্য আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। আচ্ছন্ন করে। নিঃশেষে। আবার চোখ তুলে চাইলাম। দেখলাম সেই চোখ দুটি। ভেজা না? বিষণ্ণতায় ভেঙ্গে পড়ছে। বেদনার প্রলেপ মাখা। বললাম,— "এখনও তো তিনি ফেরেননি।"

আর কথা নয়। শুধু একটি শব্দ,—"ও-ও-ওঃ…।"

করুণ কান্না যেন গুম্‌রে উঠল। ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলাম। দুটো চোখ আস্তে তুলে ও চাইল বাড়ীটার দিকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল খানিকক্ষণ। প্রশ্ন করল,—"আর কদিন তোমরা থাকবে ভাইজি?"

"ঠিক নেই তো।" বললাম আমি।

"হাঁ?" একটু ছেদ। পরক্ষণেই ঠোঁট দুখানা নড়ে উঠল। একফালি ক্ষীণ হাসি গড়িয়ে পড়ল চিবুকের ধার ঘেঁসে। বলল,— "আজ চলি। আচ্ছা?"

চলে গেল।

পথের অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল।

সামনের দিকের একখানা বড় ঘরে নেতা আফিস বসিয়েছেন। একের পর এক লোক আসছে। নারিম্যান, যমুনা দাশদ্বারকা দাশ, ইউসুফ মেহেরআলী, নাথুরাম পারেখ,—আর কতজন। কান্তির

বাড়ী উড্বার্ন পার্ক হবার যোগাড়। বেলা এগারোটার পর একটু বিশ্রামের অবকাশ। তারপর যেতে হবে ওয়ার্কিং কমিটির সভায়।

ভেতরের ঘরে এসে বসেছেন নেতা। এই ঘরেই উনি রাত্রেও ঘুমোন। ওঁর খাটের পাশে একখানা নেয়ারের খাটিয়ায় আমি শুই। দিনের বেলা খাটখানা বাইরে সরিয়ে নেওয়া হয়। পাশের ঘরে সতীনবাবু আর মনোমোহনবাবু!

এল চা। সকালবেলা থেকে বার ছয়েক হল বৈকি। ওতে অরুচি নেই। হলেই হল। আমাদের চা একটা ট্রেতে করে ভৃত্য নিয়ে এল। নেতার চা নিয়ে এলেন শ্রীমতী লক্ষ্মী। শ্রীমতীকে দেখেই মনে জেগে উঠল হেঁসেলের কথা। মনোমোহন বাবুর সাথে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। শ্রীমতীকে লক্ষ্য করে বললাম,—

"আজ তোমার ভাণ্ডারের সংবাদ কী দেবী?"

শ্রীমতী একটু মুচকি হাসছেন। অনেকদিন কলকাতায় থেকে বাঙালীর রস ও রসনা তুটোরই কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছেন। হাসিটাকে একটু লম্বা করে বললেন,—"বলব না।"

মনোমোহনবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন,—"ঢেরস—" খল্খল্ করে হেসে উঠলেন লক্ষ্মী। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। হাসি থামিয়ে আমি বললাম,—"তোমাদের সেই তুর্লভ শ্রীখণ্ড খাওয়াবে না দেবী!"

দেবী উত্তর দিলেন,—"ওটা হবে কাল। আজ আমরসা।"

এই পরম বস্তুটি আমাদের সবাইএরই অপরিচিত। কিন্তু নামটার সঙ্গে বাংলার কোন বিশেষ শব্দের যেন একটা সম্পর্ক আছে। ধরতে পারছিলাম না। ভেতর থেকে ডাক পড়ল। দেবী চলে গেলেন। মনোমোহনবাবু বলে উঠলেন,—"নাঃ, আমরক্ত বের না করে আর ছাড়বে না দেখছি!"

হাসির দমকে ছিটকে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। সোজা ঢুকে গেলাম স্নান-কামরায়।

খেতে বসতেই দেবী এক একটা বাটি বসিয়ে দিলেন সবার থালার

পাশে। বেশ লালচে গোলাপী রংএর ঘন পদার্থে বাটিগুলো উবু-ছুবু ভরতি। ভুরভুর করছে গন্ধ। আমের গন্ধ। আঁজল পূর্ণ করে মুখে পুরে দিলাম। আঃ! বলতে হয়। এ-যে আমের গোলা। মিষ্টি আম। মধুর আম। এর পর আর আঁজল নয়। গোটা বাটিটা মুখের কাছে ধরে এক চুমুক। বাটি শূন্য। আমার দেখাদেখি সবাই। নেতাও। দেবী দাঁড়িয়ে ছিলেন দোর গোড়ায়। বাটিগুলি আবার পূর্ণ করে দিলেন। পর পর তিন বার বাটি শূন্য করে সতীনবাবু বলে উঠলেন,—"ব্যস্। আর কিচ্ছু না।"

সত্যি উনি আর কিছু খেলেন না।

ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যাবার প্রাক্কালে নেতা বলে গেলেন,—"তোমরা বিকেলে আর কোথাও যেয়ো না। পাবলিক মিটিং আছে।"

সভা একটা নয়, গোটা তিনেক। বাঙালী পাড়ায় একটা ছিল, সেইটায় আমরা আগে গেলাম। সূচনা হল একটা ঘরোয়া বৈঠক দিয়ে। নিছক বাঙালী নিয়ে একটা লম্বা হলে বসবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢালা ফরাস। মাঝখানে নেতার স্বতন্ত্র স্থান। সামনে একখানা জলচৌকি। রূপোলি জড়ির-কাজ-করা কাপড়ে ঢাকা। দুপাশে দুটো ফুলদানিতে গোলাপের ঝাড়। নেতার পাশে আমরা।

বম্বেতে যে বাঙালীর একটা স্বতন্ত্র পাড়া আছে আর তার অধিকাংশই ব্যবসায়ে লিপ্ত, এটা একটা জানবার মতো তথ্য। অধিকাংশ জহুরী। সূক্ষ্ম কাজে নিপুণ! আর এ-কাজটা নাকি বাঙালীদের প্রায় একচেটে। শুনে ভালো লাগল। বাঙালীর বৈষয়িক আর ব্যবসায়ী বুদ্ধির অভাব ও অক্ষমতার কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। সেই বাঙালী বম্বেওয়ালাদের বুকের ওপর বসে ব্যবসায় করছে,—সংবাদটা শুধু চমকই লাগায় না, আনন্দও দেয়।

সুদূর বম্বে থেকেও এরা বাংলাকে ভোলেনি। বাঙালীকে মনে রেখেছে। বাংলার নেতা বম্বে এসেছেন, তাই ওঁকে তারা ডেকেছে।

ডেকেছে নিজেদের ঘরে। কত কথা হল। সুখ-দুঃখের কথা। ভালো-মন্দের কথা।

জলযোগের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। শেষ করে সভাক্ষেত্রে যাওয়া গেল। মাঝারি গোছের সভা। হাজার দু-তিন লোক জমেছে। মিনিট পনের বক্তৃতা করেই নেতা যে-কাজটি করে বসলেন, তাতে করে আমার জীবনের এক স্মরণীয় বিপর্যয় আসন্ন হয়ে উঠল।

নেতা বক্তৃতা করছিলেন হিন্দীতে। কিছুদিন আগেও উনি হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দিতে সাহস পান নি। কিন্তু অতি অল্পদিনে এমন সহজ ও স্বাভাবিক হিন্দী বলবার ভঙ্গী আমাদের বিস্মিত করেছিল। বক্তৃতা শেষ করবার পূর্বমুহূর্তে বেশ জোর-গলায় ঘোষণা করলেন যে, আরও দুটি সভায় যেতে হবে বলে বক্তৃতা তাঁকে সংক্ষেপে করতে হল। তবে শ্রোতারা যাতে দুঃখিত না হন সেই কারণে সভায় রেখে যাচ্ছেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা শ্রী·········ইত্যাদি।

স্নেহ বা প্রীতির অত্যাচার সম্পর্কে গল্প শুনেছি। এটা কী পর্যায়ে পড়ে তা ভাববার আমার সময় ছিল না। সভা শুরু হয়েছিল হিন্দী ভাষার মাধ্যমে। নেতাও বললেন সেই ভাষায়। শ্রোতা অবাঙালী। হিন্দীতে বলা শোভন ও সঙ্গত।

সহসা সর্বাঙ্গ হতে এমন প্রবল বেগে ঘাম ঝরতে সুরু করল যে, মনে হল দেহে বুঝি আর রক্ত বলতে কিছু অবশিষ্ট থাক্‌ল না। পাশে সতীন বাবু ও মনোমোহন বাবু। করুণ দৃষ্টি নিয়ে ওঁদের দিকে তাকালাম। ততক্ষণে সভাপতি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বোঝার ওপর শাকের আটির মতো আমার এই সভায় উপস্থিতি-যে তাঁদের ভাগ্যকে কতখানি সুপ্রসন্ন করেছে তার নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়ে আমার ভাগ্যের বিড়ম্বনা কিঞ্চিৎ আরও বাড়িয়ে তুললেন।

উঠে দাঁড়ালাম। হিন্দী বক্তৃতার গোটা কয়েক কথা মাত্র আমার জানা ছিল। 'টুটি ফুটি হিন্দীমে' বলতে হবে বলে শ্রোতার কাছে মাপ চাইবার পর সভা, বক্তৃতার বিষয় বস্তু এবং নিজের অস্তিত্ব আমার

চোখের সাম্‌নে থেকে বেমালুম অবলুপ্ত হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় নেতার সাক্ষাৎ ঘটলে কী করে বসতাম, আজ আর তা বলে লাভ নেই। সেদিন সারারাত ওঁর সঙ্গে কথা বলিনি।

কিন্তু বাঁচালেন আমাকে সভাপতি।

আমার মুখ খোলবার পরমুহূর্তেই সম্ভবত উনি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। উপক্রমণিকার গোড়াতেই আমার বাক্‌রোধ অবস্থা দেখে উনি উঠে দাঁড়ালেন। শ্রোতাদের মধ্যে নাকি অনেক লোক ছিলেন যাঁরা হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞ। তাঁদের সুবিধার জন্যে বক্তা অর্থাৎ আমি যদি ইংরেজীতে বক্তৃতা দি, তিনি এবং শ্রোতারা নাকি কৃতার্থ হবেন। তাঁরা কতখানি কৃতার্থ হয়েছিলেন, আমার জানবার কথা নয় কিন্তু জীবনে এই প্রথম ইংরেজকে মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করেছিলাম ইংরেজী ভাষাটা আমাদের খানিকটা শেখাবার জন্যে।

মনোমোহন বাবু আর সতীন বাবু কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। থাকলাম আমরা দুজন। নেতা আর আমি। ওয়ার্কিং কমিটির কাজ শেষ হয়ে গেছে। গান্ধীজির রায় অনুকূল হবার আশা ছিল না কিন্তু প্রতিকূলেও খুব বেশি গেল না।

সন্ধ্যা বেলা আমরা বেরিয়ে গেলাম একখানা মোটরে। এদিক-ওদিক ঘুরে সোজা আমরা গেলাম জুহুবীচের পথে। বর্ষা আরব সাগরের ওপার থেকে মাথা তুলে সবে দাঁড়িয়েছে। ওর নিঃশ্বাস লাগছে গায়ে। এখান থেকেই। পাগলা ঝড়ো হাওয়া ছুটে আসছে। একটানা। অবিশ্রাম। সমুদ্র ফেঁপে উঠেছে। ফুলে ফুলে গজরাচ্ছে। ভেঙ্গে পড়ছে কালো পাথরের বুকে। নীচের জল ছিটকে লাগছে মোটরের গায়ে। গাড়ী থেকে আমরা নেমে এলাম। বসলাম পথের ও-প্রান্তে।

ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘে আকাশ ভরতি। উড়ে চলেছে উজ্জয়িনীর দিকে। ওখান থেকে যাবে শৈলশিখরে। ধারায় ধারায় ঝরে পড়বে। স্নান করিয়ে দেবে। শ্যামল করে তুলবে বাংলার বুক! ধারাসিক্তা বাংলার

শ্যামলা বধু অবগুণ্ঠনের আড়ালে দেখবে অঝোর ধারায় ঝরে-পড়া ধারা। চোখ বেয়ে পড়বে ওর ফোটায় ফোটায় জল। কার জন্যে ?

নেতা ডুবে গেছেন। সাড়া নেই। শব্দও না। পাশে বসে ভাবছিলাম এই আশ্চর্য মানুষটির জীবন-কথা। একটু আগেই ছিল ওয়ার্কিং কমিটি। ছিল কথার মারপ্যাঁচ। রাজনীতির কচ্‌কচানি। আর তারই একটু পরে সেই মানুষটিই বসে আছে এই ভাবে। অশান্ত উন্মাদ সমুদ্র, ঝড়ের মাতন, রাজনীতির বিষাক্ত ছোঁয়াচ,—সব উবে গেল কোথায় ? রাজনীতি নেই, দল নেই, দলাদলি নেই, সংসার নেই ,—আছে শুধু একটি নির্দ্বন্দ্ব সত্তা। অনাসক্ত অনুভূতি। গায়ে তার অপার গাম্ভীর্যের আর গভীরতার রহস্য। একতারা-হাতে গৃহ পলাতক চির-বৈরাগী নিজের প্রাণের বীণায় সুর সৃষ্টি করে চলেছে,—ধাগেশ্রী নয়, দীপক নয়,—একটানা ভৈরবী।

পরদিন রওনা হলাম। কাশী হয়ে যেতে হবে। গাড়ীতে চাপলাম অপরাহ্নে। ঝাঁকি দিয়ে গাড়ী ছাড়ল। জানলায় মাথা গলিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। অনেক বন্ধু-বান্ধব এসেছেন নেতাকে বিদায় দিতে। এসেছেন কান্তি আর লক্ষ্মী। তাকিয়ে আছি সবার দিকে। প্লাটফর্ম ছেড়ে গাড়ী চলতে থাকে ধীরে। সহসা দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল আবছায়া একটি মুর্তির ওপর। আবছায়া নারী মুর্তি। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে নাগরা। শাড়ীর আঁচল ওড়ে পেছনে। একধারে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গীহীন। একা। চেয়ে আছে অপলকে। (১)

১৫ই জুন মোগলসরাই। গভীর রাত্রি। বন্ধুরা পুর্বেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পরদিন দেশবন্ধুর মৃত্যু-বার্ষিকী কাশীতে।

সারাদিন অসহ্য গ্রীষ্মের ধকল গেছে দেহের ওপর দিয়ে। মধ্যাহ্নের আহার-পর্ব গাড়ীর ভেতরেই সারতে হয়েছে। নিরামিষ ভাত-তরকারী আর দই। নেতা পথে প্রায়ই নিরামিষ খাদ্য পছন্দ করতেন। সাম্‌না-

(১) এর কথা বলবার ইচ্ছে থাকল আরও পরে। সম্ভবত দ্বিতীয় খণ্ডে

সাম্‌নি দুজনায় খেতে বসেছিলাম। গাড়ীতে তৃতীয় প্রাণী নেই। খেতে খেতে বললেন নেতা,—"গান্ধীজি ভয় পেয়ে গেছেন। ইংরেজকে উনি কথা দিয়েছেন। ওদের বিরুদ্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য হবে না। বাংলা দেশ ওঁর কথা শুনবে কিনা এখনও উনি বুঝে উঠতে পারছেন না।"

আমি বললাম,—"কংগ্রেস কিছু করবে না। কিন্তু সমস্ত দেশ কি কংগ্রেস ?"

"আমরা তো তাই বলতে চাই।"

"কিন্তু ওরা কি তা স্বীকার করে ?"

"না।"

"তবে ?"

"ওকথা ওরা স্বীকার করতে পারে না। স্বীকার করলে ওদের রাজনীতি ভেস্তে যাবে যে।"

"অর্থাৎ গো বধের বেলা খুড়ো কর্তা।"

দেশের কোন সুদূর প্রান্তেও যদি দৈবাৎ কোন অশান্তি ঘটে, তার দায়িত্ব কংগ্রেসের। আর প্রতিনিধিত্বের বেলা ইংরেজ দেখিয়ে দেবে মুস্‌লিম লীগ, হিন্দুসভা, অনুন্নত শ্রেণী,—আরও শতকোটি প্রতিষ্ঠান। এও ছিল গান্ধী-সুভাষ মতান্তরের আর একটি কারণ। বার বার গান্ধীজিকে একথা বলেছেন তিনি। ইতিহাসের নজির দেখিয়ে বলেছেন। বলেছেন আয়র্লণ্ডের উদাহরণ দিয়ে। যারা সংগ্রামের অংশ নেবে না, প্রতিনিধিত্বের দাবীও তারা তুলতে পারবে না।

খাওয়া শেষ করে স্নান-কামরায় ঢুকেছি হাত-মুখ ধুতে। নেতার তখনও শেষ হয়নি। ওঁর শেষ হলে থালাবাটি স্নান-কামরায় রেখে দেব,—এটা খেয়াল ছিল। দরজা খুলতেই দেখি দুজনের এঁটো থালা-বাটি হাতে করে নেতা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার সাম্‌নে। তাকিয়ে থাকলাম ক্ষণকাল ওঁর মুখের দিকে। একটা কথাও না বলে সোজা শুয়ে পড়লাম নিজের বিছানায়। নেতা মশলা চিবোচ্ছেন আর একটু

একটু করে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। ভাজা মশলা। শুপোরি, এলাচ, লবঙ্গ, ধনের চাল। কৌটো-ভরা থাকত সঙ্গেই। আর খেতেন মুঠো মুঠো। একটু বাদে বললেন,—"মশলা কিন্তু ফুরিয়ে গেল।"

আমি জবাব দিলাম না। নিজে থেকেই আবার বললেন,—"যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। বেটারা নিরামিষ একদম রঁাধতে জানে না। মাংস হলেও তবু যা হোক খাওয়া যেত। ভট্‌চাজ্জি নিয়ে পথে চলতে গেলে—"

দোষটা হল আমার! আমিই-না ও-কথা আগে বলেছিলাম। মুসলমান বাবুর্চি নিরিমিষ্যি রঁাধলেই হয়েছে। পেঁয়াজ-রশুনের ফোড়ন দিয়ে ওরা শুক্‌তো রঁাধে। ঘোলের সরবতে ওরা রশুনের রস দেয়। এ-সবই-তো সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো। উঠে বসলাম। মুখ খুলতে নিয়েছি অমনি বলে উঠলেন,—"মশলাটা আগে খেয়ে নাও তো।" বাড়িয়ে দিলেন কৌটা-ধরা হাতখানা।

মোগল সরাইএ একটা খোলা ছাতে আমাদের শোবার জায়গা হয়েছিল। জ্যৈষ্ঠের খর রোদ পুড়িয়ে দিয়েছে সারা দিনটা। গভীর রাত্রি, তবুও ছাতে তাত রয়েছে। নইলে বেশ। মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। নির্মেঘ আকাশ। তারা ভরা আকাশ। পাশাপাশি দুখানা নেয়ারের খাটে দুজনে ঘুমিয়ে পড়লাম। আর জাগলাম সেই ভোর সকালে। ট্রেণ ধরে চললাম কাশী।

কাশী। অগুণতি মানুষে ভরা ছিল স্টেশন। একখানা খোলা ফিটনে আমাদের চাপিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে চলমান মানুষের পাঁচিল। এসে থামলাম শহিদ বাগের সাম্‌নে। নেতা মালা দিলেন। জাতীয় পতাকা ওড়ালেন। সংক্ষেপে কিছু বলবার পর সকাল বেলার কাজ শেষ হল। উঠলাম আমরা সাণ্ডেল বাড়ী। পর পর গোটা তিনেক পুরুয়া ঠাণ্ডাই শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম আমি শহরে। মানুষের ভিড় আর সইতে পারছিলাম না।

কিন্তু নেতা হবার মাশুল পুরোপুরি দিতে হচ্ছিল নেতাকে। অবিরাম চলছে বাক্যালাপ। এর সঙ্গে তার সঙ্গে সবাইএর সঙ্গে। একটুও ফাঁক নয়। ফাঁকিও না। ওঁদের শীত থাকতে নেই, গ্রীষ্ম বুঝতে নেই, বর্ষার অজুহাত নেই। একটানা চলতে হবে। দেহবোধ থাকলে চলবে না। ক্ষিধে-তৃষ্ণার কথা ভুলতে হবে। মানবীয় কোন চাহিদা মনের কন্দরে যদি দৈবাৎ জেগেই ওঠে, টুঁটি চেপে তাকে মেরে ফেলতে হবে। হতে হবে সাধারণের উর্ধ্বের একজন। অসাধারণ। নইলে সাধারণ পুজো দেবে কেন?

তবু বলব, অসাধারণত্বের প্রতি এই ব্যক্তিটির না ছিল মোহ,—না ছিল আমন্ত্রণ। প্রাণের সুগভীর প্রত্যন্ত থেকে স্বতঃউৎসারিত দরদ আর প্রীতির অতুল্য আকর্ষণ নির্বিশেষে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন চারদিকে। অজস্র অপরিমেয় দুর্বার ছিল সে-আকর্ষণের শক্তি। রবাহুতের মতোই অসাধারণত্ব নিজে থেকে ওঁর কাছে ধরা দিত। ধরা দিত ওঁর দেহে, মুখে, কথায়, হাসিতে।

একটানা তিন ঘন্টা বক্তৃতা করলেন জনসভায়। স্থান হয়েছিল দশাশ্বমেধ ঘাটে। তিল ধারণের স্থান ছিল না। নরমুণ্ডের একখানা জমাট ছাত হয়ে উঠেছে সারা ঘাট। পেছনে গঙ্গা। নিস্তরঙ্গ গঙ্গা। নৌকোর সারিতে ভরে গেছে গঙ্গার বুক। নৌকোয় মানুষ। গাদা গাদা মানুষ। নিজের বক্তৃতা শেষ করেই বলতে যাচ্ছিলেন আমার নাম। বাধা দিলাম। এর পরও? না। পরদিন হবে। আর বক্তৃতা করবেন,—আবার সেই বিশেষণের ঘটা। মনে পড়ল বঙ্গের কথা। কিন্তু কাশী তো বঙ্গে নয়। বাংলার কাদা-মাটি-যে কাশীর গায়ে মাখা।

ডাঃ ভগবান দাশের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে সোজা ওঁর যাবার কথা ছিল সভাস্থলে। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। মানুষের দেখা নেই! ফোন্ করে জানা গেল ওখানেও নেই। তবে? কর্মকর্তারা ভেবে ঘেমে উঠলেন। বার বার ওঁরা আসছেন আমার কাছে। আর কি

কোথাও যাবার কথা আছে? কারও বাড়ী? কোন স্থানে? কোন প্রতিষ্ঠানে? মন্দিরে? না? তবে? ছটা বাজবার মিনিট পাঁচেক আগে আমি বেরিয়ে পড়লাম। বলে গেলাম ভাববার কিছু নেই। সভায় যথাসময়ে ধরে নিয়ে যাবই।

বেরিয়ে তো এলাম কিন্তু যাই কোথা? এর নাম কাশী। খুঁজব কোথা? মনে পড়ল ওঁর মাসীর কথা। সেখানে? আনমনে হেঁটে চললাম।

হরিশ্চন্দ্র ঘাট। শ্মশানের ধারে এসে দাঁড়ালাম। মরা পুড়ছে ছুটো। পোড়া নর-মাংসের গন্ধ চারদিকে। ধোঁয়া। হরিনাম। রাম নাম সত্য হ্যায়। দেখছি শুনছি আর এগোচ্ছি। শ্মশান পেরিয়ে গেলাম। গেলাম গঙ্গার ধার ঘেঁসে। নোংরা তটভূমি। মাঝে মাঝে নৌকো। নানা ধরনের লোক। স্ত্রী পুরুষ বাচ্চারা। ভিখিরী আর পুণ্যকামী। একটা বাড়ী থেকে সিঁড়ি সোজা নেমে এসেছে গঙ্গার কোলে। তারও ও-পাশে। শ্রীমান বসে আছেন গালে হাত রেখে। পাশে একটি সাধু। উলঙ্গ। জটার বোঝা মাথার ওপরে চূড়া করে বাঁধা। ভস্ম-মাখা গা। মুখ ভরা দাড়ি।

ছুজনেই নিস্তব্ধ। সাধু চেয়ে আছেন গঙ্গার দিকে। পলকহীন দৃষ্টি। নেতা তাকিয়ে আছেন সাধুর দিকে। পাশে এসে দাঁড়ালাম অজান্তে। একটু পেছন ঘেঁসে। হাত ঘড়িটা নেতা দেখলেন। জোড় হাতে বলে উঠলেন নেতা,—"কৃপা।"

"হুঁ"। সাধু ডান হাতখানা একটু তুললেন ওপরের দিকে।

"দেশ স্বাধীন হবে কবে?" জিজ্ঞেস করলেন নেতা।

"দের হ্যায়।" সাধু থামলেন। পরক্ষণেই বলে উঠলেন,— "বলিদান যব পুরা হোগা।"

নির্বাক নিষ্পন্দ নেতা সাধুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি আলতোভাবে ডান হাতখানা রাখলাম নেতার কাঁধের ওপর।

পাঁচ

বিনামেঘে বজ্রাঘাত কথাটা কবে থেকে চালু হয়েছে তার কোন ইতিহাস নেই। কথাটার ব্যবহার-স্থানও খুব সঙ্কীর্ণ। তবুও মাঝে মাঝে ওটা দেখা দেয়।

বাঙালীর জীবনে অনেকবার কথাটা দেখা দিয়েছে। সেদিনও দিল। দিল হিজলী বন্দিশালার ওপর থেকে। ১৯৩১এর সেপ্টেম্বর মাসে।

সন্তোষ আর তারকেশ্বর মারা গেছে। ইংরেজের অব্যর্থ গুলি লেগেছে একজনের ললাটে আর একজনের বুকে। আহত হয়েছে আরও অনেকে।

বন্দিশালা। কিন্তু যারা ওখানে ছিল তারা দণ্ডিত কয়েদী নয়। কোনও দিন বিচার হয় নি তাদের। ইংরেজের বিচারালয়েও না। কেউ দণ্ড পায়নি। তবু ওরা বন্দী। আটক বন্দী। শাসক ইংরেজের খেয়াল আর খুশির জোরে বাংলার যৌবনকে আটকে রেখেছিল। আটকে রেখেছিল ভয়ে, পাছে ঐ নবোদ্ভিন্ন যৌবন তার সাম্রাজ্যের খুঁটি উপড়ে ফেলে। ভেঙ্গে দেয়। তছ্‌নচ্‌ করে তোলে তার শাসনের শৃঙ্খল আর শৃঙ্খলা।

সকাল বেলা। আমরা অনেকে ছিলাম নেতার ঘরে। উড্‌বার্ন পার্কের ঘরে। মস্ত বড় টেব্‌লের পশ্চিম প্রান্তে নেতা। ডানদিকে সতীন সেন, বাঁদিকে আমি। পূর্ণ দাশ, গড্‌বোলে আরও কয়েকজন অন্যদিকে।

হিজ্‌লী যেতে হবে। যেতে হবে দেরি না করে। ওদের দেহ নিয়ে আসতে হবে। দধীচির হাড় দিয়ে বজ্র তৈরী করতে হবে না?

সবাই নির্বাক। নিস্তব্ধ ঘরে দেয়াল ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া

আর কোন শব্দ নেই। টেব্‌লের ওপর ডান হাতের কনুইটা উঁচু করে করতলে থুত্‌নিটা চেপে নেতা বসেছিলেন। সাম্‌নে কাগজ। স্থির দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ।

সতীন সেন পড়ছিলেন একখানা বাংলা কাগজ। কাগজ থেকে চোখ দুটো ওপরের দিকে তুলে সতীন বাবু খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। পরে বললেন,— "কিন্তু পাশবিকতারও একটা সীমা থাকে। এদের কি তাও নেই?"

"না।" বললেন নেতা, "শুধু পাশবিকতা হলে থাকত।"

"নগ্ন পাশবিকতা ছাড়া এর ভেতর আর কী আছে?" প্রশ্ন করলেন পূর্ণ দাশ।

"ওরা ভয় পেয়েছে।" বলতে লাগলেন নেতা।

জীবনের ভয়। নিজের অস্তিত্বের ওপর সংশয়। ভয় না পেলে কেউ এমন মরিয়া হয়ে ওঠে না। আর হন্যে। অমন নৃশংসও হয় না। আত্মবিশ্বাস হারিয়েই মানুষ অমন নির্দয় আচরণ করে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যার যত বেশি সচেতনতা, সে তত অকুতোভয়, অচঞ্চল, নিরুদ্বেগ।

দেড়শো বছর একটানা ইংরেজ এদেশের ওপর প্রভুত্ব চালিয়েছে। চালিয়েছে নিরঙ্কুশ ভাবে। এবং এটাকে স্বাভাবিক বলে ও ভাবতেও চেয়েছে। এতদিনে প্রায়-অবিশ্বাস্য একটা সমস্যার ও সম্মুখীন হয়েছে। ভারতবর্ষ ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, ওকে অস্বীকার করবে, ওকে তাড়িয়ে দিতে চাইবে,—একথা ও কখনও ভাবেনি। ভাবতে চায়নি। ভাবতে পারেনি। একথা ভাবতে ওর শুধু অসুবিধে হয় না,—কষ্টও হয়। এই অসহ্য ভবিতব্য ও কল্পনায় আনতে চায় না। শিউরে ওঠে। আঁতকে ওঠে। ওর ভেতরকার এই দুর্বলতা যত বেশি আর বড় হয়ে ওর দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে ওঠে, তত বেশি আর ভয়ঙ্কর হয়ে ও প্রমাণ করতে চায় যে ও ভয় পায়নি।

বারান্দা-ঘেরা আদুল বাড়ী, তার চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া।

তাও দু'মানুষ উঁচু। দরজায় পাহারা। গুমটিতে গুমটিতে পাহারা। সঙ্গীনধারী সেপাই। বন্দুক উঁচিয়ে পাহারা দেয়। পাহারা দেয় কাদের ? যাদের হাতে অস্ত্রের মধ্যে ও রাখতে দিয়েছে ফাউন্টেন পেন।

কিন্তু ও জানে এহো বাহ্য। বন্দুক আর কামান যখন দাগবার সময় সত্যিই এসে দাঁড়াবে, ও জানে, অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। আরও ও জানে যে, ইংরেজের মৃত্যুবান কোনও ফ্যাক্টরীতে তৈরী হবে না, হবে জেলখানায়। আর তাই বন্দী করে রেখেও ওর সোয়াস্তি নেই। ছুতো পেলেই গলা টিপে ধরে। শ্বাস রোধ করে মারে ! হত্যা করে দূর থেকে গুলি ছুড়ে। তবুও ও জানে এর শেষ নেই। কিন্তু জেনেও ও মানতে চায় না। মানুষ মেরে শেষ করা যায়, কিন্তু একটা দেশ ? তার প্রতি একান্ত স্বাভাবিক মমতা ? প্রেম ?

দুদিন আগে প্যাক্ট সই হয়েছে। সই করেছেন গান্ধী। করেছেন আরউইন। সত্যাগ্রহ প্রত্যাহৃত। কিন্তু হত্যা ? রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্সে যাবার জন্যে গান্ধী প্রস্তুত হচ্ছেন। ডাঃ আন্‌সারীকে যাবার অনুমতি ইংরেজ দেবে কিনা এই নিয়ে চলেছে দর কষাকষি।(১)

আর এই সময়েই ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। গর্জে উঠল হিজলী বন্দিশালায়। গুলি লাগল সন্তোষ আর তারকেশ্বরের বুকে নয়,—বাংলার বুকে ! বাঙালীর মর্মমূলে। ঝরে পড়ল টাটকা তাজা লাল রক্ত। ভিজে গেল বাংলার নরম মাটি।

চেয়ার ছেড়ে নেতা উঠে দাঁড়িয়েছেন। চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়ান ঘরের ভেতর। হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। বলতে থাকেন,—"গান্ধী আরউইন প্যাক্‌ট আজ থেকেই শেষ হয়ে গেল। হিজলীতে হল ওর সমাধি।"

জানালার ধারে যেয়ে দাঁড়ান। গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে

(১) ডাঃ পট্টভি সিতারামিয়া প্রণীত কংগ্রেসের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৪৮৫পৃ

থাকেন। খানিকক্ষণ পর পেছন ফিরে আমাদের দিকে চেয়ে বলে উঠেন,—"সংগ্রামীর পক্ষে আপোষ মনোভাব মারাত্মক। অনেকের মনে এই মনোভাব দেখা দিয়েছে। একে না রুখতে পারলে কংগ্রেস ডুবে যাবে।"

বসলেন এসে চেয়ারে। দুটি করতল কপালের দুপাশে চেপে দৃষ্টি নীচের দিকে নিবদ্ধ করে বসে থাকলেন। নিস্তব্ধ ঘর। নেতার এই মৌন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল সারা কক্ষে। সকলের ওপর। কী একটা রুদ্ধ-বাক্ গোঙরানি ভেতরে ভেতরে কাতরাতে লাগল। প্রকাশ করা যায় না। অনুভব করা যায়। ভাষাহীন। কিন্তু বেদনায় মুখর।

সহসা নেতা উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন,—"সন্তোষদের মৃত্যু ব্যর্থ হবে না। এ মৃত্যু নয়, এই যথার্থ সত্যাগ্রহ। আত্মাহুতি। এর জ্বালায় ইংরেজ ধ্বংস হবে—ওর ধ্বংস ত্বরান্বিত করবে।"

স্থির হল নেতা যাবেন ওদের দেহ আনতে। কলকাতায় অবশ্যম্ভাবী বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ওরা ছুতো পেলে আবার গুলি ছুড়বে। খুঁজে বের করবে সন্তোষ আর তারকেশ্বরদের। হত্যায় ওদের উল্লাস না ?

হাওড়া থেকে কেওড়াতলা,—কে কোথায় থাকবে, তারও নির্দেশ দিলেন। কাগজে ছক তৈরী হল। ছকে উঠল এক-এক স্থানে এক-একজনের নাম।

উন্মাদ কলরোলে সারা কলকাতা জেগে উঠল। মৃত্যুর এমন মহিমময় সমারোহ কে কবে দেখেছে ? কে বলে সন্তোষ মরেছে ? তারকেশ্বর প্রাণ দিয়েছে ? সহস্র উদ্‌গ্রীব মৃত্যুঞ্জয়ী জয়ধ্বনি যাদের কপালে পরিয়ে দিল জয়তিলক, অবিস্মরণীয় করে রাখল যাদের জীবন গাথা, তারা যদি মরল তবে বাঁচল কে ? কারা ?

নেতা নিজের কাঁধে বহন করে চলেছেন শবাধার। শবাধার

শিবাধার হয়ে উঠেছে। সহিদ বিগ্রহের পূজা-মঞ্চ। স্তবকে স্তবকে ফুল পড়ছে। মালায় মালায় পাহাড় জমে উঠেছে। শোক নেই। দুঃখ নেই। অশ্রু নেই।

খর রোদ ঢেলে পড়ছে আকাশ থেকে গলিত লাভার মতো। ভ্রূক্ষেপ নেই। অগণিত দেশবাসী আগে, পেছনে, পাশে। ভয় নেই। ওরে ভয় নেই। শেষ নেই। সীমা নেই। সন্তোষরা মরেনি। মরে না কোনদিন। একজন সন্তোষ সহস্র হয়ে ফুটে ওঠে চোখের সম্মুখে। মৃত্যু নয়, জীবনের বিপুল বিচিত্র দুর্জয় মহিমায় চোখ-মুখ যাদের বিস্ফারিত। দীপ্ত।

কেওড়া তলার কালো বুক আলোর শিখায় লাল হয়ে উঠল। আগুনের শিখায় রক্তের লিখনে লেখা হল বাংলার নতুন ইতিহাস। বদ্ধ দুখানা বাহু বুকের ওপর চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন নেতা। জ্বালাভরা দৃষ্টি নিয়ে। নীরবে।

দিন কয়েক পরের কথা। বিক্ষোভ সভা আহ্বান করা হল মনুমেন্টের তলায়। সকাল বেলা কাগজে কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। নেতার সভাপতিত্বে সভা হবে। বক্তার মধ্যে আমাদের অনেকের নাম। ঐ একই দিনের কাগজে আরও একটি বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল। দেশ-প্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে ঐ একই স্থানে সভা হবে। সভার উদ্দেশ্য এক। স্থানও এক। অথচ সভা হবে দুটি। সভাপতি দুজন। সুভাষ আর সেনগুপ্ত।

বাংলার চিরন্তন অভিশাপ বাংলাকে কোনও দিনই কি রেহাই দেবে না? অনন্ত কাল ধরে এই লজ্জা আর কলঙ্ক বহন করে ইতিহাসের মসী-মলিন পৃষ্ঠা বাঙালী চরিত্রের কুৎসা গাইবে?

ভোর সকালেই মনটা খিঁচড়ে গেল। কেওড়া তলার আগুন কি নিভে গেল? নিভে গেল বাঙালীর বুক থেকে? ঐ আগুনও পারল না বাঙালীর কলুষ কালিমা পুড়িয়ে দিতে?

আনমনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে দেখা হল সতীন

বাবুর সঙ্গে। দুজনে গেলাম নেতার গৃহে। নিঃশব্দে ঢুকলাম নেতার কক্ষে। একটা বই-ভরা আলমারির সামনে নেতা দাঁড়িয়েছিলেন। হাতে কবির গীতাঞ্জলি। সাড়া নেই। যেন ধ্যানমগ্ন। আমাদের আগমন টের পেলেন না। সহসা চোখ তুলে ওপরের দিকে চাইলেন। চোখ দুটো বিস্ফারিত। লাল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন আমাদের দিকে। ঠোঁট দুখানা একটু বিকসিত হয়ে উঠল মাত্র। বিচ্ছুরিত দৃষ্টির আড়ালে ও কীসের আলো ?

ধীর পায়ে এসে বসলেন। হাতে তুলে নিলেন টেলিফোন।

"হ্যালো ! কে ? মিঃ সেনগুপ্ত ? আমি সুভাষ।"

কান দুটো ফেটে রক্ত বেরোতে চায়। নিটোল মুখাবয়বের ওপর ফুটে উঠেছে কয়েকটি রেখা। সঙ্কল্পের রেখা। কঠিন স্পষ্ট রেখা। দৃঢ় ওষ্ঠ। স্থির দৃষ্টি। আপন ভঙ্গী প্রকাশ করতে চায় মনের কোণের দুর্বার কর্ম-তৃষ্ণা। আর,—আর একটা দুরন্ত পণ। জীবন-জিজ্ঞাসার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এক নতুন মানুষ জেগে উঠছে।

"হ্যালো ! হ্যাঁ···আজকের সভার কথা···কী করা যায় বললেন নাতো···না। সভা একটাই হবে···না···না···না···একটা হবে। দুটো নয়। দুটো আমি হতে দেব না···না···কোন মতেই না···তাই ভাবছেন ?···বেশ তাই···ধরে নিন···জোর করেই···ভেবেছি আমি অনেক···নিরুপায়···না, আর না···ওটা আমার শেষ কথা···দুটো সভা আমি হতে দেব না······।"

খানিকক্ষণ আর কথা নেই। ওপার থেকে ভেসে আসছে স্বর। সহসা নেতার মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বললেন,—"হ্যালো, হ্যাঁ শুনুন। সভা একটাই হবে আর তার সভাপতি হবেন আপনি।"

টেলিফোন সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলেন।

মুখে কারও কথা নেই। কী যেন অশরীরী বাণী ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে না ? একটা স্তব। সামগানের মতো। অনির্বচনীয় হয়ে উঠল সহসা

সকলের অন্তর। ভরে উঠল কানায় কানায়। ধূপ চন্দন আর কেতকী-কুন্দের এ কী বিচিত্র সমাহার। আগামী কাল যে ব্যক্তিটি গত-জীবনের জীর্ণ নির্মোক মুক্ত হয়ে অনাগত নব-যুগ রচনায় যোগযুক্ত হয়ে উঠবেন, একি তারই সূচনা ? পূর্বাভাস ?

।জীবনের সকল অহঙ্কার, সাফল্যের গর্বোদ্ধত মাদকতা, স্বার্থ ও আত্ম-কেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণতার বহু উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে যে মহাপূজা সাঙ্গ হবে, তার পূর্বক্ষণে ত্যাগের মন্ত্রে নিজেকে অভিসিঞ্চিত করে না তুললে অধিকারীর বেশে পূজা মণ্ডপে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যাবে না। সেই পরম মুহূর্তে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা অলক্ষ্যে এই মানুষটির ললাটের মধ্যভাগে এক বিচিত্র পুণ্ড্রক অঙ্কিত করে দিলেন, যা স্বাতন্ত্র্যে, পরিচ্ছন্নতায়, বৈশিষ্ট্যে অনন্য হয়ে থাকল ভারতবর্ষের অলিখিত ইতিহাসের রেখাহীন শঙ্খ-শুভ্র পাতায় পাতায়।

ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোকের সমাবেশ হল মনুমেন্টের তলায়। সাইমন কমিশন প্রতিবাদ সভার পর এমন জনতা দেখা যায় নি ময়দানে। জনতার উন্মাদনা স্থির হয়ে এসেছে। চিন্তার ছায়া পড়েছে মুখে চোখে। একটা প্রগাঢ় গাম্ভীর্যের ভেতর থেকে আগামী কালের বিপুল ও সবল ইঙ্গিত উঁকি দিতে চায়।

সেনগুপ্তের পাশে সুভাষ। এ দৃশ্য অভিনব শুধু নয়,—সে-দিনের বাংলায় ছিল কল্পনাতীত। যে দুঃসহ বিপর্যয় জাতির ভাগ্যে এই আশাতীত সম্ভাবনার বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপ দিল, সে-তো দুঃখের বারতাই শুধু বহন করে আনেনি। দুঃখও সত্য। নির্মম সত্য। কিন্তু তার চাইতে বড় সত্য সে-দিন জাতির নব-জন্মের ললাট-পত্রিকা রচনায় ব্যাপৃত ছিল, এ কথা সেদিন কি কেও জানত ?

নেতা বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। বক্তৃতা হয়ে উঠেছে বাণী। ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সত্তা হয়ে উঠেছে মুখর। বাঙ্ময়। নেতা বলেছেন,—
"If Bengal lives who dies ? If Bengal dies who lives ?"

পরিবর্তন নয়, পরিবর্জন নয়—পরিহারও নয়। অবলুপ্তি। নিঃশেষে

নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। মিশিয়ে দিতে হবে জাতির মহা সত্তায়। ব্যক্তি সত্তার স্বকীয়তা ভুলতে হবে, লুপ্ত করে দিতে হবে। মমত্ব নিয়ে নয়। অনাসক্ত হয়ে। জাতির স্বার্থই হবে ব্যক্তির স্বার্থ। জাতির কল্যাণ হবে ব্যক্তির কল্যাণ। সবের মধ্যে একের মিশে যাওয়া। খুঁজে পাওয়া।

মরণ-পণ নয়—জীবন পণ। জীবনের সকল স্বার্থকতা, সকল ঐশ্বর্য, সকল চাওয়া উর্ধ্বমুখী করে নিবেদন করতে হবে জাতির প্রাণ-দেবতাকে। জীবন হয়ে উঠবে নৈবেদ্য।

সভা থেকে দুজনে চলে এলাম রিচি রোডের ছাতে। জ্যোৎস্না ধোয়া ছাত। শীতল পাটি বিছিয়ে দিলাম। নেতা শুয়ে পড়লেন। আর তখনি বলে উঠলেন,—"চা খাব।"

রাত অনেক। উঠে বসে নেতা বললেন,—"পাশের বাড়ীটা কার?"

"কবি কামিনী রায়ের।"

"আজকের বক্তৃতায় যে কবিতাটি বলেছিলে আবার বল তো।"

"ছোটখাট সুখ দুঃখ কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ ; মা আমার মা আমার।"

"কার লেখা?"

"কামিনী রায়ের।"

আন্দোলনের ফল বেশি আশাপ্রদ না হলেও শাসন যন্ত্রের অচলায়তন একটু যেন নড়ে উঠল। তদন্তের হুকুম হল। আমরা চললাম হিজলী। নেতা, সতীনবাবু, গডবোলে ও আমি। আমাদের কৌঁশুলী হয়ে চললেন, বি, সি, চ্যাটার্জি ও এন, আর, দাসগুপ্ত। হিজলীতে উঠলাম আমরা গডবোলের দাদার বাড়ী। চ্যাটার্জি আর দাশগুপ্তের স্থান হল রেল বিভাগের অতিথি ভবনে। গডবোলের দাদা রেলের কোন্ এক বিভাগে চাকুরী করতেন। মাঝারী গোছের অফিসার ছিলেন। গডবোলে ছিলেন মহরাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। জীবনের প্রথমেই গডবোলে শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

বাংলার প্রাথমিক শ্রমিক আন্দোলনের উনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ। সারাক্ষণ হাফপ্যান্ট পরে থাকতেন। মুখের ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা শুনতে ভারী মিষ্টি লাগত। ইংরেজী বলা বেশ রপ্ত ছিল। হিন্দীতেই বক্তৃতা করতেন। এই সরস উদার অমায়িক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যুবক নিজের অকুণ্ঠ আদর্শ আর নিরাসক্ত জীবন যাত্রায় শুধু তৃপ্তিই পেতেন না, পেতেন আনন্দ।

১৯৩০এ আলিপুর জেলে আমাদের নাট্যাভিনয় হয়েছিল। বই ছিল ক্ষিরোদ প্রসাদের প্রতাপাদিত্য। গডবোলে রডার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সত্যেন মজুমদার শঙ্করের ভূমিকা নিয়েছিলেন, আর আমি প্রতাপের। গডবোলের ভাঙ্গা বাংলা রডার মুখে এত বেশি স্বাভাবিক আর মধুর হয়েছিল যে, নেতা ওঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। গডবোলের হাঁপানি রোগ ছিল। অকালে মারা গেছেন।

বন্দীশালার সম্মুখের অফিস ঘরে তদন্তের কাজ সুরু হল। জন সাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে নেতা তদন্তের সময় উপস্থিত থাকবার অনুমতি পেয়েছিলেন। সতীনবাবু আর আমি সাজলাম সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি। প্রথম দিনের কাজ হতেই নেতা আর আমি ওখান থেকে সোজা গাড়ীতে চেপে বসলাম। পরদিন তদন্ত হবে না। এই অবকাশে কলকাতায় আমরা ছুটলাম। ভাঁড়ারে টান পড়েছে। টাকা যোগাড় করতে হবে। সারাদিন নেতার কাটল ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে। যা পাওয়া গেল, তাই নিয়ে রাতের গাড়ীতেই আবার আমরা রওনা হলাম। স্টেশনে এসে নেতা বললেন,—"বেশি কিছু যোগাড় হয়নি। ওখানকার খরচা অনেক। থার্ড ক্লাসেই আমরা চলি,—কেমন ?"

আমি বললাম,—"থার্ড ক্লাসে যাই ফোর্থ ক্লাস নেই বলে,—কিন্তু-—"

"না-না ; আমিও বেশ যেতে পারব।"

"সেকথা নয়। গাড়ীতে আর যারা যাবে, তাদের কথাই ভাবছি।"

"তাদের কথা ?"

"হ্যাঁ, তাদের কথা। বেচারারা না পারবে একটু ঘুমতে, না পারবে সোয়াস্তিতে বিড়ি টানতে।"

নেতা হেঁসে উঠলেন। বললেন,—"মুখ আর মাথা বেশ করে আমি চাদরে জড়িয়ে নেবোখন। কেউ চিন্তেই পারবে না।"

"আগে বললে দাড়ি আর গোঁফ আমি ভাড়া করে আনতাম।"

থার্ডক্লাসের একখানা পেছনের বেঞ্চে আমরা স্থান পেয়ে গেলাম। গাড়ী ছাড়বার তখনও দেরি ছিল। গায়ে ঠেলা দিয়ে নেতা বললেন,—"এই খেয়ে এসেছ ?

"সময় পেলাম কই ?" বলেই জিজ্ঞেস করলাম,—"কেন ?"

নেতার বাড়ী থেকেই ওঁর সঙ্গে স্টেশনে আসি। কে একজনের ওপর ভার ছিল আমার বাড়ীতে খবরটা পৌঁছে দিতে। খাওয়া কারও হল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে নেতা বললেন,—"চানাচূর পাওয়া যাবে না ? ওটা আমার বেশ লাগে।"

"হুঁ। দেখি।" উঠে গেলাম।

ফিরে আসবার সময় একটু চাঞ্চল্যের আভাষ মালুম হল। আর সেই সঙ্গে ফিস্‌ফিসানিও। অনেকেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উঁকি মারছে। ফিস্‌ফিস্ করে বলছে,—"কেরে লোকটা ?"

কেউ বলছে,—"চেনা-চেনা মুখ খানা।"

আরেকজন,—"মুখ-মাথা বেঁধে রেখেছে কেন ? অসুখ না কি ?"

কিন্তু বিপদ ঘটাল চানাচূর। মুঠো মুঠো করে মুখে ফেলতে ফেলতে কখন যে অলক্ষ্যে চাদর সরে গিয়ে মুখ-মাথা বেরিয়ে পড়েছে, দুজনের একজনেরও সে খেয়াল নেই। সত্যিই ক্ষিধে পেয়েছিল। আর যাবে কোথা ? হুমড়ি খেয়ে পড়ল কয়েকটি ছেলে। একেবারে নেতার পদপ্রান্তে। হাতে চানাচূরের ঠোঙ্গা, ওর মহিমায় মুখ বন্ধ। হাঁ-হাঁর বদলে মুখ থেকে বেরোচ্ছে হুঁ-হুঁ। দম আটকে আসছে। ফ্যাসাদ আর কাকে বলে ? ঠ্যালা এখন সামলায় কে ? জল পাই

কোথা ? ছুটলাম নীচে। গাড়ীতে তখন হরির লুট সুরু হয়ে গেছে।

উদ্ধার করলেন তুজন রেলের অফিসার। এর মধ্যে তুবার চেন টানা হয়ে গেছে। পাশের কামরা, তার পাশের,—তারও পাশের,—সব জানাজানি হয়ে গেল।

একজন অফিসার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। বললেন বেশ বিনীতভাবে,—"স্যার, পাশের একটা 'কূপে' আমরা খালি করে এসেছি।"

"কিন্তু কেন ?" বিপন্ন সুর নেতার কণ্ঠে।

"গাড়ী এমনিতেই লেট হয়ে গেছে।"

"চলুন।"

সেদিনের কোর্ট ভাঙ্গবার পর আমরা কয়েকজন বসে ছিলাম অতিথি ভবনের দোতলায়। চাটার্জি যে-ঘরে থাকতেন, সেই ঘরে। চা খাবার পর চাটার্জি বললেন,—"রোববার কাল। আমি কলকাতা থেকে ঘুরে আসি।"

এ ভয়টা আমাদের ছিল। কিন্তু না-ই-বা বলা যায় কেমন করে ? চাটার্জি ছিলেন নামজাদা কৌঁসুলী। অনেক পশার। তবু যে তিনি বিনি পয়সায় একাজে এসেছেন, কষ্ট স্বীকার করে থাকছেন, এতেই আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলাম।

আমরা কেউই কোন কথা বললাম না। আমাদের নীরবতা লক্ষ্য করে চাটার্জিই বললেন,—"কিছু ভাববার নেই। আমি ঠিকই এসে পড়ব।"

কিন্তু নেতা আশ্বস্ত হতে পারলেন না। চাটার্জি কোনও কাজে যদি আটকে যান ? কী অসহায় আর কদর্য্য অবস্থাতেই না পড়তে হবে! লোকে কী বলবে ? আর ইংরেজ ? নেতা আমার দিকে ফিরে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন,—"তুমিও তো কলকাতায় যাচ্ছ আজ ?"

নেতার অভিপ্রায় বুঝতে আমার দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গে

বললাম,—"না গেলেই নয়। সোমবারেই ফিরে আসব।" অর্থাৎ চাটার্জিকে চোখে চোখে রাখতে হবে আর সঙ্গে করে সোমবার নিয়ে আসতে হবে।

প্রত্যুষে বাড়ী এসে পৌঁছলাম। আমার রিচি রোডের বাড়ী। বড় রাস্তা থেকে ছোট একটা এঁদো গলির মাথায় আমার বাড়ী। পথেই সেবা আর দীপুর সঙ্গে দেখা হল। আমার মেয়ে আর ছেলে। ওরা তাকিয়ে ছিল রাস্তার দিকে। হয়তো আমারই প্রত্যাশায়। ওপরে উঠে ঘরে পা দিতেই চমকে উঠলাম। ঘর,—না শ্মশান? চারদিকে বিছানা-পত্র ছড়ানো। ছেঁড়া বালিশের তুলোয় ঘর-বারান্দা একাকার। বই-কাগজ তছ নছ হয়ে গেছে। আর সেই ছন্নছাড়া বিশৃঙ্খল মেঝেয় গালে হাত দিয়ে বসে আছেন গৃহিণী।

অনেকক্ষণ মুখ থেকে কথা ফুটল না। ঘর-বাড়ী দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। আমার ঘর। কিন্তু ওর গায়ে লেগে ছিল হিংস্র জানোয়ারের নখর আর দন্তের ক্ষতচিহ্ন।

রাত্রের গাড়ীতে চাটার্জিকে নিয়ে ফিরে গেলাম হিজলী। দুদিন বাদে ফিরে এলাম কলকাতা। মাঝপথেই তদন্ত শিকেয় উঠল।

সেইদিনই বিকেলে পুলিশ এসে বন্দী করে নিয়ে গেল। খানিক দূরে যেয়ে পেছন ফিরে চাইলাম। সেবা-দীপু চেয়ে আছে সেই পথের দিকেই। নিষ্পলকে।

ছয়

থানার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত। কুমিল্লার কামিনী দত্তের ভাই। বেঙ্গল ইমিউনিটির প্রতিষ্ঠাতা। নেতা পাঠিয়েছিলেন ওঁকে। পুলিশের গাড়ীতে আমাকে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার কেউ নেতাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল।

জামিন ওখানেই মঞ্জুর হল। সোজা ক্যাপ্টেন দত্তের গাড়ীতে চলে গেলাম নেতার কাছে। একরাশ কাগজ-পত্র আর নানা কাগজের কাটা অংশ নিয়ে একমনে দেখছেন, পড়ছেন, প্রয়োজনীয় অংশ টুকে নিচ্ছেন। চোখ তুলে একবার চাইলেন। আর অমনি বলে উঠলেন,—"অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে। আমি বলে যাই, তুমি লেখো।"

এখুনি থানা থেকে এলাম। কেন পুলিশ গ্রেপ্তার করল, কোন্ ধারায় করল—ও-সম্বন্ধে একটা কথাও নয়। ওটা যেন মামুলি ব্যাপার। ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। যাত্রা-পথের নিত্যসঙ্গী। মুক্তিব্রতীকে বিদেশী শাসক কথায় কথায় ধরে নিয়ে যাবে, তার ওপর হবে অকথ্য অত্যাচার, করবে অপমান, এই-তো স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রমটাই-না ভাববার কথা।

স্বাধীনতা চাওয়া আর পরাধীনতার বেদনা বোঝা তো এক নয়। স্বাধীনতা চায় সবাই। ভালোও হয়তো বাসে। কিন্তু পরাধীনতার তীব্র-তিক্ত বেদনায় অস্থির হয়ে ওঠে ক'জন? ছুটে যায়- সর্বস্বপণ করে ওর বাঁধন ছিঁড়তে? লোহার শেকলে বাঁধা পড়ে শেকল কাটতে? গলা বাড়িয়ে দেয় ফাঁসির ফাঁসে?

বেশি নয়। খুবই সামান্য কজন। কিন্তু তবু তুচ্ছ নয়। ঐ ক'টিই কোটীকে সাড়া দেয়। জাগিয়ে তোলে। ঈশান কোনে যে-অগ্নি-বিষাণ বেজে উঠল অদূর ভবিষ্যতে,—সে-বাঁশীও বাজিয়েছিল ঐ ক'জনই।

নেতা বলে চলেছেন। ইংরেজের একতরফা অত্যাচারের পূর্ণাবয়ব চিত্র। গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট নিয়ে সবাই আত্মহারা। ইংরেজ এই প্রথম ভারতবর্ষের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেচ্ছায় প্যাক্ট করেছে, আপোষ! স্বীকৃতি পাওয়া গেছে ইংরেজের কাছ থেকে। নেতাদের অসামান্য আত্মত্যাগ সার্থক হয়েছে। সার্থক করে তুলেছে আত্ম-প্রসাদ।

হয়তো আরউইনের সত্যি একটু সদিচ্ছা ছিল। মানুষটি রক্ষণশীল

দলের সভ্য হলেও ওঁর ভেতরকার সত্তার কোথায় যেন উদারনৈতিক আমেজ ছিল। কিন্তু তিনি বিদায় নিয়েছেন। এসেছেন ওয়েলিংডন। জবরদস্ত টোরী। ঝানু রক্ষণশীল। ভারতবর্ষের তেলে-জলে পাকা সিভিলিয়ান ইংরেজ, দেশীয় ধনিক পেটমোটা বাদশা-নবাবের দল আর ঐ এ্যাংলোর পাল ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছিল। চাকা ঘুরে সত্যিই যদি যায়, ঐ নেংটি-পরা গান্ধী আর ওর চ্যালা-চামুণ্ডার তাঁবেদারি করে দিন গুজরাতে হবে। ভাবতেও-যে দেহ-মন অবশ হয়ে উঠতে চায়। শ্রমিক সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিলেতের মেজাজও পাল্টে গেছে।

ওরা এত ভাবতে পারেনি। ১৯২১এ ওরা সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিল। আচম্‌কা ১৯২১ এসে পড়েছিল ওদের বুকের ওপর হুড়মুড় করে। উপায়ন্তর না দেখে আপোষের জন্যে, তাই ইংরেজ ব্যস্তও হয়ে উঠেছিল একটু তাড়াতাড়ি। কিন্তু ওদের ঝক্কি লাঘব করে দিলেন গান্ধী নিজেই। তারপর দীর্ঘ দশ বৎসর কেটে গেছে। বিদ্রোহীর আওয়াজ থেমে গেছে। কংগ্রেসের ভেতরে নানা গলদ মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছে। দেশবন্ধু গত। ১৯২১এর পর একক দেশবন্ধুই কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সত্যাগ্রহের কথা লোকে ভুলে গিয়েছিল। আইন অমান্যের প্রশ্নও ছিল না। এক স্বরাজ্য দলের কাউন্সিলী কলা-কৌশলই লোকের মনে যৎকিঞ্চিৎ উৎসাহ জোগাত। কাউন্সিলের ঝাঁজালো বক্তৃতা, বেশামাল সরকারী দলের তোত্‌লানো কথা, সর্বোপরি নানাস্থানের সরকারী তরফের পরাজয়,—সবই খানিকটা উপভোগ্য তো ছিলই,—রক্তও গরম রাখত। সেই দেশবন্ধু নেই। (১) ১৯৩০এর হুম্‌কি তাই ইংরেজ প্রথমটা গায়ে মাখেনি। আমোল দিতে চায়নি। ইংরেজের কাগজে সত্যাগ্রহ আর গান্ধীর প্রস্তাবিত

(১)···সে-সময়কার এ্যাসেমব্লীর নানা ঘটনা ও স্বরাজ্যদলের প্রভাব, সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে যে, বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

—ডাঃ পট্টভি প্রণীত কংগ্রেসের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ।

আইন অমান্য নিয়ে বিদ্রূপ আর কটাক্ষের অন্ত ছিল না। কিন্তু সত্যিই যেদিন মুক্তধারা জাহ্নবীর অবাধ উচ্ছল প্লাবনে সারা দেশ টলমল করে উঠল,—ইংরেজেরও টনক নড়ল। সেদিনকার বলডুইন-চার্চিল-রেডিং-বারকেন হেডের দল আর এদেশের সরকারী লৌহ কাঠামো বীর বিক্রমে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। মরিয়া হয়ে হন্যে জানোয়ারের মতো হিংস্র আক্রমণে আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। পারেনি। পারেনি বলেই প্যাক্ট করতে চেয়েছিল।

কিন্তু বাংলা? ইংরেজের এই নির্লজ্জ পাশবিকতায় বাংলা বিস্মিত হয়নি। তাই এর জন্যে বাংলা প্রস্তুতও ছিল। দুমুখী অভিযান শুরু হল বাংলায়। সত্যাগ্রহ আর সশস্ত্র আক্রমণ চলল পাশাপাশি। চট্টগ্রামের শ্যামল বুকে আগুন জ্বলে উঠল। দাবানলের বন্যা। লাল। জাতির শতাব্দীব্যাপী পাপ পুড়িয়ে দিতে হবে না? ইংরেজকে ওরা তাড়াতে পারেনি। কিন্তু জয় করল দেশকে। দেশবাসীর ঘুমভাঙ্গা অন্তরকে। অবাক বিস্ময়ে গোটা ভারতবর্ষ চেয়ে দেখল ওদের পানে। রাঙ্গা-জবার মাল্য-পরা চট্টগ্রামের পানে।

গান্ধীজি এতে ব্যথা পান। কিন্তু উপায় কী? দিল্লী প্যাক্টের ফলে সবাই মুক্তি পেল। পেল না শুধু বাংলার ছেলেরা। বাংলার হাজার জোয়ান আটকে পড়ে থাকল। ইংরেজের কারাগারে। মহাত্মাজি অস্পৃশ্যতা মানেন না,—মানেন জাতিভেদ। বাংলার জাত আলাদা। হিংসার রক্তমাখা নামাবলী ওর গায়ে। গান্ধী-স্বরাজ বাঙালীর জন্যে নয়। বাঙালীকে বাদ দিয়ে।

ইংরেজ খুব্‌লে খুব্‌লে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল চট্টগ্রামের আগুন-ঝলসান গায়ের মাংস। পিশাচ প্রেতের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। গোরা আর দিশী পল্টনের দল রাস্তায় টহল দিতে লাগল। সামরিক আইনে বাড়ীর বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হল! সারা চট্টগ্রামের সাইক্ল্ আটক পড়ল থানায়। নাম আর বংশ-পরিচয়-লেখা ঠিকুজি গলায় ঝুলিয়ে রাখবার হুকুম হল সমগ্র সহরে।

মেদিনীপুরে জয়শঙ্খ বেজে উঠল। পেডি আর বার্জ ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। ডালহৌসি বাগান থেকে গর্জে উঠল মরণ-বজ্র। পেটের ছেঁড়া পাকস্থলী চেপে ধরে অনুজা ঢলে পড়ল বাংলার নরম কোলে। পাশেই অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা কলঙ্ক-স্তম্ভ। মিথ্যার কালি কলঙ্ক সরিয়ে সিঁদুর মাখিয়ে দিল অনুজা।

প্রদ্যোতের বিদেহী আত্মা জয়গান গেয়ে ওঠে। দীনেশ-বাদল-বিনয় মৃত্যুর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। নিজের হাতে মৃত্যু ওদের ললাটে পরিয়ে দেয় অমরত্বের জয়টীকা।

একটা করে সংবাদ পৌঁছয়,—আর ছটফট করতে থাকেন নেতা। আহার ঘুচে যায়। নিদ্রা হয় বিরল। সময়ে সময়ে কেঁদে ওঠেন শিশুর মতো। সোনার চাঁদ ছেলের দল···এরা হতে পারত যে-কোনো জাতির নাম করা সেনাপতি···অকালে চলে গেল······

এরপর ঢাকা। সকাল বেলা। সবে ঘরে ঢুকেছি। একখানা চিঠি সামনে এগিয়ে দিয়ে নেতা বললেন,—"পড়।"

ঢাকার কাহিনী।

রায় বাহাদুর গিরীশ নাগের বাড়ী পুলিশ তছনছ করে ফেলেছে। আরও অনেকের বাড়ী। পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল ওখানকার গুণ্ডারা। ধরে নিয়ে গেছে শত শত যুবককে। মেয়েরাও বাদ যায় নি। এক চরম সন্ত্রাসের একতরফা শাসন চলেছে ঢাকায়। পড়া শেষ করে তাকালাম। সাম্‌নে সজল একজোড়া চক্ষু।

সহসা নেতা বলে উঠলেন,—"আমি ঢাকা যাব আজই।"

জানতাম, না করা নিষ্ফল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। বললাম "ঘন্টা তুয়েক পর আসছি।" বলেই বেরিয়ে গেলাম। সহ-কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে পর দিন এ্যালবার্ট হলে ঢাকার পরিস্থিতি আলোচনার জন্যে সভার ব্যবস্থা করে ফিরে এলাম।

এ্যালবার্ট হলের সভায় ঢাকার পুলিশ জুলুম তদন্ত কমিটি গঠিত হল। সভ্য হলেন নেতা, যোগেশ গুপ্ত, হেমেন দাসগুপ্ত, ছাত্রনেতা

অবিনাশ ভট্টাচার্য আর হলাম আমি। রাত্রির গাড়ীতে সবাই ঢাকা রওনা হলাম।

নারায়ণগঞ্জের ষ্টিমারে চা খাচ্ছিলাম সবাই একসঙ্গে। যোগেশ-বাবু বাইরে ছিলেন। এসেই বসলেন,—“অনেক পুলিশ দেখলাম ষ্টিমারে। একজন অফিসারও।”

আমরা সজাগ হয়ে উঠলাম। বুঝতে বাকী রইল না যে ঢাকার যাত্রা নির্বিঘ্ন হবে না। নেতা চা খাওয়া শেষ করে সোজা কেবিনে ঢুকে পড়লেন। যাবার সময় আমাকে ডেকে গেলেন।

কেবিনে ঢুকেই দেখি সুটকেস খুলে অনেক কাগজ পত্র বের করে ফেলেছেন। গোটা দুয়েক ফাইলও। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, —“সব কাগজ পত্র বিছানার সঙ্গে বেঁধে অবিনাশের জিম্মায় দিয়ে দাও। আর সুটকেসটাও।”

“কিন্তু অবিনাশের জিনিস-পত্তরও তো সার্চ করতে পারে।” বললাম আমি।

“ওকে কেবিনে না রেখে ইন্‌টার ক্লাসে বসতে বলো। আর হেমেনবাবুকেও।”

ষ্টিমার পৌঁছল বেলা একটার পর। দূর থেকেই দেখলাম অনেক লাল পাগড়ী। বোঝবার আর কিছু বাকী থাকল না। নেতাকেই শুধু পুলিশ আটকাবে এই সিদ্ধান্তের ওপর ব্যবস্থা হল যে যোগেশবাবু আর হেমেনবাবু সোজা চলে যাবেন ঢাকা। অবিনাশ অপেক্ষা করবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু নিজেকে ঢেকে। আমি থাকব নেতার সঙ্গে।

নামবার একটু আগে নেতা বললেন,—“ব্যাগটা ভালো করে দেখে নিও। নেই কিছু, তবু দেখা ভালো।”

গ্লাডষ্টোন ব্যাগ। টুকিটাকি জিনিষ ছিল ওতে। কামাবার সরঞ্জাম, ব্রাশ, টুথপেষ্ট,—এমনি সব। যোগেশবাবু আর হেমেনবাবু আগে নেমে গেলেন। মালপত্তর নিয়ে তারপর অবিনাশ। আমরা শেষে। পুলিশের বহরই জনতা বাড়াতে যথেষ্ট। যোগেশবাবুদের

মুখে নেতার আগমন-বার্তা রটতে-না-রটতে অগণিত মানুষে নদীতট পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ষ্টিমার থেকেই আমরা দেখছিলাম জনতার উৎসুক চঞ্চলতা।

ঘাটে নামতেই একজন অফিসার নেতার সামনে একখানা কাগজ ধরল। দৃক্‌পাত না করে ওকে পাশ কাটিয়ে নেতা ওপরে উঠে গেলেন। অফিসারটির অবস্থা ন যযৌ ন তস্থৌ। পেছন পেছন ছুটতে লাগল। মুখে অসহায় বোকা-বোকা ভাব।

মানুষের পাঁচিল চিড়ে আমাদের এগোতে হচ্ছিল। তারপর জয়ধ্বনি, বন্দেমাতরম আর নমস্কার। কথা শোনা যায় না, বোঝাতো দূরের কথা।

একটু যেতেই সামনে এসে দাঁড়াল একজন ইংরেজ। বুঝলাম আরও বড় কেউ। পরে জানলাম সুপারিনটেন্‌ডেন্ট। নেতার সামনে দাঁড়িয়ে বলল,—"কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি বন্দী করলাম।"

নেতা হেসে বললেন,—"ওটা জানতাম। আর কিছু?"

সুপারও হেসে ফেলল। বলল,—"আর বর্তমানে আমার তত্ত্বাবধানে আপনাকে খানিকটা সময় কাটাতে হবে।" বলেই আমার দিকে তাকাল। বলল,—"ইনি?"

"আমার সেক্রেটারি।"

"নাম?"

নাম বলতেই বলল,—"আপনার নেতার সঙ্গে থাকতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না?"

বুঝলাম আমিও বন্দী। বললাম,—"ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।"

ডাক বাংলোয় আমরা উঠলাম। বারান্দায় চেয়ার পাতাই ছিল। আমরা বসে পড়লাম। ডাকবাংলোর হাতার সীমানা ঘেঁষে পুলিশের বহর দাঁড়িয়েছিল। চার-পাঁচ হাত অন্তর অন্তর। কেউ যদি ঢুকে পড়ে। সতর্ক থাকতে হবে বৈ কি?

বেলা গড়িয়ে গেল। দুটোর পর এলেন স্থানীয় দুজন ভদ্রলোক। নমস্কার করে বললেন,—"অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে অনুমতি পেয়েছি। একটু খাবার নিয়ে আসি ?"

সকাল থেকে চা ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। নেতার মুখ-চোখ খুসিতে ভরে উঠল। হাসতে হাসতে বললেন,—"খাবার নয়। শুধু দু পেয়ালা চা।"

অপরাহ্ন এগিয়ে আসছে। অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ। দেখছিলাম দূরের জনতা। ওদের মধ্যে খুঁজে পেলাম অবিনাশকে। ইঙ্গিতে কলকাতায় টেলিগ্রাম পাঠাতে বলে দিলাম।

একটুক্ষণ বাদে সুপার এসে দাঁড়াল। নেতা ওর দিকে তাকিয়ে বললেন,—"আমরা সত্যিই বন্দী ?"

"না, ঠিক বন্দী নয়।" সুপার জবাব দিল।

"তবে ?"

"মানে, ঢাকায় আপনাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না।"

"গায়ের জোরে ?"

"আমি নিরুপায়।"

নেতা উঠে দাঁড়ালেন। চক্ষু দুটি সুপারের দিকে নিবদ্ধ। মুখে খানিকক্ষণ কথা নেই। কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে। বলে উঠলেন সহসা,—"সত্যি সত্যি গায়ের জোরেই আমাকে আটকাতে হবে। নইলে ঢাকা আমি যাবই।" বলেই নেতা চলতে উদ্যত হলেন। সামনে দাঁড়াল সুপার। আমি পেছনে।

"মিঃ বোস, বিশ্বাস করুন, আমি নিরুপায়।" বলেই সুপার সন্তর্পণে নেতার বাম বাহুর ওপর কয়েকটা আঙ্গুল রাখল।

বুঝতে আমাদের দেরি হল না। এর বেশি ও কিছু করতে চায় না। আঙ্গুলের স্পর্শ যেন গায়ের জোরের প্রতীক। তাকিয়েছিলাম নেতার দিকে। মুহূর্তে তাঁর সমস্ত অবয়ব বদলে গেল। মৃদু হেসে বললেন,—"ধন্যবাদ। কিন্তু—" পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর একটু চড়িয়ে

বললেন,—"নিছক গায়ের জোরেই কিন্তু আমায় আটকানো হল।"

"আমি দুঃখিত। খুবই দুঃখিত।" বলেই সুপার পাশ ফিরে দাঁড়াল। আবার বলল,—"এইবার আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে।"

আমরা এগিয়ে চললাম। আগে আগে সুপার। আমরা পেছনে। পথে এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়ালাম পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে। ব্যবধান খানিকটা রেখে কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়েছিল। মানুষের সে এক মহামেলা। রাস্তার দুপাশে মানুষ। ঘরের চালে মানুষ। গাছের ডালে মানুষ।

নদীর ধারে গিয়ে সুপার থামল। ঘাটে একখানা ছোট লঞ্চ। হয়তো ওরই। সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হাতের ইঙ্গিতে বলল,—"প্লীজ।" লঞ্চে আমরা ঢুকলাম। পেছনে এল সুপার। সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চ নড়ে উঠল। শুরু হল যাত্রা।

কিন্তু কোথায়?

অজানার পথে।

কারও মুখে কথা নেই। দূর থেকে ভেসে আসছিল জনতার ধিক্কার। চিৎকার। আর বাঙ্ময় ক্রুদ্ধ অভিশাপ। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। নরম রোদের শেষ স্পর্শ। মিষ্টি। আরও মিষ্টি লাগছিল শান্ত নদীর স্নিগ্ধ বুক। লঞ্চ এগিয়ে চলল।

দূরে একখানা ষ্টিমার। বড় নয়। মাঝারি। লঞ্চ ভিড়ল ওর গায়ে। তখনও জানতাম না যে ওর গর্ভেই আমাদের ঢোকানো হবে। ষ্টিমার থেকে নেমে এল একখানা সিঁড়ি। আবার সুপার খুব বিনীতভাবে বলল,—"এইবার আমায় বিদায় দিতে হবে।" বলেই এগিয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল,—"প্লীজ।" আমরা উঠলাম। ওপরে উঠতেই সুপার আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল,—

"আমার দায়িত্ব শেষ হলো। আপনার নেতাকে আপনার হাতে দিয়ে এবার আমার ছুটি।" সাগ্রহে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে সুপার চলে গেল লঞ্চে।

ষ্টিমার চলছে। শীতলক্ষার বুক চিরে চলছে। অনুসন্ধানী আলো পড়ছে এপার থেকে ওপারে। তীব্র আলো। ওর রেখায় রেখায় পতঙ্গ ওড়ে। গঙ্গা-ফড়িং ঝাঁপিয়ে পড়ে। উড়ে আসে সহস্র নানা কীট।

আমরা ডেকে। রেলিং ধরে নেতা দাঁড়িয়ে। দূর-প্রসারী দৃষ্টি ওঁর চোখে। স্থির। মুখে কথা নেই। অজানা যাত্রা। এ-যাত্রার শেষ হবে কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে? থামবে তো কোথাও?

চাইলাম নেতার দিকে। নির্বাত নিষ্কম্প দেহ। যেন ধ্যানস্থ।

১৯৩১ শেষ হতে দেরি নেই। ১৯২১ থেকে ১৯৩১। দশ বছর। কেটে গেছে নিঃশব্দে। গেছে না জানিয়ে।

সারাদিনের চাঞ্চল্য থেমে গেছে। মনে জেগে উঠেছে শান্ত স্থৈর্য। মন ভেতরে পথ খোঁজে। দেখতে চায়। তলিয়ে যায়। তলিয়ে যায় অতীতের গহন বনে। পর্দায় ভেসে ওঠে ছবি। জ্যান্ত আর স্পষ্ট ছবি।

১৯২১এর প্রথমটা। শীতকাল। দেশবন্ধুর বাড়ী। শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর। হেঁটে আসতে হয়েছিল। ট্রামের ধর্মঘট চলছিল তখন। এসে পৌঁছেছিলাম বেলা দশটায়। গা পা মাথা ধুলোয় ভর্তি। রুক্ষচুলের বোঝা মাথায়। ছ-হাতি একখানা খদ্দরের কাপড় পরণে। আর একখানা গায়ে। আমার বসন ও ভূষণ।

নীচের বড় ঘরখানায় বসেছিলেন অনেকে। অনিলবরণ রায়, সত্যেন মিত্র, হেমন্ত সরকার, আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আরও কয়েকজন। দ্বার-পথে আমাকে দেখেই দেশবন্ধু উঠে এসেছিলেন।

প্রণাম শেষ করে উঠতেই দুহাতে আমাকে ধরে মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠেছিলেন,—"কোত্থেকে এলে? উঠেছো কোথায়?"

"আমহার্স্ট স্ট্রীটে। ওয়াহেদ হোসেনের ন্যাশনাল কলেজের হস্টেলে।" ভালো করে শেষ করতেও পারলাম না। পাশের সত্যেন বাবুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলে উঠেছিলেন দেশবন্ধু,—"সত্যেন, দেখছো ওর মুখ চোখ? ভেতরে নিয়ে যাও।"

এক সীমাহীন অন্তরঙ্গতার উদ্বেল অস্থিরতা ছিল সে কণ্ঠে। চা খাবার খেয়ে সবে এসে বসেছি। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন একজন। জন নয়—মানুষ। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখলাম সেই মানুষটিকে। পরিপূর্ণ যৌবনের উজার-করা ঐশ্বর্যসম্ভার ছিল সে-দেহের প্রতিটি ছন্দে। ছিল উন্নত নাসায়, ওষ্ঠে, ভাসা দুটি চোখে, প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটে। ছিল দীঘল দেহের প্রতিটি রেখায়। রক্ত-ভাঙ্গা দুটি পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে স্মিত হাসিতে।

দেশবন্ধু বলে উঠলেন,—"সুভাষ!"

সুভাষ। সামান্য তিনটি অক্ষর। কিন্তু কতো অসামান্যই-না হল তিনটি এক সঙ্গে মিলে। চোখ ফেরাতে পারলাম না। দেশবন্ধু চিনিয়ে দিলেন দুজনকে দুজনের কাছে। পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন। একটু চুপ করে থেকে পরক্ষণেই আমার হাত ধরে বেড়িয়ে এলেন। সামনে বাগান। এক কোণে দুজনে বসলাম। তারপর শুরু হল জানবার পালা। চেনবার পালা। সে কতো কথা। অতীত জীবনের কথা। ছাত্র জীবনের ইতিহাস। বর্তমানের হিসেব-নিকেশ। ভবিষ্যতের স্বপ্ন-কথা।

ছবির পর ছবি। দেখেই চলেছি। সম্বিৎ ফিরে পেলাম। দশ বছর। কিন্তু কাটল কেমন করে? কাটল কবে?

সেই মানুষটিই আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। চোখ ফিরিয়ে আবার তাকালাম ওঁর দিকে। সেই মুহূর্তে উনিও ফিরে চাইলেন।

দুজনে একই সঙ্গে হেসে উঠলাম। পেটে সারাদিন দানা পড়েনি। স্নান নেই। এক বস্ত্রে। তবুও হাসি এল।

নেতা বললেন,—"সত্যি বেশ ভালো লাগছে। না ?"

"আর বেশ রোমান্টিকও।" বললাম আমি।

"কিন্তু আমরা চলেছি কোথায় ?"

"সেইটাই তো জানবার কথা।"

"সুন্দরবনে ছেড়ে দেবে না তো ?"

"জায়গাটা ভালো।" আবার হাসি।

একটি লোকের ছায়া দেখতে পেলাম। কেবিনের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মাথাটা বের করে দিয়েছে। বেশ মোটা-সোটা লোকটি। গায়ের কালো গেঞ্জি ঠেলে পেটটা এগিয়ে গেছে সামনে। গেঞ্জির রং কালো নয়, ময়লায় কালো হয়ে গেছে। পরণে চেক লুঙ্গী।

আমি এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম ওকে,—"সাহেব, জাহাজ চলেছে কোথায় ?"

"সে কী! না জেনেই জাহাজে উঠেছেন ?"

"আরে জানবার অবকাশ পেলাম কোথায় ?"

"সে কী !"

"হ্যাঁ তো। জোর করে উঠিয়ে দিলো যে !"

"জোর করে উঠিয়ে দিলো !" বিস্ময়ে ও হালকা হয়ে উঠল। সঙ্কোচ কেটে গেল। এগিয়ে এল ডেকে। বলল,—"আপনারাই তাহলে সুভাষ বোস ?"

"হ্যাঁগো আমরাই সুভাষ বোস।" হাসি চেপে বললাম আবার,—"তাহলে আমরা যাচ্ছি—"

"চাঁদপুর।"

আব্দুলের ঘরে এসে বসলাম। আসবার আগে আব্দুল নেতার দিকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। নত হয়ে সেলাম জানাল। মুখে বলল,—

"ইন্‌সায়াল্লা।"

আব্দুল বলে চলেছিল তার ঘরের কথা। নোয়াখালি জেলায় ওর বাড়ী। পনের বছরের ওপর তার জাহাজের চাকুরি। স্ত্রী মারা গেছে। ঘরে আছে একটি মাত্র ছেলে, আর তার বুড়ি মা। মনসুর আর আম্মাজান।

ছেলের কথা বলতে ওর গলা ভারী হয়ে ওঠে। একরত্তি ছেলে, তার দাপট কতো। বাড়ীতেই একটা কাঠের চেলায় দড়ি বেঁধে জাহাজ বানিয়েছে। টেনে টেনে বাড়ীময় ছুটে বেড়ায়। সুর করে বলে,—বাঁও মেলে না হে-ই-ই-ই…অর্থাৎ লগি জলে থৈ পায় না।

আব্দুল স্বপ্ন দেখে। ছেলে বড় হবে। অনেক বড়। এমনি একটা জাহাজের হবে শারেং। আল্লার দোয়ায় সেদিনও যদি সে বেঁচেই থাকে, মনসুরের কাছেই সে থাকবে। জাহাজেই। কতো ভালো ভালো রান্না সে জানে। তার হাতের মুরগীর রোষ্ট আর কারী খেয়ে কতো সাহেব-শুবো কতো তারিফ করেছে। ফিরিস্তি দিয়ে চলে আব্দুল। আর তার হাতের পাঙাশ মাছের ছালুন। জিবটাও ছোক্ ছোক্ করে। টেনে নেয় ভেতরে জিভের জল। বলে,—"বাপ-বেটায় বেশ থাকা যাবে, না সাহেব?"

"আব্দুল, কিছু খাবার দিতে হবে যে।" গল্পে গল্পে আব্দুলের মন সরস হয়ে উঠেছে। সময় বুঝে বললাম,—"সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি।"

কত্ কত্ করে উঠল আব্দুল। বলল,—"ই আল্লা! খেয়ালই ছিল না হুজুর। কিন্তু—"অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকায় আব্দুল। আম্‌তা আম্‌তা করে বলে,—"এ জাহাজে খাবার কিছু থাকে না হুজুর। কেউ খায় না তাই।" বলেই আব্দুল উঠে পড়ে। ওর কাবার্ড অর্থাৎ একটা কেরোসিন কাঠের আলমারি খুলে খুঁজতে থাকে খাবার। ফিরে এসে বলে,—"আধখানা রুটি আছে আর একটু মাখন।"

"চমৎকার হবে আব্দুল। রুটি, মাখন আর চা। তুমি কিন্তু দেরি করো না।" বলেই অমি উঠে পড়লাম।

ঘরে এসে দেখি নেতা টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখছেন। আমাকে দেখেই মুখ তুলে বললেন,—"বাথ-টবে জল আছে। স্নানটা সেরে ফেলো।"

লক্ষ্য করে দেখলাম, ওঁর স্নান হয়ে গেছে। গায়ে উঠেছে সেই সারা দিনের ঘামে ভেজা ধূলি-মলিন পাঞ্জাবী আর পরণে সেই বাসি কাপড়। আমি বললাম,—"রুটি মাখন আর চা আসছে।"

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ। আব্দুলের হাত যশ আর আমাদের বরাত।" আবার দুজনেই হেসে উঠলাম।

আব্দুল খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। দুখানা প্লেটে দুপিস করে রুটি, একটা পিরিচে খানিকটা মাখন, আর একটায় দুটো কলা। টেবলে সব নামিয়ে দিয়ে আব্দুল বেরিয়ে গেল। সবে একটা কলা হাতে নিয়েছি, আব্দুল ফিরে এল। হাতে তার চাএর পট ও কাপ সুদ্ধ ট্রে, পাশে দুটো পিরিচে ডিম ভাজা। আশার অতিরিক্ত। নেতা বলে উঠলেন,—"এযে ফিষ্ট্এর আয়োজন করেছো আব্দুল !" আব্দুলের মুখের দিকে চাইলাম। প্রকাশ-ক্ষমতাহীন বোবা কৃতজ্ঞতা, বিনয় আর, আর বোধ হয় একটুখানি গর্বের সংমিশ্রণে সে-মুখ হয়ে উঠেছে সুন্দর। দাড়ি আর গোঁফের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দুখানা পুরু ওষ্ঠের জোড় খুলে গেছে। সামনের বড় বড় ঝকঝকে দাঁত দুটি বেরিয়ে পড়েছে। চোখের দুটি কোন্ ঈষৎ কোঁচকানো।

সামনে,—অনেক দূরে দেখা যায় আলোর ঝলমলানি। সন্ধানী আলো গিয়ে পড়ে পাড়ির ওপর। ভাঙ্গা পাড়ি। পাড়ির ধারে ধারে ধ্বসে-পড়া গাছ, ঘর, ফসলের ক্ষেত। তাকিয়েছিলাম। পেছন থেকে আব্দুল বলে উঠল,—"ই আল্লা, কতো আলো।" জিজ্ঞেস করলাম,—"ওটা কী আব্দুল ?"

"ঐতো চাঁদপুর ঘাট। রোজ থাকে টেমির আলো। আজ আলোর বাহার। হুজুর, ওরা জানতে পেরেছে।"

"কী জানতে পেরেছে আব্দুল?"

"সুভাষ বোস জাহাজে আসছেন।"

"কিন্তু জানলো কেমন করে ওরা?"

"সূয্যি উঠলে সবাই জানে। অন্ধেও।" হাসি উপছে পড়ে আব্দুলের মোটা ঠোঁট বেয়ে।

অনেকটা রাত। নদীর জল নীচে নেমে গেছে। পাঁচ সাতটা ডেলাইট বাঁশের মাথায় লটকানো। আলোয় ভরে গেছে তটভূমি। উত্তাল জন সমুদ্র ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। চাঁপ বাঁধা।

নেমে এলাম আমরা। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল আব্দুল। নামবার সময় কী যেন বলতে চাইল। পারল না। ওর হাতে গুঁজে দিলাম পাঁচ টাকার একখানা নোট। প্রথমটা ও খেয়াল করেনি। সিঁড়ি ওঠাবার সময় ও চেঁচিয়ে উঠল। ডেকে উঠল,—হুজুর···হুজুর ···জনতার কোলাহলে গলা ওর ডুবে গেল। ষ্টিমার চলতে লাগল। আব্দুল তখনও দাঁড়িয়ে। ওর প্রসারিত ডান হাতে নোটখানা।

একখানা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে নেতা বলে চলেছেন। কণ্ঠে বিদ্রোহের বাণী। গায়ে তার বহ্নি-শিখা।

আকাশের দিকে চেয়ে ছিলাম। সম্মুখে কালপুরুষ আকাশের কালো বুকে। অশরীরী এক বিশেষ ইঙ্গিত ফুটে ওঠে চোখের ওপর। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত। হাতে খড়্গ না?

চাঁদপুর থেকে কুমিল্লা। গেলাম পরদিন সকাল বেলা। অনেক রাতে শুতে হয়েছিল। ঘুম ভাঙ্গতে তাই বেলা হল। ভাঙ্গত না। ভাঙ্গল মানুষের কলগুঞ্জনে। এসেছেন অনেকে। কামিনী দত্ত, আস্রাফ উদ্দীন চৌধুরী, বসন্ত মজুমদার, আরও অনেকে। এ যেন আশাতীত প্রাপ্তির অসামান্য আকস্মিকতা। সবাই অভিভূত। ইংরেজের

মূঢ়, রূঢ় ও সঙ্কোচহীন অবিচারের গ্লানি ভুলে গেল সবাই। ঢাকায় যাওয়া হল না। সবাই ওখানে আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তারা নিরাশ হল। কিন্তু এমনটি না হলে এখানকার এরা এমনভাবে নেতাকে পেত না। এদের প্রাপ্তির আনন্দে ওদের বঞ্চনার দুঃখ ডুবে গেল। সদলবলে আমরা চললাম কুমিল্লা।

কুমিল্লা। কামিনীবাবুর গৃহ। কামিনীবাবু ছিলেন সুভাষ গোষ্ঠীর একজন অন্তরঙ্গ সভ্য। এই শালপ্রাংশু মহাভুজ মানুষটির অন্তর ছিল যেমন শুভ্র কোমল, পৌরুষ ছিল তেমনি নির্ভীতিতে ভরা। মার্জিত ক্ষুরধার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ললাট দীপ্ত। নাকটা একটু খর্ব। সুদৃঢ় প্রশস্ত চোয়াল। আনন্দ আর একান্ত তৃপ্তি দেখা যেত ওঁর মুখে আর চোখে।

কর্মীরা পূর্বেই সমাগত হয়েছিল কামিনীবাবুর গৃহে। পৌঁছেই শুরু হল আলোচনা। ফরাস-ঢালা কামিনীবাবুর একখানা বড় বসবার ঘর জম্‌জমাট। প্রশ্ন উঠল করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে। আলোচনা হল বর্তমান সমস্যার কথা। প্যাক্টের কথা। ভগৎ সিংএর ফাঁসির কথা। আরও কতো কথা।

সত্যাগ্রহের কথা বিশ্লেষণ করছিলেন নেতা। গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। সত্যাগ্রহ নীতির ওটা অঙ্গ। অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। কান টানলেই যেমন মাথা আসে তেমনি। সত্যাগ্রহের মৌল নীতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে প্রতিপক্ষের ওপর বিশ্বাস। তার সততা, তার মানবিকতা, তার মহানুভবতার ওপর বিশ্বাস। চরম ত্যাগ, দুঃখ বরণ আর নিজেকে ঐ নীতির বেদীমূলে উৎসর্গ করে প্রতিপক্ষের অন্তরের কোণে স্থান করে নিতে হবে। দয়া আর করুণা, দাক্ষিণ্য আর বদান্যতায় একদিন-না-একদিন ওর অন্তর ভিজে উঠবেই। সেই সিক্ত অন্তরের মহাদানে পরিপূর্ণ করে দেবে ব্রত-ভিক্ষার ঝুলি।

স্বাধিকারের প্রশ্ন এর ভেতর নেই। জাতির আকাঙ্ক্ষা, তার

আকুতি, তার ঐতিহাসিক চাওয়ার সব জিজ্ঞাসা নিস্তব্ধ করে দিয়ে অনন্তকাল ভিক্ষুকের প্রত্যাশা নিয়ে পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে হবে। সেই প্রত্যাশার নামই নাকি বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতবর্ষ টিকে আছে!

"এর ব্যতিক্রম হলে চলবে না। আর কোন পথে দেশ স্বাধীন হলে সে-স্বাধীনতা গান্ধীজি স্বীকার করে নেবেন না।" ছেদ টানলেন নেতা।

গর্জে উঠলেন বসন্তদা। বসন্ত মজুমদার। বললেন,—"অনন্তকাল পাঁঠা খাঁড়ার কোপ খেয়ে আসছে মানুষের কাছে। কই, মানুষের হৃদয় তো গললো না। ইংরেজেরও গলবে না।"

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। কথাটার জন্যে নয়, বসন্তদার বলবার ভঙ্গী দেখে। চিরদিনই বসন্তদা চেঁচিয়ে কথা বলতেন। বক্তৃতা করতেন আরও চেঁচিয়ে। ফলে গলাটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল। রক্তাধিক্যের চাপও ছিল। কথা বলতে গেলেই সারা মুখখানা টুকটুকে হয়ে উঠত। গলার দুপাশের রগ উঠত ফুলে। চোখ রাঙ্গা। কথা বলবার আগে নাকটা কুঁচকে ঘোঁৎ করে নিঃশেষ ছাড়া ছিল ওঁর অভ্যেস। কিন্তু বসন্তদার অন্তরটি ছিল শিশুর মতো সরল। সহধর্মিনী হেমপ্রভা দেবীকে সঙ্গী করে জীবনের অনেকগুলি দিনই কাটিয়ে দিয়েছিলেন দেশের সেবায়। যুগলে দেশবন্ধুর নেতৃত্ব অঙ্গীকার করে বার বার কারাবরণ করেছেন, দারিদ্র্যের কশাঘাতে দৃক্পাত করেন নি। প্রলোভনে বিসর্জন দেন নি আদর্শ। দেশবন্ধুর পর তাঁর শূন্য আসন সুভাষচন্দ্রকে দেবার জন্যে যেমন কোনও সুপারিশের প্রয়োজন হয়নি, বসন্তদার পক্ষেও সুভাষ-নেতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়াও ছিল তেমনি একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক।

একটু হেসে কামিনীবাবু বললেন,—"কিন্তু আমরা কোন্ দলে? পাঁঠার দলে যেতে আমার কিন্তু আপত্তি আছে।" উচ্চকিত হাসিতে ঘর ফেটে পড়ল।

হাসি থেমে গেলে আমি বললাম,—"কিন্তু প্যাক্টের পেছনে সংগ্রামের মোড় ঘুরিয়ে দেবার একটা মতলব উঁকি দেয় নাকি ?"

"এইটেই ভাবতে হবে।" বলে চললেন নেতা।

ইংরেজ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই ব্যক্তিটি যেমন করে বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের আর কোনও নেতা কোনদিনই ঠিক তেমন করে বোঝেননি। বুঝেছিলেন বলেই প্রতিপক্ষ ইংরেজকে কোনওদিন ছোট করে দেখেন নি। ইংরেজ কৌশলী, ইংরেজ ধাপ্পাবাজ, ইংরেজ হিসেবী, সর্বোপরি ইংরেজ চরম স্বার্থপর,—একথা শুধু তিনি জানতেনই না, মনেও রাখতেন।

প্রথম যুদ্ধের পর নিশ্চিন্তমনে ফরাসী শক্তি সংগ্রহ করছিল। যুদ্ধে জেতবার গৌরব অর্জন করেছিল ইংরেজ, কিন্তু সম্পদ নয়। সম্পদে ফ্রান্স এগিয়ে গেল। ইংরেজের সাম্রাজ্যে ধরল ভাঙ্গন। আয়র্লণ্ড ওর আঁওতা থেকে বেরিয়ে গেল। ভারতবর্ষে আর ইজিপ্টে লাগল দোলা। এদুটো গেলে তার লুণ্ঠনের স্থান থাকল কোথায় ? পূর্ব-ইউরোপে তার খানিকটা প্রতিপত্তি বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু 'ছোট আঁতাত' তার চাইতে ফরাসীকে একটু বেশি তোয়াজ করছে না ?

জার্মানদের সে পছন্দ করে না। হিটলারকেও না। ওরা বড্ড বেশি কাঠখোট্টা আর গোঁয়ার। মার যখন দেয় বেধড়ক মার দেয়। এ সবই সত্যি। কিন্তু ঐ-যে ইউরোপের পূব-ঘেঁষা ভালুকটা, সেও-তো নিতান্ত খোয়াব নয়। ইউরোপ ছাড়িয়ে ওর দাঁত খিঁচুনি আর চাপা গর্জন ইউরোপের তটেও আঘাত করছে। একদিকে ঐ ভালুক অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান ফরাসী। তাকে অতিক্রম করে যে-কোনটাই মাথা তুলে দাঁড়াক, সে সইবে কেমন করে ?

প্রতিষেধক তাকে খুঁজে বের করতে হল। সৃষ্টি করতে হল। প্রতিষেধক হল হিটলার। তাকে ইংরেজ রসদ জুগিয়ে ভরসা দিয়ে নানা ভেল খেলিয়ে দাঁড় করাল। এই হিটলার থাকবে ফ্রান্স আর রাশিয়ার মাঝপথে। সময় বুঝে একটার দিকে ওকে লেলিয়ে দিলেই ব্যস।

যুদ্ধে জিতেও অনেক ক্ষেত্রে সে হেরেছে। আমেরিকার ঐ বোকা প্রফেসারটা তাকে কী ফ্যাসাদেই-না ফেলেছে। উইল্‌সনের চৌদ্দ ছেড়ে চব্বিশ পয়েন্টেও তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটার ঠেলাতেই সে অস্থির। ছোট বড় সব জাতিরই নাকি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। বললেই হল!

হ্যাঁ, মধ্য প্রাচ্যে তার খানিকটা সুবিধে হয়েছে তুরস্ককে টুকরো করে। তারই কূট বুদ্ধি সৃষ্টি করেছে আরব স্বাতন্ত্র্য। যার ফলে ইরাক, সৌদি আরেবিয়া, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, ইয়েমিন। মশুল আর আবাদান তার বেঁচে থাক, থাক টিকে কুয়েট আর বাহ্‌রিন। অনেক ক্ষয় আর ক্ষতি সে সামলে নেবে।

সামলে সে অনেকটা নিয়েওছে। কিন্তু ফ্যাসাদ সৃষ্টি করল ভারতবর্ষ। এই সময়ে তার ঐ সত্যাগ্রহ সে পছন্দ করে না। সত্যাগ্রহ নয়, ওর পরিণতি তাকে ভাবিত করে তুলেছে। মানুষের মনে একবার যদি স্বাধিকার-বোধ জেগে উঠে, যদি ফিরে পায় সে হারানো সংবিৎ, যদি কাটিয়ে উঠে ভয়,—কোথায় তাকে নিয়ে যাবে এই সর্বনাশা চেতনা কে বলবে?

যুদ্ধে তাকে হয়তো আবার নামতে হবে। তার আগেই এ হাঙ্গামা মেটাতে হবে। পাদ্রীর গন্ধ আছে আরউইনের গায়ে। গান্ধী ওঁকে পছন্দ করবেন।

করলেনও তাই। হল প্যাক্ট। তারপর গোলটেবল। একবার গান্ধীকে ঐ চড়ক ধাঁধাঁয় টেনে আনতে পারলে হয়। থৈ তখন বিশ বাঁওএর তলায়। কত ধানে কত চাল, গান্ধী তা জানেন না।

মাজা ছক। ইংরেজ এগিয়ে চলে।

কিন্তু ভারতবর্ষ? সত্যি কি সে এ ফাঁদে পা দেবে?

ভকৎ সিং ঝুলছে ফাঁসির দড়িতে। চট্টগ্রাম রক্তক্ষয়ে হতচেতন। পাদ্রী আরউইন করেন প্যাক্ট, ইংরেজের প্রতিনিধি আরউইন ঝোলান ফাঁসির দড়িতে।

"একটা বেজে গেছে।" জোড় হাতে বললেন কামিনীবাবু। খেয়াল হল সকলের। বসন্তদা ওঠবার মুহূর্তে বলে উঠলেন,—"আপোষ আমরা করমু না, ব্যস।"

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা গেলাম অভয় আশ্রমে। ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি সেখানে ছিলেন। রোগে শয্যাশায়ী। প্যারিস প্লাষ্টারে দেহ মুড়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন। সুরেশবাবু ও আশ্রমের অনেকের সঙ্গে নেতার শুধু রাজনৈতিক মতভেদই ছিল না, ছিল জীবন-দর্শনের পার্থক্য। বাল্যকাল থেকেই পরিচয় ছিল। এবং সে পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। নেতার জীবনের প্রারম্ভিক চেতনা ও প্রেরণা সুরেশবাবুদের সাহচর্যে লালিত হয়েছিল। কিন্তু সুভাষ-জীবনের ব্যক্তি তখনও ছিল ঘুমে অবচেতন। যেদিন সে জাগল, পেছনে ফেলে আসা দিনগুলির ন্যায় সেদিনের বান্ধব আর সাথীদেরও অনেকেই থাকল পড়ে পেছনেই।

আমার দেশ নয়, দেশের আমি। আমার সুখ-দুঃখ, ভালো আর মন্দ, এমন কি নীতির বালাই তুচ্ছ করতে না পারলে ভালোবাসা সার্থক হতে পারল কৈ? প্রেমাস্পদের জন্যে চরম ত্যাগ কলঙ্ক বরণ করা। নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া। ডুবিয়ে দেওয়া। নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। পাপের পথে, নরকের পথে গেলে যদি বুঝি দেশের কল্যাণ হবে, তাতেও পেছপাও হব না। স্বামীজির কথা। আর এই ছিল সুভাষের জীবনাদর্শ।

স্বামীজির জীবনের সঙ্গে এ-ক্ষেত্রেও তাঁর জীবনের ব্যতিক্রম ঘটে নি। নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম জীবন শুধু ব্রাহ্ম সমাজের আঁওতায় লালিত হয়নি,—প্রভাবান্বিতও হয়েছিল। কিন্তু যেদিন নরেন্দ্রনাথ সে আঁওতা ত্যাগ করে প্রকাশ পেলেন বিবেকানন্দ হয়ে, পেছনের সব কিছুই রইল পড়ে নিছক অতীত হয়েই। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় ব্রাহ্ম সমাজের কাছ থেকে সেদিন বিবেকানন্দ শুধু প্রতিরোধই পান নি,—পেয়েছিলেন আঘাত।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, সুভাষচন্দ্রের জীবনেও এই ঐতিহাসিক

পুনরাবৃত্তিই ঘটেছে। মতের মিল নেই, প্রাণের বন্ধন নেই, আদর্শের বিচার নেই,—সেদিনের সুভাষ-বিরোধী ঐক্য গড়ে উঠেছিল নিছক ব্যক্তিগত প্রশ্নে, অসূয়া আর ঈর্ষার চাপে। নইলে গান্ধী-পন্থী খাদি-গোষ্ঠী, কম্যুনিষ্ট আর সন্ত্রাসবাদীরা এক হল কেমন করে ?

কিন্তু বিরোধের সূত্রগুলিই কি জীবন পথের সম্বল ? তার ঊর্ধ্বে তাকে অতিক্রম করে যাত্রা-পথে চলা একান্তই কি অসম্ভব ? অভয় আশ্রমের পথে নেতা বললেন,—"সুরেশদা একটু আশ্চর্য হবেন, তাই না ?"

"হয়তো হবেন।" বললাম আমি।

"দেখ, চলার পথের পাঁচিলকে অস্বীকার করতে না পারলে চলাটাই হয়ে যায় ব্যর্থ। সামনের পাঁচিল, তা যতো বড়ই হোক, তার ও-পারে রয়েছে আরও বড় জগৎ। একথাটা ভুলেই-না আমরা অশান্তি সৃষ্টি করি।"

নেতার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। পাশ কাটিয়ে আমি বললাম,—"কিন্তু যদি কেউ সেই পাঁচিলটাকেই সত্য আর সনাতন বলে ধরে নেয়।"

"নেয়ই তো। না নিলে এতো অনর্থই-বা দেখা দেবে কেন ?"

গাড়ী পৌঁছে গেল আশ্রম দ্বারে।

ওখান থেকেই সটান আমরা গেলাম মহেশ প্রাঙ্গণে। জন সভায়। প্রবীণ নেতা হরদয়াল নাগ সভাপতি হয়েছিলেন।

সভাশেষে আসতে আসতে নেতা বললেন,—"হরদয়ালবাবু জানেন না। জানলে তোমাকে আগে বলতে দিতেন না।"

আমি হাসছিলাম।

"হেসো -না।" ভ্রূদুটো একটু কুঁচকে নেতা বলে উঠলেন,—"আচ্ছা, ভাষার অমন তুবড়ি ছোটানো শিখলে কোথায় ?"

পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেল। ঢাকা যেতে না পারার ক্ষতি উশুল

হয়ে গেছে। চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া,—কতোদিনে আসা হত, হত কিনা, কে জানে। মওকা মিলে গেল। বন্ধু-বান্ধব তো বটেই,—কর্মীরা এইভাবে নেতাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। তাছাড়া জনসাধারণ : এতো সহজে এমন মানুষের দেখা পাওয়া, ওরা মনে করে, ভাগ্যের কথা।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া যাবার পথে নেতা বললেন,—"পূর্ববাংলাই যেন সত্যিকারের বাংলা। এখানকার নদী, শস্য-ভরা মাঠ আর এই প্রাণ-খোলা মানুষ।"

"আরও আছে।" বললাম আমি।

"কী ?"

"এখানকার ম্যালেরিয়া, মোকদ্দমা, কলেরা, বসন্ত—"

"আমি জানি। তবু কি জানো, এদের প্রাণ সম্পদ। বড় বড় নদীর ধারে এদের বাস কিনা, তাই প্রাণটাও দরওয়াজ।"

"কিন্তু গঙ্গাতীর ছাড়া বড় মানুষ জন্মায় না।"

"মানে ?"

"রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ সবাই গঙ্গাতীরের।"

"ভুল হলো তোমার। বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু,—এঁরা ?"

"ভুলিনি। ওঁরাও গঙ্গাতীরেরই। বারীনদা সমুদ্রের বুকে জন্মে ইউরোপিয়ান হন নি।"

"না হোক। দুচারজন বড়লোক এদের নাই-বা থাকলো। ওঁরাও একধরনের ক্যাপিটালিষ্ট। সাধারণ মানুষ পূর্ববাংলার মতো মেলে না। এতো সরল আর দিলখোলা।"

"কথাগুলো শুনে আমার কিন্তু ভালো লাগছে।"

"কেননা তুমিও এখানকার। এই তো ?" দুজনেই হেসে উঠলাম।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঝিমোতে লাগলেন নেতা। কী অসহ্য ধকল গেছে দেহের ওপর দিয়ে। সেই একই কাপড় পরণে।

জামাও তাই। মাথার টুপিটা খুলে রেখেছেন পাশে। কেশহীন শুভ্র টাক। চকচক্ করছে। বিছানা সঙ্গে নেই। ন্যাড়া গদীর ওপর ঢলে পড়লেন নেতা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে অচেতন।

মসৃণ সুপ্রশস্ত ললাটে পড়েছে কুঞ্চনের চিহ্ন। দুশ্চিন্তার চিহ্ন। কিন্তু তার সঙ্গে নিজের ভালো-মন্দের কোনও সম্পর্ক নেই। নিজের বলতে কি সত্যিই ওঁর কিছু আছে? চোখে পড়েনি।

সকাল আটটার মধ্যে নিজের বলতে যে-টুকু কাজ, সাঙ্গ হয়ে যায়। স্নান, কামানো, চা খাওয়া। তারপরই দৈনন্দিন কাজ। একটানা। অবিশ্রান্ত। অগুণ্তি লোকের সঙ্গে দেখা করা। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা। কর্পোরেশন, এ্যাসেম্ব্লী, কংগ্রেস। ছাত্র আর যুবসঙ্ঘ, শ্রমিক আর কৃষক সংস্থা, নারী-সমিতি আর সংবাদপত্র। বাঁধাধরা কোনও সেক্রেটারী কখনও রাখেন নি। সবই করতেন নিজে। আমরা যে যখন পারতাম সাহায্য করতাম। চিঠি আসত অসংখ্য। জবাব দিতে প্রাণান্ত।

ব্রাহ্মণবেড়িয়ার কাছাকাছি। নেতা উঠে বসলেন। চশমাটা মুছে নিয়ে বাইরে তাকালেন। নরম মিষ্টি রোদে চারদিক ঝল্‌মলে। পাকা সোনালি ধান-ভরা দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তারই ওপারে নীল-রেখা। দিক্‌চক্রবালের প্রত্যন্ত। চোখ ফিরিয়ে বললেন,—"ইংরেজ সবই নিয়ে গেছে। নিঃশেষ করে নিয়েছে। নিতে পারেনি শুধু এই মিষ্টি রোদ, নীল আকাশ আর জাতির ভবিষ্যৎ।"

তাকিয়েই থাকলাম ওঁর মুখের দিকে। প্রশান্ত মুখে ফুটে উঠেছে নিবিড় প্রসন্নতা। স্নিগ্ধ। গম্ভীর। মনের ভেতর আঁকুপাকু করছিল একটা কথা। ইংরেজ সবই নিয়েছে সত্যি কথা। কিন্তু আলো-আকাশ-ভবিষ্যৎ ছাড়াও আর একটি জিনিষও নিতে পারেনি। তোমার মতো মানুষ।

নিজেই বলতে লাগলেন,—"দেড়শো বছরের মধ্যে দেশটাকে কী করে দিল। আর এই দেশকে,—মেগাস্থিনিস ওদেরই ইউরোপের লোক—সে এসে দেখলো, এদেশে চোর নেই, বিশ্বাসঘাতক নেই।"

"আর তিনিও এসেছিলেন আড়াই-হাজার বছর আগে।" বললাম আমি।

"হ্যাঁ, কতো বড় সভ্যতা থাকলে একটা দেশ এমন হয়।" একটু থামলেন। আবার বললেন,—"কিন্তু ওরাও দুর্ভাগা।"

"কেন?"

"ভারতবর্ষ থেকে ওরাও ভালো-কিছু নিতে পারলো না। দেড়শো বছর থেকেও।"

"কিন্তু দিয়ে যাবে অনেক-কিছু।"

"হ্যাঁ। সে বোঝা বইতে হবে ওদের যাবার পরও। অনেকদিন ধরে।"

ব্রাহ্মণবেড়িয়া পৌঁছে মধ্যাহ্ন ভোজন করতেই বেলা বেজে গেল তিনটে। বেশিক্ষণ বসবার উপায় নেই। বিছানায় গড়াচ্ছিলেন নেতা। ভাবলাম আমিও একটু গড়িয়ে নেব। হল না। হাতের কাছেই ছিল গ্লাড্‌ষ্টোন ব্যাগটা। আগে একবার দেখেছি ওর ভেতরটা। মনটা খুৎখুৎ করছিল, ঢেলে ফেললাম উপুড় করে। বেরিয়ে পড়ল এক অপরূপ বস্তু। রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা। হকচকিয়ে গেলাম। ব্যাগটা বদল হয়নি তো? কিন্তু আর সবই তো আছে। বদল হলে এ-সব আসবে কোত্থেকে? বদল না হলেই-বা ঐ পরম বস্তুটি এ-ব্যাগে স্থান করে নিল কোন্ ফাঁকে? ভাববার কথা!

আর একবার গতজীবনের কথা ভেসে উঠল মনে। হিমালয়··· কাশী···বৃন্দাবন···সবই তো হয়ে গেছে! আবার কি জাগল সেই দূর কৈশোরের নেশা? মালাছড়া হাতে নিয়ে ওঁর সামনে যেয়ে দাঁড়ালাম। দক্ষিণ করতল প্রসারিত করে দিলাম। খুব গম্ভীর হয়ে বললাম,—"এটা কী?"

বললেন,—"ওটা কোথায় ছিল?"

"প্রশ্ন আমার তা নয়। এটা কী?"

"কেন, মালা।"

"না।"

"তবে ?"

"জপের মালা।"

প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন।

পাঁচটায় জনসভা। জনতার কলরোল কানে ভেসে আসছিল।

কাতারবন্দী জনতার ভেতর দিয়ে সভায় গেলাম।

নেতা বলে চলেছেন,—"এদেশ হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও নয়। এদেশ ভারতবাসীর। এদেশকে যে নিজের দেশ বলে ভাববে এদেশ তার। এদেশের কল্যাণ দেখে যার মন আনন্দে ভরে উঠবে এদেশ তার। এদেশের দুঃখে কাঁদবে যে এদেশ তার। সেই দুঃখ দূর করতে যে দুঃখ নেবে বরণ করে এদেশ তার। আর তার এবং তাদের এদেশ যে এবং যারা এদেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়েছে আর ভবিষ্যতেও দেবে।"……

শুচি-শুভ্র অন্তরের অন্তস্তল থেকে মহাসত্যের নির্মল আর ভাব-সুন্দর আলো গলে গলে নেমে আসছে মাটির পৃথিবীতে। শুধু আলো নয়, গন্ধও। প্রেমের গন্ধ।

ঢাকায় যেতেই হবে। অমনি যেতে না দেয়, জেলে নিয়ে যাবে। সেও তো ঢাকা। কিন্তু চোখ রাঙ্গিয়ে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা চলবে না। কুমিল্লার আলোচনা-বৈঠকে স্থির হয়েছিল পরিকল্পনা। নদী-পথে ওরা যেতে দেয়নি। এবার স্থল পথে। ট্রেনে।

ট্রেনে চেপেই নেতা বললেন,—"কাছাকাছি যেয়ে তুমি আরেকটা কামরায় উঠবে। একসঙ্গে দুজনের ধরা দেওয়া হবে না। দুবারে।"

"কিন্তু আমাকে পরে না ধরতেও তো পারে।" বললাম আমি।

"তাও সম্ভব।" একটু ভাবলেন। পরক্ষণেই বলে উঠলেন,—"তা যদি হয়, ভালোই হবে। আমাকে ধরলে চাঞ্চল্য একটা দেখা দেবেই। তার সদ্ব্যবহার করবে তুমি।" অর্থাৎ এই উপলক্ষে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা।

ঢাকার সীমানা এসে গেল। আর একটা স্টেশনের পর তেজগাঁ। এ স্টেশনে কোন আয়োজন নেই। তবে কি আসবে না? ঢুকতে দেবে ঢাকায়? বিনা বাধায়? নেতা বললেন,—"এইবার তুমি পাশের কামরায় যাও। হ্যাঁ, ব্যাগটা নিয়েই যাও।"

মনের কোণে উনি জানতে পেরেছেন যে ওরা আসবে। ওঁকে তুচ্ছ করবার স্পর্ধা ইংরেজের নেই। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললাম,—"ওটা নিতে হবে বৈকি। ওর ভেতরকার সেই দুর্লভ বস্তুটি ওদের হাতে পড়লে, কী জানি, ওরা কাজে লাগিয়ে দিতে পারে।"

এক ফালি হাসি ফুটে উঠল নেতার মুখে। নিঃশব্দ হাসি। আমি নেমে গেলাম।

তেজগাঁ পৌঁছোবার আগেই মাঝ পথে গাড়ী থেমে গেল। গাড়ী থেকে নেমেই দেখি একটু দূরে একখানা মোটরকার দাঁড়িয়ে। পনের-কুড়িটা লাল পাগড়ী আর কয়েকটা খাকি-পরা পুলিশ। সঙ্গে একজন ইংরেজ। ভিড় জমে গেছে নেতার গাড়ীর সামনে। একটু বাদেই নেমে এলেন নেতা। দৃষ্টি বিনিময় হল।

মোটরে উঠতেই মোটর চালিয়ে দিল। অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে দেখা করবার অনুমতি পেলাম। পরদিন গেলাম অবিনাশকে সঙ্গে করে। সঙ্গে নিয়ে গেলাম সাবান, তোয়ালে, গ্লাড্‌ষ্টোন ব্যাগটা, বিছানা, স্যুটকেস আর কিছু খাবার। পথে কিনে নিলাম এক গোছা রজনীগন্ধা। ওঁর প্রিয় ফুল।

যথাস্থানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দূর থেকে দেখলাম, নেতা আসছেন। ঘরের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়ালেন। সাক্ষাতের স্থানটা লোহার জাল দিয়ে ঘেরা ছিল। নেতা বললেন পাশের সার্জেন্টকে,—"ঐ জাল না সরালে আমি কারও সঙ্গে দেখা করব না।"

সার্জেন্ট বলল—"কিন্তু ওটা সরাবার এক্তিয়ার তো আমার নেই।"

"তা হলে আমি ফিরেই চললুম।"

নেতা ফিরে গেলেন।

জেল গেটে জিনিষগুলো জমা দিয়ে এলাম।

তিন দিনের চেষ্টায় জামিন মঞ্জুর হল। মোহিনীবাবুর গৃহে নেতার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ডাঃ মোহিনী দাশ। চাঁদসীর ডাক্তার। সেদিনকার ঢাকার নাম-করা লোক। দেশবন্ধুর একান্ত অনুগত ভক্ত, সেই সূত্রে সুভাষ-গোষ্ঠীর আপনজন।

দুপুরবেলা জেল থেকে নিয়ে এলাম। প্রথমেই উকিলরা নিয়ে গেলেন বার লাইব্রেরীতে। সেখান থেকে মোহিনীবাবুর গৃহে।

এসেই দেখি কলকাতার টেলিগ্রাম। রাজদ্রোহের অভিযোগে তখন তিনটে মোকদ্দমা আমার নামে ঝুলছিল। ব্যারিষ্টার বি, সি, চাটার্জি তার করেছেন উপস্থিত হতে। তার দেখে নেতা বলে উঠলেন,—"কালই রওনা হতে হবে। কিন্তু আমাকে তো এ-কথা বলোনি।"

"মনে ছিল না। তা ছাড়া আমি যাবও না।"

"সে কি হয়। অনেক টাকার জামিন যে। ফ্যাসাদ বাধাবে ওরা।"

উত্তর দেবার অবকাশ হল না। ঘরে ঢুকল এক দঙ্গল লোক। অনেক রাত পর্যন্ত চলল আলোচনা। হল পরামর্শ। ঢাকার পরিস্থিতির বিশ্লেষণ।

সবাই বেশ ঘাবড়ে গেছে। ইংরেজের নিরঙ্কুশ অত্যাচারের পীত-চাবুক বেশ খানিকটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। মনে-প্রাণে সবাই চাইছিল তাই এমন একজনকে যিনি তাঁর দুর্লভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারেন ইংরেজের পাশবিক ঔদ্ধত্যের সামনে।

কিন্তু সমস্যাও একটা ছিল। ঢাকার সমস্যা। বহুকাল থেকে ঢাকা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার লীলাভূমি। ইংরেজ একে শুধু লালনই করেনি ; সৃষ্টি করেছে। যখনি জাতীয়তার সবল অনুভূতি জাতির

বুকে দানা বাঁধতে চেয়েছে, ইংরেজ তার এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছে। ঢাকার নবাব ওর হাতের মস্ত হাতিয়ার। ঐ নবাবী তক্‌ত্‌কে কেন্দ্র করে যে পাপ-চক্র সৃষ্টি করেছে ইংরেজ, একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাধারণ মানুষ সেই চাকার পাকে জড়িয়ে যায়। কারণ-অকারণে ক্ষেপে ওঠে। টুঁটি কামড়ে ধরে পরস্পরের।

এই একটি লোক যাকে দুই সম্প্রদায়ের লোক শুধু শ্রদ্ধা করে না, ভালোও বাসে। প্রত্যক্ষ করে এলাম চাঁদপুরে, কুমিল্লায়, ব্রাহ্মণ-বেড়িয়ায়। আর দেখছি ঢাকায়। কিছুদিন আগেও হিন্দু-মুসলমানে লড়াই করেছে। দুই দলের লোকই আবার এসেছে নেতার কাছে। এ ভালোবাসা ইংরেজ সইতে পারে না। মনে করে, সুভাষ বোসকে ভালোবাসা আর ইংরেজকে ঘৃণা করা একই। একটা যেন আরেকটার প্রতিক্রিয়া।

জনসভার কথা উঠতেই তাই আমি বললাম,—"কিন্তু একটা-কিছু আবার ঘটবে না তো।"

"সে সম্ভাবনা তো রইলই। কিন্তু সমস্যা পরিহার করে কি তার সমাধান সম্ভব ?" নেতার কথায় সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

সম্ভব যে নয়, তা আমিও জানি। এবং একদিন এ-সমস্যার মুখো-মুখী দাঁড়াতে হবে, তাও আমার অজানা নয়। তবু মনে ভয় জাগছিল। জাগছিল এই ভেবে যে, আমি কাছে থাকতে পারব না। প্রত্যুষেই আমাকে চলে যেতে হবে। অনেকে আছে ও থাকবে যারা প্রাণ দিয়েও ওঁকে আগলে রাখবে। জানি। তবু দুশ্চিন্তা এল।

গভীর রাত্রি। শুতে যাবার সময় নেতা ডাকলেন। বললেন, —"রাত্রেই সব গুছিয়ে রাখো। দুদিনের বেশি আমার দেরি হবে না।"

"কিন্তু জাজ্‌মেন্ট যদি ঐ দিনই দিয়ে দেয়।"

"চাটার্জিকে ব'লো সময় নিতে।"

"বলব।" আর কিছু বলতে পারলাম না।

সহসা আমার কাঁধের ওপর ডান হাতখানা রেখে বললেন,—

"ইংরেজ চেষ্টা করেও গোলযোগ বাধাতে পারবে না। মানুষের মন থেকে ভয় না তাড়াতে পারলে আমাদেরই ক্ষতি হবে।"

মনের ভেতর আঁকুপাঁকু করে উঠল। চোখদুটোও শুকনো থাকল না। ধরা-গলায় কোন রকমে বললাম,—"সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বেশি না বললে হয় না?"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কী অনুপম সুন্দরই-না লাগছিল সেই দৃষ্টি। বললেন,—"বলব না।"

সমস্তদিন পথে একটা কথাই বার বার মনে জাগছিল:

বিশ্ব করিলে পূজা তবু মোর মনে হয়,
আমি না করিলে পূজা, পূজা তব বাকি রয়।

সাত

রাজপুতনা। শিশোদীয় নয়, শক্তাবৎ নয়, চন্দাবৎও নয়,—কোন রাজপুতেরই নয়। একখানা জাহাজ। ইংলণ্ডগামী জাহাজ। আর ঐ জাহাজেই চলেছেন একটি মানুষ। কটি-তট-বস্ত্রাবৃত একটি মানুষ। খট-খটে হাড় বের করা দুখানা আদুল পা, গায়ে উত্তরীয়, পায়ে চটি। ভিখিরীর সাজে সম্রাট চলেছেন। অশোক আর কনিষ্কের দেশের মুকুটহীন সম্রাট। গান্ধী।

গান্ধী চলেছেন গোলটেব্‌ল্ বৈঠকে। বিলেতের বৈঠকে। আরউইন চলে গেছেন। এসেছেন ওয়েলিংডন। আরউইনের তৈরী প্যাক্ট ভাঙ্গতে ভাঙ্গতেও টিঁকে আছে। টিঁকে আছে নামে। ওরা ভাঙ্গবার চেষ্টা কম করেনি। নানা রকমে করেছে। করেছে নানা স্থানে। গোড়াতেই চিড় খেল ভগৎসিংএর ফাঁসির বেলায়। আরউইন সেদিন খোলাখুলি কথা না দিলেও আভাসে জানিয়েছিলেন যে, হয়তো ফাঁসির হুকুম রদ করা হবে। তিনি কথা রাখতে পারেন নি। হয়তো

ওপরওয়ালা বাগড়া দিয়েছে। তারপর হিজলী। তারপর,—সে অনেক। একটার পর একটা।

করাচী কংগ্রেসেই সভাপতি সর্দার প্যাটেল পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাবকে গয়ায় পাঠিয়েছিলেন। অভিভাষণে স্বায়ত্ত শাসনের গুণ-গান করেই তিনি ক্ষান্ত হননি,—পরন্তু ভারতবর্ষ যে ওটা পেলেই হৃষ্ট আর পুলকিত হয়ে উঠবে, একথাটাও বলতে ছাড়েননি। আর একথাটা শুধু সর্দার প্যাটেল নয়, গান্ধী-গোষ্ঠীর সকলেরই ছিল অন্তরের কথা।

চরমপন্থী জহরলালের দিকে ভারতবর্ষ তাকিয়েছিল ১৯২৮ পর্যন্ত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে, নবোদ্ভিন্ন যৌবনশক্তির অপরিমেয়তায়, ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতি একান্ত উদাসীনতায় সমুজ্জ্বল যে-মানুষটি দাঁড়িয়েছিল সংগ্রামমুখী জাতির পুরোভাগে, গান্ধী তাকে গ্রাস করেছেন। গ্রাস করেছেন ধীরে, সন্তর্পণে। আর তাই অবলীলায় ১৯২৯এর সভাপতির পদ পাবার পরমুহূর্তে জহরলাল সর্বদলীয় নেতাদের ঘোষণা-বার্তায় সই দিয়েছিলেন। সই দিয়েছিলেন ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের প্রস্তাব সমর্থন করে।

গান্ধী-গোষ্ঠী, মায় জহরলাল, কি প্যাক্ট, কি গোলটেব্‌ল্ বৈঠকে যোগদান,—কোনটারই বিরুদ্ধ সমালোচনা তো দূরের কথা, ও-সম্পর্কে উচ্চবাচ্যও করেন নি। অবশ্যি তা করবার কথা হয়তো ওঠেও না। পুরুষোত্তম ছাড়া আর কোন পুরুষ নেই, সবাই প্রকৃতি,—এ মতবাদ এদেশেই একদা শেকড় দাবিয়েছিল।

যে-মুহূর্তে প্যাক্টের প্রস্তাব নেতার কানে যায়, সেদিন থেকে তিনি শুধু এর কঠোর সমালোচনাই করেননি, সাধ্যমত বাধা দেবারও চেষ্টা করেছেন। 'সাব্‌ষ্টান্‌স অব্ ইন্‌ডিপেণ্ডেন্‌স্'-(স্বাধীনতার নির্যাস) নীতি নিয়ে সেদিন মহাত্মাজি মেতে উঠেছিলেন। কোন সময় 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস,' আবার কখনও-বা 'সাবষ্টান্‌স্ অব্ ইন্‌ডিপেণ্ডেন্‌স্,' মাঝে মাঝে পূর্ণ স্বরাজ,—উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্বের মহিমায় হয়তো ও-তিনটিকে একই পর্যায়ে ফেলবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি মহাত্মাজির ছিল কিন্তু দেশের

সাধারণ মানুষ? বোকা বোবা আর অন্ধের দল? দারিদ্র্য-রোগ-শোক-জর্জর মূক আর বধীর যারা? তাদের কাছে এই মহান্ তত্ত্বের কি কোন মূল্য ছিল?

তাছাড়া, এই প্রাপ্তিই যদি কাম্য, অতদূর যাবারই-বা কী প্রয়োজনীয়তা ছিল? ১৯২১ এর কথা না হয় ভোলা গেল, (১) প্রথম গোলটেব্‌ল্ বৈঠক দোষ করেছিল কোথায়? সেদিনের পরিস্থিতি এর চাইতেও সুগম ছিল আর সহজও ছিল। ছিল সম্ভাবনাপূর্ণ। বিলেতের শ্রমিক সরকার ভারতবর্ষের প্রেমে না হোক, নিজেদের কপচানো বুলির মান রাখতেই যতটা এগিয়ে আসত এবং আসতে ইচ্ছুক ছিল, এরা, পুঁজিবাদী, স্বার্থ-সর্বস্ব রক্ষণশীলরা কি তা করতে চাইবে? এদের তীক্ষ্ণ নখরের চিহ্ন আমেরিকা, আয়র্লণ্ড, চীন, আফ্রিকা,—সবাইয়েরই গায়ে রয়েছে না?

নেতা একথা ভোলেন নি। ভোলেন নি কী করে ধূর্ত ইংরেজ সহস্রবার কথা দিয়েও কথা নাকচ করতে পারে। ভোলেন নি ওর কপটতা। নিপুণ বাজিকরের মত হাত সাফাই করে কাজ হাসিল করতে ওর জোড়া নেই। অতি আধুনিক কালের এ্যাস্কুইথ আর ঐ ওয়েল্‌সের যাদুকর লয়েড্‌ জর্জ এ-খেলা খেলেছে বহুদিন। খেলেছে

(১) ১৯২১এর ঘটনা আলোচনা-প্রসঙ্গে মৌলানা আজাদ লিখছেন: (প্রিন্স-অব্‌ ওয়েল্‌স্‌এর এদেশে আসবার সময় যে আপোষের সুযোগ এসেছিল, তা হারিয়ে এবং পরে উপযাচক আপোষের প্রস্তাবে ইংরেজ কর্ণপাত না করায়) মিঃ চিত্তরঞ্জন দাশ ভয়ানক রেগে যেয়ে মত প্রকাশ করলেন যে, গান্ধীজি অপরিসীম ভুল করলেন। আমার পক্ষে মিঃ দাশের মত সমর্থন না করে উপায় ছিল না।···অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে গান্ধীজি আবারও যে বিষম ভুল করেছিলেন মিঃ দাশের তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। আর এর ফলে আমাদের কর্মীরা সকলেই খুব আশাহত ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। দীর্ঘকালেও তাদের মনোবল ও উৎসাহ ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হয়নি।

—মৌলানা আজাদ প্রণীত 'ইণ্ডিয়া উইন্‌স্‌ ফ্রীডম'—১৮ পৃঃ

আয়ার্লণ্ডের সঙ্গে। খেলেছে মধ্য প্রাচ্য আর তুরস্কের সঙ্গে। খেলেছে গোটা বলকান নিয়ে। তারপর চার্চিল। 'ন্যাংটো ফকির' বলে গান্ধীকে ওরা উপহাস যতই করুক, ওরা জানে, আজ, এইক্ষণে হয়তো তেমন বিপজ্জনক ঐ লোকটি নয়, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতের ছবি-যে ওদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠতে চায়। উত্তাল গণ-অভ্যুত্থান যেদিন পর্বত ছাপিয়ে উন্মাদ কলরোলে মাথা খাড়া করে দাঁড়াবে, সেদিন? তাই ওরা গান্ধীকে খোলাখুলি অগ্রাহ্য করে না। আর অগ্রাহ্য করে না বলেই গান্ধীকে ওরা ডেকে নিয়ে গেছে খাস বিলেতে। ওদের বৈঠকখানায়। গান্ধীকে স্বীকার করতে নয়, পাকে-চক্রে গান্ধীকে বুঝিয়ে দিতে যে, ইংরেজ অপরাজেয়। আর কূটনীতিতে ওদের কাছে গান্ধী শিশু। এছাড়াও, সবচাইতে বড় কথা : দেশে, ভারতবর্ষে, যে-একচ্ছত্র নায়কত্ব গান্ধীর ছিল একান্তই সহজ ও স্বাভাবিক, এইখানে, সভ্য-জগতের কেন্দ্রস্থল এই লণ্ডনের বৈঠকে, তার স্বীকৃতি তো নেই-ই, মূল্যও কি তেমন কিছু আছে? এই প্রসঙ্গে জহরলালের ঘনিষ্ঠ ইংরেজ-বন্ধু এড্‌ওয়ার্ড টম্‌সন্‌ জহরলালকে যে-পত্র লিখেছিলেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন,—"রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ কন্‌ফারেন্সের আগে গান্ধীর কোনও ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি। এইবার পড়ল। গান্ধী শুধু অহং-সর্বস্ব নন, তিনি অসংলগ্নও। উনি ইংলণ্ডে না এলেই ভাল করতেন।"(১) টম্‌সনের চিঠির কথা নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত কিন্তু এর পেছনে ফুটে উঠেছে গোটা ইংরেজ জাতির অভিমতের প্রতিধ্বনি। যেদিন গান্ধী তথা ভারতীয় কংগ্রেস রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ কন্‌ফারেন্সকে স্বীকার করে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করেছেন, সেইদিন ইংরেজ-কূটনীতির প্রথম জয়-পর্ব শুরু হয়ে গেছে। ইংরেজের নির্ধারিত সদস্য-সংখ্যা গান্ধী মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন সাম্প্রদায়িক ভাগ, শ্রেণীগত ভাগ, জাতিগত ভাগ। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর নয়,

(১) বাঞ্চ অব্‌ ওল্ড লেটার্স, ২০৮ পৃঃ

দেশটা কয়েকটি সম্প্রদায়ের আর তাদের মাথার ওপরকার বিদেশী মালিক ও তার আমলাদের। একথা ইংরেজ প্রমাণ করেছে। গান্ধী একথা সমর্থন করেছেন। কিন্তু আরও বাকি আছে।

ইংরেজ আরও আরও রাউণ্ড টেব্‌ল্ কনফারেন্স ডেকেছে। ডেকেছে আয়র্লণ্ডের বেলায়, ডেকেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বেলায়। বিবদমান দুটি জাতি বা দেশ হিসেবে সেখানে সভ্য নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় তা হয়নি। আর আর ছুটকো দল বা সম্প্রদায়ের মতই কংগ্রেসকে ডাকা হয়েছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে নয়, বিবদমান দুটি দেশ হিসেবে তো নয়ই। তাই বড় ক্ষোভে নেতা বলেছিলেন,—"গোলটেব্‌ল্ বৈঠকের সবটাই ধোঁকা। টেব্‌ল্‌টা গোল নয়, আর বৈঠকটাও সম্মেলন নয়। ওটার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের কতকটি বোকা রাজনীতিক নেতাকে আরও বেশি বোকা বানানো।(১)

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আলোচিত হবে বৈঠকে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবে ইংরেজের মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তি। ভারতবর্ষ কী চায়, কী তার লক্ষ্য, কী তার আদর্শ,—কে বিচার করবে এ সব ? ইংরেজের শাসন কিসে আরও দীর্ঘদিন কায়েম হয়, তার স্বার্থ কেমন করে বজায় থাকে, ভারতের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে ভেদ, বৈষম্য আর মনান্তরের পাপ-পঙ্ক কতখানি জঘন্য করে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা যায়, গোলটেব্‌ল্ বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল তাই। ইংরেজ সে-উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক করেছে।

ভারতবর্ষকে যে-ছিটেফোটা দায়িত্ব দেওয়ার কথা ছিল, তারও প্রতিষেধক-ব্যবস্থা জুড়ে দেওয়া হল ইংরেজের অধিকার-সংরক্ষণ ধারায়। ভারতের স্বার্থ দেখবার দরকার নেই। দেখতে হবে ইংরেজের স্বার্থ। নেতা দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন,—"ভারতবর্ষের স্বার্থ

(১ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল, ১৯২১ ১৯৩৪, ২৯১ পৃঃ

ছাড়া অন্য কোনও স্বার্থের কথা উঠতেই পারে না। আর ভারতের স্বার্থের অর্থ ভারতের স্বাধীনতা।"(১)

১৯৩১এর ১১ই সেপ্টেম্বর মহাত্মাজি লণ্ডনে পদার্পণ করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর। গান্ধী-জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। চারদিকে অগণিত রাজনৈতিক ধুরন্ধর, বিশ্বের সজাগ সমালোচক দৃষ্টি, কলা ও কৌশলের অসামান্য আয়োজন, আর তারই মধ্যে একক এই একটি মানুষ দিনের পর দিন ভারতবর্ষের কথা বলে চলেছেন প্রাণ নিঙড়ে। ভুলের আধিক্য, বিচারের বিভ্রান্তি, কূটনীতির পরিবেশনে সেদিন গান্ধীজি কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বা জাতি বা দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন এর চুল-চেরা বিচার ইতিহাস একদিন করতে চাইবেই, কিন্তু এসব ছাপিয়ে সেদিনের গান্ধী সনাতন ভারতবর্ষের যে-অপরিম্লান চিত্র-রেখা বিশ্বের বিচার-কঠোর দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে দাঁড়িয়েছিলেন, তারও বুঝি তুলনা নেই। "এই সম্মেলনে আমি বৃটিশের প্রজা হিসেবে আসিনি। একদিন ছিল, যেদিন ও-পরিচয়ে আমি গর্ব অনুভব করতাম। আজ আমি এসেছি বিদ্রোহী ভারতের প্রতিনিধি হয়ে।" অকুণ্ঠ অনুত্তেজিত কণ্ঠের এই ঘোষণা হয়তো বিশ্বের মানব-প্রেমিক চিন্তাশীল কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর প্রাণে চমক লাগিয়ে থাকবে, কিন্তু বিলেতের কর্ণধার রাজনীতির পাণ্ডারা ওতে গলেওনি, আর তাদের ভয় পাবারও ওতে তেমন কিছু ছিল না। কানের কাছে অনেক কামানের আওয়াজ অহরহ তারা শুনতে অভ্যস্ত। হিটলারের দাম্ভিক উক্তি, মুশোলিনীর আস্ফালন ওদের বিচলিত করতে পারেনি। লেনিন-ষ্টালিনের অত্যুষ্ণ বাণী ওরা বেমালুম হজম করে ফেলেছে। মহাত্মাজিকে সোজা ওরা দাঁড় করিয়ে দিল সংখ্যা-লঘু শাখা সমিতির বাঁশ-বনে। সীমাহীন লজ্জা, ধিক্কার আর অসহায় অনুশোচনা গান্ধীর বুক চিরে বেরিয়ে এল। কিন্তু ভবি ওতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হল না।

(১) ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল, ১৯২১—১৯৩৪, ২৯১ পৃঃ

গান্ধী বুঝলেন যে, তাঁকে ওরা কৌশলে এই গোলকধাঁধায় ফেলেছে। ফেলেছে তাঁকে হতমান করবার জন্যে। ফেলেছে ভারতবর্ষের মসী-মলিন রূপ ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। গান্ধী-যে ভারতবর্ষের অবিসংবাদী নেতা নন, এটা প্রমাণ করা ইংরেজের পক্ষে সেদিন বিশেষ করে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের সমগ্র জাতির প্রতি-নিধিত্ব-ঘোষণা ধূলিসাৎ করা ইংরেজের স্থায়িত্বের জন্যে ছিল অপরিহার্য।

ইংরেজও ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই চায়, আর এই সদিচ্ছা অন্তরে অহরহ পোষণ করেই একমাত্র ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনাতেই-না সে ভারতবর্ষের দুরূহ শাসনদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছে। কিন্তু তার এই সদিচ্ছা পূর্ণ হতে দেয়নি ভারতবাসীই। ওদের সাম্প্রদায়িক অন্তর্দ্বন্দ্ব, শ্রেণী-পার্থক্য, জাতিভেদ আর দেশীয় রাজ্যের সমস্যাই-না তার এই সদিচ্ছার পথে অচলায়তন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বড় দুঃখে গান্ধীজির কণ্ঠ থেকে বেরোল,—"গভীর দুঃখ আর অন্তহীন দীনতার সঙ্গে আমার অক্ষমতার কথা স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।...আমার এ-পরাজয়ের পেছনে ভারতীয় প্রতিনিধি-মনোনয়নের নীতি রয়েছে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আমরা কেউই জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধি নই। সরকারী মনোনয়নে আমরা প্রতিনিধি সেজেছি।" অনুশোচনা জাগল, কিন্তু বড়ই দেরি করে। "ভারতীয় কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা কিনা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা রাখে।"(১) হাজার জোরে আর নিঃসংশয়ে গান্ধীজি বারবার ওদের কানের কাছে চিৎকার করে একথা শোনান না কেন, ওদের প্রমাণ তার চাইতে অনেক স্পষ্ট, অব্যর্থ আর ওদের হিসেবে অভ্রান্তও। জিন্না আর আমেদকর, শিখ আর পার্শী, রাজন্যবর্গ আর শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

(১) উদ্ধৃত অংশগুলি রাউণ্ড টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্সে প্রদত্ত গান্ধীজির বক্তৃতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

খোয়াব নয়, উপকথা নয়, কাব্য নয়। বাস্তবতা। একান্ত, নিষ্ঠুর, জীবন্ত বাস্তবতা। আর এই রূঢ় বাস্তবতার সব চাইতে বড় সাক্ষী গান্ধী স্বয়ং।

শেষ দৃশ্য দ্রুত ঘনিয়ে আসে। যবনিকা পতনের পূর্বাহ্ণে ব্যথা-কাতর নিঃসঙ্গ এই মহাপ্রাণ মানুষটির অন্তরে সহসা কি আত্মবিস্মৃতি দেখা দেয়? অগাধ ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি এই মহামানব বিচলিত কণ্ঠে বলে ওঠেন,—"ভবিষ্যৎ তোমরা সত্যিই কি দেখতে পাও না? (যদি আমার আজকের এই আবেদন নিষ্ফলই হয়) ইতিহাস তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না। আর সে-ইতিহাস লিখিত হবে সন্ত্রাসবাদীর রক্ত-মাখা লেখনীতে।"(১)

অলক্ষ্যে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা সেদিন হেসেছিলেন কিনা জানবার উপায় নেই, কিন্তু সত্যাগ্রহীর ভবিষ্যদ্বাণী যে কতখানি অভ্রান্ত তার পরিচয় ইংরেজ পেল অদূর ভবিষ্যতে।

দীর্ঘ তিন মাস কেটে যায়। পরিশ্রান্ত এই নগ্নতনু শীর্ণকায় পথিক হৃদয়হীন বিদেশের তুষার-কঠিন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে নিজের চার পাশে শুধু দেখেন অন্ধকার। হতাশা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। অজানা ভবিষ্যতের কথা ভাবতে তিনি ভয় পান। সারাজীবনের সাধনার সমাধি কি মূর্ত হয়ে উঠবে তাঁর জীবিত কালেই?

"আমার উপস্থিতি যদি কোনও প্রকার মীমাংসার জন্যে প্রয়োজনীয় হয়, দীর্ঘদিন আমি এখানে অপেক্ষা করব। আইন অমান্য আন্দোলন আবার চালু হোক, আর আমি চাইনে। দিল্লী-প্যাক্ট স্থায়ী হোক, ওরই মাধ্যমে ভারত-সমস্যার সুরাহা হোক, এই আমার অন্তরের কামনা। ঈশ্বরের নামে তোমাদের আমি আবেদন জানাচ্ছি,—আমাকে, এই দুর্বল বাষট্টি বৎসরের বৃদ্ধকে, শেষবারের মত একটু

(১) ৩০শে তারিখের বক্তৃতা। ডাঃ পট্টভির কংগ্রেসের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৪৯৮ পৃঃ

সুযোগ দাও। তোমাদের অন্তরের নিভৃত কোনও ক্ষুদ্রতম কোণে তার আর তার প্রতিষ্ঠানের জন্যে একটুখানি স্থান দান করো।"(১)

মূক অতীত মুখর হয়ে ওঠে। সত্যাগ্রহীর অদম্য ধৈর্য ক্লান্তিতে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। মিথ্যার দূত, শয়তানের অনুচর ইংরেজের কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন ভারতবর্ষের গান্ধী। নেতা গান্ধী। সত্যাগ্রহী গান্ধী। অসহায় অনুশোচনা সঙ্গে নিয়ে মহাত্মাজি লণ্ডন পরিত্যাগ করেন। ব্যর্থকাম, পরাজিত, বিষণ্ণ মহাত্মা গান্ধী।

১৯৩১এর সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দল আশাতীত সফলতা লাভ করল। আর যে-সরকার বিলেতে প্রতিষ্ঠিত হল, তার কাছে গান্ধী ও গান্ধীবাদের কোন মূল্যই রইল না। এক নিরঙ্কুশ অত্যাচার চলতে লাগল সারা ভারতব্যাপী। ইংরেজ সেদিন নিজের গড়া আইন ও শৃঙ্খলা নিজেই ভেঙ্গে তছ্‌নছ্‌ করে ফেলল।

দিল্লী-প্যাক্টের কথা ইংরেজ ভোলেনি। যতই মুখে ও বিজয়ের উল্লাস ফুটিয়ে তুলুক, ভেতরে ছিল পরাজয়ের একটা তীব্র জ্বালা। ভারতবর্ষের সঙ্গে প্যাক্ট করতে হয়েছে। প্যাক্ট করতে হয়েছে ভয়ে। একি সহজ জ্বালা! গোলটেব্‌ল্ শেষ হবার সময় পর্যন্ত ইংরেজ অপেক্ষা করতে পারল না।

বৈঠকে যাবার প্রক্কালে নেতা গান্ধীজির কাছে গিয়েছিলেন। ফেরানো যখন সম্ভবপর হলই না, গান্ধীজিকে বার বার সতর্ক করতে লাগলেন। ইংরেজের হাড়মাস চিনতেন এই মানুষটি। ওদের ছলাকলা, ওদের উদারতা আর লম্বা বুলির ভান, ওদের সততার মুখোশ, আর ওদের নিখাদ দেশপ্রেম, কোনটাই বলতে বাকি রাখেননি। কিন্তু গান্ধীজি নেতার কথা মনে রেখেছিলেন বলে মনে হয় না। বারবার করে যা-যা করতে নেতা নিষেধ করেছিলেন, একটার পর

(১) কংগ্রেসের ইতিহাস, ৪৯৭ পৃঃ

একটা সেই সব কাজ করে শুধু নিজেকেই গান্ধীজি ক্ষতিগ্রস্ত করেননি, পরন্তু যে বৃহৎ ও মহৎ কর্তব্যের গুরু দায়িত্ব নিয়ে তিনি ও-দেশে গিয়েছিলেন, তার ওপরেও অবিচারের পাহাড় জমিয়ে তুললেন।

ইংরেজ বন্ধু-বান্ধব বা কোন অনুরাগী ভক্তের অতিথি হতে নেতা নিষেধ করেছিলেন। ইংরেজের দেয়া পুলিশ পাহারার সাহায্য নিতে নেতা বারণ করেছিলেন। রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মাথা ঘামাতে বা কোন অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেলামেশা করা ঠিক হবে না, একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি সঙ্গে নিতে বলেছিলেন প্রতিটি আলোচ্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের।

বিলেতে এক ইংরেজ রমণীর অতিথি হলেন গান্ধীজি।(১) আইরিশ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে নেতা গান্ধীজিকে নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। নিজের একান্ত বিশ্বস্ত লোক ছাড়া সে-গৃহে আর কেউ থাকবে না। পাচক ও ভৃত্যও হবে বিশ্বাসী ভারতীয়। কিন্তু মহাত্মাজির পক্ষে ইংরেজ রমণীর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবার উপায় ছিল না। মহাত্মাজী নিজেকে শুধু রাজনৈতিক নেতা ভেবে পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। ওতে তিনি স্বস্তিও পেতেন না। রাজনীতি ওঁর ছিল গৌণ ভূমিকা। রাজনৈতিক নেতার জীবন ক্ষণস্থায়ী। যুগের পরিবর্তনে, চাহিদার তারতম্যে আর উপস্থিত পরিস্থিতির পটভূমিকায় ওর বাজার দর ওঠানামা করে। তিলক, বেসান্ত, সুরেন্দ্রনাথ,—এমন কি দেশবন্ধু, সবাই মরে গেছেন। মুছে গেছেন লোকের মন থেকে। তিলক যে-টুকু বেঁচে আছেন, তা অন্য কারণে। রাজনীতির জন্যে নয়। মৃত্যুর পর যেটুকু টিঁকে থাকে, সেটা শ্রদ্ধা নয়, ভালবাসা তো নয়ই। থাকে বোবা ইতিহাস হয়ে। ভাগ্যে জোটে বিচার সাপেক্ষ বড়জোর কৃতজ্ঞতা। এক অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবক, প্রবর্তক এবং বাহক হিসেবে নিজেকে ধরতে হবে বিশ্বের চোখের সম্মুখে। সে-গান্ধীর

(১) মিস্ মিউরিয়েল লিষ্টারের অতিথি হয়েছিলেন গান্ধীজি।

সঙ্গে ইংরেজের কোন বিরোধ নেই। নেই বিসংবাদ। সে-গান্ধী সার্বজনীন। বিশ্বমানবপ্রেমিক। অহিংসা আর সত্যের পূজারী। সনাতন ভারতবর্ষের মূর্ত প্রতিনিধি গান্ধী।(১)

এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই রাউণ্ড টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্সের ন্যায় নির্জলা রাজনৈতিক সম্মেলনের একমাত্র কংগ্রেস প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও গান্ধী বাধ্য হয়েছিলেন ইংরেজ জনসাধারণের কাছে নিজেকে সস্তা করে দিতে। নারী সমিতি, নিরামিষাশী সমিতি, পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি থেকে শুরু করে চার্লিচ্যাপ্‌লিন্ আর নানা ধরণের শিল্পী ও লেখকের মেলায় যেতে বাধ্য হতেন। এ ছাড়া ছিল পাদ্রীর দল। শান্তি-নিকেতনের এ্যানড্রূজ তখন বিলেতে ছিলেন। এঁর প্রভাবে যত-রাজ্যের পাদ্রীর মজলিসে ও তাদের উপাসনা-সভায় গান্ধীজিকে যোগ দিতে হত। তারপর অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজ। নামজাদা বুদ্ধিজীবী আর গুরুগম্ভীর দার্শনিক, কবি আর অধ্যাপকদের মজলিস। ওদের স্বীকৃতিই-না তাঁকে বিশ্ব-সংসারে বৃহৎ ও মহৎ মানব বলে পরিচয় করিয়ে দেবে! (২)

(১) জাতীয় নেতা গান্ধী আর অতিমানব গান্ধীর মধ্যে চিরদিনই ছিল একটা বড় ব্যবধান। আর তাই গান্ধী ও আমাদের জাতীয় রাজনীতির ভেতর মতদ্বৈধতারও অন্ত ছিল না। অতিমানব গান্ধীর কণ্ঠে ছিল প্রত্যাদেশের বাণী। সে-গান্ধীর নিকেতন শুধু ভারতবর্ষ নয়। বিশ্ব। সমগ্র মানবজাতি নিয়ে তাঁর সংসার। —ডিসকভারী অব্ ইণ্ডিয়া, ৪৭১ পৃঃ

(২) বিশপ আর আর্কবিশপদের জন্যে বাপুর অনেক সময় ব্যয় করতে হচ্ছে।...আজ রাতেই আমরা যাচ্ছি এটোন, সেখান থেকে অক্সফোর্ড। এসব দেখবার কী আগ্রহই-না আমার ছিল!

জহরলালকে ২৩শে অক্টোবর, ১৯৩১এ লেখা মহাদেব দেশাইএর পত্রাংশ। দেশাই ছিলেন গান্ধীজির একান্ত সচিব। বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটার্স, ১০৩ পৃঃ।

ইংরেজ রাজনীতিবিদ্‌রাও এই চাইছিল। চাইছিল গান্ধীকে ভুলিয়ে রাখতে। চাইছিল ওঁর দৃষ্টি, চিন্তা, ও বিচার শক্তি বিক্ষিপ্ত করে দিতে। তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করতে গান্ধী কৃপণতা করেননি।

ঘটা করে বিলেতের সরকার গান্ধীর দেহরক্ষী করে পাঠাল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তুজন ষণ্ডা পুলিশকে। অহিংসার উদ্গাতা গান্ধীর দেহরক্ষাই বটে! ঐ সুযোগে ইংরেজ গান্ধী ও ভারতীয় শিবিরের সব খবরাখবর সংগ্রহ করবার যে-ধূর্ত মতলব হাসিল করে নিল, গান্ধী তা বুঝতেই চাইলেন না।

ভারতীয় বিশেষজ্ঞ কেউ ছিল না। সে-অভাব পূর্ণ করতে অনেক সময় গান্ধীকে ইংরেজ বন্ধুদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। একদল বিদেশী ভক্ত জুটেছিল গান্ধীর চারপাশে। তাদের প্রভাব গান্ধীকে কম বিভ্রান্ত করেনি।

মূলতঃ গান্ধী গোলটেব্‌ল্ বৈঠকে যোগদান করেছিলেন ইংরেজের সঙ্গে আপোষের আগ্রহ নিয়ে। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা-যে ও-পথে আসবে না, সম্ভবপর হবে না, একথা অনুমান করা গান্ধীর পক্ষে অসম্ভব ছিল, একথা বলতে গেলে গান্ধীজির বুদ্ধি, বিচার-শক্তি এবং সর্বোপরি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ওপর অবিচার করা হবে। একথা গান্ধী জানতেন। এবং জানতেন বলেই নিছক তাঁর মতবাদের অন্তত সাময়িক আর সামান্যতম সার্থকতা দেখতে চেয়েছিলেন। আমেরিকার রজার বল্‌ডুইনএর পত্র এ-সম্পর্কে আরও বিশদ :

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

প্রিয় জহরলাল,

এখানকার (বিলেতের) গান্ধী-গোষ্ঠীর সবাইএর সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি। আমেরিকায় আন্দোলন চালু করা খুবই দরকার। বিশেষ করে বর্তমানে। ওখানকার ওয়াল্ ষ্ট্রীটের ব্যাঙ্কাররাই আজকের বৃটেনের প্রকৃত মালেক। ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে ওরা টোরী বানিয়ে ছেড়েছে। গোলটেব্‌ল্ ব্যর্থ হবেই,—হবেই এটা আমার বদ্ধমূল

ধারণা। অবিশ্যি যদি গান্ধী আরও বেশি আপোষের জন্যে রাজী থাকেন, সে আলাদা কথা। গান্ধীগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী আমি সমর্থন করতে পারছিনে। না আছে এদের কোন স্বচ্ছ ধারণা, না এরা সব বিষয়ে একমত। এদের কোন বলিষ্ঠ সংকল্প আছে বলে আমার মনে হয় না। এরা সবাই অতি ব্যস্ত গান্ধীর জন্যে ;—ওঁর গায়ে যেন আঁচ না লাগে। গান্ধীর মতামতও আমার অজানা নয়। সব জেনেও ওঁর বিচার-শক্তি আর ধৈর্যের প্রশংসা না করে আমি পারছিনে। কিন্তু—। হয়তো শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার নির্যাসই (Substance of Independence) ভারতের ভাগ্যে জুটবে। তার মানে ইংরেজের থাকবে সামরিক বিভাগ, অর্থ-ব্যবস্থা আর বৈদেশিক নীতির ওপর অবাধ অধিকার। গান্ধী আমার কাছে এর সমর্থন খোলাখুলি স্বীকার করেছেন।...এ্যানড্রুজও ঐ মতের।...(১)

এই হল একজন বিদেশীর চোখে গান্ধীরূপ। নেতা বলেছেন আরও স্পষ্ট করে,—"গোলটেব্‌ল্ বৈঠকে বার বার অকুণ্ঠ সহযোগিতার আশ্বাস ঘোষণা করে গান্ধীজি নিজেকে হাস্যাস্পদ আর করুণার পাত্র করে তুলেছিলেন। ইংরেজ স্বভাবতই মনে করত,—গান্ধী-জীবনের শেষ অধ্যায় আসন্ন।"(২)

গান্ধীজির আত্মপ্রত্যয় ছিল অসাধারণ, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু গান্ধীজি বিলেতের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, একথাও সত্য। আর এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রফেসর উইলসনের মতই গান্ধীজিকে নিয়ে ইংরেজ খেলেছে। তাঁকে ভুলিয়েছে। মনে মনে তাঁকে দেখে হেসেছে। রজার বলডুইন নিউইয়র্ক থেকে ১৯৩১এর ৩০শে মে লিখছেন,—"গোটা ভারতের একক প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে গান্ধীকে। তাছাড়া ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষমতাও দেওয়া

---

(১) বাঞ্চ অব্‌ ওল্ড লেটার্স, ১০০ পৃঃ।

(২) ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল্—১৯২১, ১৯৩৪, ৩১৯পৃঃ।

হয়েছে অবাধ। এর ওপর গান্ধীর আপোষী মনোভাবের অতীত নজির রয়েছে প্রচুর। সব মিলিয়ে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের অধ্যাপক উইল্‌সনের কথা মনে করিয়ে দেয়।"(১)

রাজনীতি আর সাধুত্বের এক অভিনব মিশ্রণে গান্ধীবাদের সৃষ্টি। রাজনীতিক্ষেত্রে ভুল করলেও তাঁর মানবপ্রেম, অহিংসার উদার সার্বভৌম আবেদন, কঠোর নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলা, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং সর্বোপরি সত্যের প্রতি অপার নিষ্ঠা ও অনুরাগ ইংরেজের মনে দাগ ফেলবেই, এই সিদ্ধান্ত গান্ধীজিকে বিভ্রান্ত করেছে। আর বার বার ওরা সেই ভ্রান্তির সুযোগ নিয়েছে।

আরউইন চলে যাবার পর ওয়েলিংডন দিল্লী-প্যাক্টের কোন মূল্য দিতে চাননি। বরং প্যাক্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেদিনকার অপ্রস্তুত সরকারকে প্রস্তুত করেছিলেন। ইংরেজ-সরকার জানত প্যাক্টের পরিণাম। জানত গোল-বৈঠকের ব্যর্থতার অবশ্যম্ভাবিতা। অন্তত কংগ্রেসের মর্যাদা আর নিজেদের কাটা কান ঢাকবার আগ্রহে যে গান্ধীকে আবার সংগ্রাম শুরু করতেই হবে, এটা ওরা অনুমান করেনি, —এই ভবিতব্যতা ওরা চোখে দেখেছে। ওরাই চেষ্টা করে তৈরী করেছে। সারা দেশ জুড়ে এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতি ওয়েলিংডনের অনুচরেরা সৃষ্টি করেছিল সেদিন যে, সংগ্রাম শুরু না করে গান্ধীর গত্যন্তর ছিল না।

১৯৩১ শেষ হয়ে গেল। এল নতুন বছর। এল তার সর্বাঙ্গে সংঘর্ষ আর কলঙ্কের ছাপ নিয়ে। সংঘর্ষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোটা ভারতবর্ষ। ইংরেজ মাথায় বয়ে নিল কলঙ্কের পশরা। ইংরেজ-চরিত্রের যে-কালী ও কাদা ফুটে বেরোল এই সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে,

(১) বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটার্স ৯৬ পৃঃ।

সেপাই বিদ্রোহের পর তেমনটি সম্ভবত আর দেখা যায় নি। হিংস্র জানোয়ারের মত ওয়েলিংডন-শাসন ঝাঁপিয়ে পড়ল জাতির বুকের ওপর।

গোল-বৈঠকের ফলাফলের জন্যে নেতা অপেক্ষা করেন নি। ওতে মুক্তি সম্ভবপর হবেনা, একথা শুধু তিনি জানতেন তা নয়,—একথা ছিল তাঁর সহজাত প্রজ্ঞান। (১) ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অজস্র বক্তৃতা করলেন। সভা-সমিতি-আলোচনা-বৈঠকে আগামী দিনের কথা বলে চললেন। গেলেন পুণায়, পাঞ্জাবে, মথুরায়, পাটনায়। বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাঁর বজ্রগর্ভ বাণী ভবিষ্যৎ-বিপ্লবের রূপ নিয়ে ফুটে উঠল। আগামী সংগ্রামে বাংলা যাতে করে তার উপযুক্ত স্থান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কার্যক্রম স্থির করলেন। বাংলার সমবেত সংহতি ও আগামী সংগ্রামের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করতে বহরমপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের আহ্বান জানালেন।

সম্মেলনের দিন ছিল ১৯৩১এর ১লা ডিসেম্বর। সদলবলে নেতা চললেন আগের দিন। রাত্রের গাড়ীতে আমরা যেয়ে পৌঁছোলাম। সারাপথ আলোচনায়, বিতর্কে আর বিশ্লেষণে কাটল। মাঝে মাঝে চা আর পান।

ছোট 'কুপে' নেতা। আমরা পাশের গাড়ীতে। কিন্তু সেটা নামে। ওঁর গাড়ীতেই কাটল প্রায় সারা পথ। জালালুদ্দীন হাসেমী ও সিরাজগঞ্জের আসাদুল্লা সিলেটকে বাংলার ভেতর আনবার জন্যে প্রস্তাব পেশ করবেন বলে ভাবছিলেন। সে-কথা নিয়েও আলোচনা

(১) "বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বর্তমান মেজাজ ও মতি বিচার করে একথা আমি কোনক্রমেই মেনে নিতে পারিনে যে, রাউণ্ডটেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্সের ফলে আমাদের কিছু লাভ হবে।"

১৯৩১এর ৪ঠা জুলাইএ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন্ কংগ্রেসের সভাপতি-ভাষণের অংশ।

হল অনেক। সিলেট যদি বাংলার অংশ হতে পারে, পুরুলিয়া বা মানভূম দোষ করল কোথায়? বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা এ-প্রস্তাবে সায় দেবে না। সিলেট বাংলার হলে মুসলমানের সংখ্যা একটু বাড়বে—কিন্তু ঐ সঙ্গে মানভূম জোড়া দিলে হিন্দুর সংখ্যা যায় বেড়ে। ওরা একটু ভয় পায় বৈকি!

নামবার আগে নেতা বললেন,—"বাংলার কথা বলতে হয়, তাই বলা। আসলে কিন্তু হিন্দু, না মুসলমান।"

গভীর রাত্রি। কন্‌কনে গঙ্গার হাওয়া বইছিল সহরের ওপর দিয়ে। জমাট শীত। কম্বলে আপাদমস্তক জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কে-একজন ডেকে তুলল। নেতা ডাকছেন। খদ্দরের জামা-চাদরে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে হাজির হলাম ওঁর ঘরে। টেব্‌লের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে লিখে চলেছেন। নিস্তব্ধ রাত্রি। হিমের রাত্রি। খদ্দরের একখানা পাড়-দার চাদর ঘাড়ের ওপর ছড়ানো। দুপাশে ঝুলে পড়েছে। মেঝেয় লোটানো। চোখ না-তুলে লিখতে লিখতেই বললেন,—"বসো।"

বসলাম। বসে বসেই দেখতে থাকলাম। লিখছেন নেতা। অবিরাম। পাতার পর পাতা শেষ হয়। বাঁ হাতে সেটা সরিয়ে দেন। শুরু হয় নতুন পাতা। ছেদ নেই। বিরতি নেই। মগজের ভেতর থেকে রীল খুলে আসছে। খুলে আসছে একের পর আর। ঐ-ভাবেই আবার বললেন,—"পাতা মিলিয়ে সাজিয়ে ফেলো।"

চোখ যেয়ে পড়ল লেখার ওপর। ইংরেজের অত্যাচার-কাহিনীর লম্বা ফিরিস্তি।

আরউইন বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে শাসন-রূপ পাল্টে গেল রাতারাতি। বাংলার একটি রাজবন্দীরও মুক্তি মেলেনি প্যাক্টের ফলে। উল্টো দিনকারদিন ধর-পাকড় চলেছে অব্যাহত। সমগ্র প্রদেশ জুড়ে নাকি ষড়যন্ত্র আর বিপ্লবের আয়োজন চলছে। তাই ইংরেজ বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মানবতার শেষ চিহ্নও ওরা রেখে যাবে না। বাংলার যুবক বলতে কেউ বাইরে থাকবে না।

সবাইকে ঢুকতে হবে ইংরেজের লোহার খাঁচায়। নির্বিচারে। নির্বিশেষে। ১৮ই এপ্রিল আরউইন ভারত ত্যাগ করেন। জুলাইএর মধ্যেই জানা গেল সব। মহাত্মাজি তখনও বিলেতের পথে রওনা হন নি,—তখন থেকেই। ইংরেজ তৈরী হতে শুরু করেছে। ঘাঁটি বসিয়েছে জেলায় জেলায়। পথে-ঘাটে টিক্‌টিকি, গোয়েন্দা, পুলিশের বিষাক্ত দৃষ্টি। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, ঢাকা, কুমিল্লা,—ইংরেজের ষ্টীমরোলার চলল দ্রুত আর সশব্দে।

আঘাত সৃষ্টি করে প্রতি-আঘাত। প্রকৃতি ক্ষমাহীন। নিরপেক্ষ। মানুষ কষ্ট ক'রে দর্শন গড়ে, বুক্‌নি ঝাড়ে। অলক্ষ্যে প্রকৃতি হাসে। প্রতি-আঘাত গর্জে উঠল। আগষ্ট মাসে লোমান্‌-হাডসন্‌ গুলি খেল ঢাকায়। রাইটার্স বিল্ডিংএ লুটিয়ে পড়ল সিম্‌সন্‌ ডিসেম্বরে। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পেডি প্রাণ দিল। ওর পরই বার্জ।

প্রত্যুত্তর নয়,—প্রতিশোধের পালা। 'ব্ল্যাক্‌ এণ্ড ট্যান্‌স্‌' (১) এর শাসন চালু হল বাংলায়। হিজলীর কারাগারে হত্যাকাণ্ড চালাল ইংরেজ। চট্টগ্রাম শ্মশানে পরিণত হল। ঢাকায় গুণ্ডা আর পুলিশ হাত মিলিয়ে লুট করল সারা সহর। সঙ্গে সঙ্গে চলল ধর-পাকড়।

না, ইংরেজ আর ভুল করবে না। সামরিক শক্তিহীন একটা জাত,—শতধাবিভক্ত, পথ ও মতের অজস্র ব্যবধানে যার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ছিন্নভিন্ন, তাকে সায়েস্তা করবার শক্তি ইংরেজ হারায়নি। গান্ধীজির সাধুত্বের প্রভাবে আরউইন যে-মহাভুল করেছিলেন, ওয়েলিংডন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। করতে চান ভারতের বুকের রক্তে। তাঁর আঘাত হয়ে উঠল, তাই, আরও নির্লজ্জ, কঠোর, নগ্ন। অতীতের ইতিহাস তাঁর চোখে জীবন্ত হয়ে উঠল। তিনি

(১) আয়র্লণ্ডের মুক্তি-আন্দোলন দমন করতে ইংরেজ যে-অক্সিলিয়ারী ফোর্স নিযুক্ত করেছিল, দুরঙ্গা পোষাকের জন্যে তাদের সবাই ডাকত 'ব্লাক এণ্ড ট্যানস্‌' বলে।

ভোলেন নি, কিচেনার কেমন করে বুয়রদের ঠাণ্ডা করেছিলেন। আর এই ভারতবর্ষেই সেপাই-বিদ্রোহের পরবর্তী কাহিনী। এওতো বিদ্রোহ। শাসিত শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যদি করে, তাকে দমন করতে হবে। এইতো স্বাভাবিক বিধান। ন্যায়, সত্য, সুবিচার,—দর্শন ও সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক্,—বিদ্রোহীর জন্যে নয়। দায়িত্বজ্ঞানহীন পুলিশ আর মাতাল সৈনিক সেদিন বাংলার ভাগ্য-বিধাতা হয়ে উঠল।

গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট বাংলাকে রক্ষা করতে পারেনি। হৃদয়হীন স্বৈরাচারী ইংরেজ-শাসন প্যাক্ট মানতে চায়নি। বাংলা ও বাঙালীকে বাঁচাবার দায়িত্ব বাঙালীকেই গ্রহণ করতে হবে। বাঙালীও ও-প্যাক্ট স্বীকার করে নেবে না। বাংলার ছেলেরা ফাঁসিতে ঝুলেও হাসতে ভোলেনি। মহাজীবনের জয়গানে করে গেছে মুখরিত জল্লাদের মশান।

কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট তার নিজের ঘরে ঢলে পড়ল শান্তি আর সুনীতির হাতে। বাংলার মেয়ে শান্তি আর সুনীতি।

রাত শেষ হয়ে আসে। বাইরে চাপ-বাঁধা কুয়াশা। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে ঘরে ঢোকে সাদা সাদা কুয়াশার রেণু। রাস্তায় টিম্‌টিমে আলো। কুয়াশায় ঢেকে গেছে। দূরে গঙ্গার বালুচর। শুয়ে আছে নির্জীব শবের মত। পাংশু। ধোঁয়াটে। লেখা থামে না। বাংলার পর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। ফ্রন্টিয়ার গান্ধী আব্দুল গফ্‌ফার খাঁয়ের কর্মক্ষেত্র। অতর্কিত এক নিঃশব্দ মুহূর্তে অর্ডিন্যান্স জারী হল। লোহার শেকল হাতে পড়ল সীমান্ত গান্ধীর আর তাঁর ভাইএর। অন্যান্য নেতাসহ কয়েক শত লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবককে ঢোকানো হল জেলে। পুলিশ আর সৈন্যদল গ্রামে গ্রামে ঢুকে পড়ল। সন্ত্রাসের মত্ত চাবুক পড়তে লাগল নিরীহ গ্রামবাসীর পিঠে, বুকে, সর্বাঙ্গে। পাথরের বুকে ছিটকে লাগল রক্তের কণা। মাস কাটবার আগেই বন্দীর সংখ্যা দাঁড়াল কয়েক হাজার।

যুক্তপ্রদেশের অবস্থা গুরুতর আর ঘোরালো হয়ে উঠল। ১৯২০এর নভেম্বর মাসে খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ্ এইচ, এন, ব্রেইলস ফোর্ড নেতার সঙ্গে দেখা করেন কলকাতায়। তিনি চাক্ষুষ দেখে এসেছিলেন যুক্ত প্রদেশের অবস্থা। তিনি বলেছিলেন,—"যুক্ত প্রদেশে কৃষক-বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী।" ঠিক তাই ঘটল। শত শত লোক বন্দী হল। কংগ্রেস সত্যাগ্রহে প্রথমটায় যোগ দেয় নি। প্যাক্ট তখনও নামে চালু রয়েছে যে। কিন্তু গণ-আন্দোলনের প্লাবনে কংগ্রেস ভেসে গেল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি জহরলাল আর শেরওয়ানি বন্দী হলেন।

বাইরে দু-একটা পাখী ডাকতে থাকে। উষার দেরি নেই। নেতার ক্লান্তি-মাখা চোখদুটির পানে চেয়ে থাকি। মনে হয়, সারা দেশের দুঃখ আর আর্তনাদ ঐ চোখের মণিতে ধরা দিয়েছে। তাইতো ও-চোখ সজল। একটু চা-এর খোঁজে বেরিয়ে গেলাম। চা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি টেব্‌লের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আঙ্গুলের ফাঁকে তখনও কলমটা ধরা রয়েছে। গা থেকে চাদরখানা খুলে পড়েছে। সন্তর্পণে চাদরখানা গায়ের ওপর বিছিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দোরের শেকলটা দিলাম তুলে।

১লা জানুয়ারী, ১৯৩২। ওয়ার্কিং কমিটি দীর্ঘ প্রস্তাবের শেষে মন্তব্য করল : (সরকারের তরফ থেকে) যদি কোন সন্তোষজনক সাড়া না মেলে, কমিটি জাতির কাছে আবেদন জানাবে সংগ্রামে ব্রতী হতে।

এক সপ্তাহও কাটল না। কংগ্রেসের অধিকাংশ দায়িত্বশীল কর্মী ও নেতাকে বন্দী করে ইংরেজ জেলে ঢোকাল। সরকারী হিসেবে জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বত্রিশ হাজার দু'শো কর্মী বন্দী হল। ওয়ার্কিং কমিটির এই সভায় যোগদান করবার জন্যে সুভাষচন্দ্র বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অধিবেশন শেষ হবার পরদিন নেতা

ফিরে চললেন বাংলায়। কল্যাণ স্টেশনে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনে নেতাকে ইংরেজ বন্দী করল। নিয়ে গেল শিউনি জেলে। এর কয়েকদিন আগেই আমার কারাদণ্ড হয়ে গিয়েছিল। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বসে শুনলাম নেতার বন্দী হবার কাহিনী।

মধ্য প্রদেশের শিউনি সাব্‌জেলে নেতা কাটালেন কয়েক মাস। ওখান থেকে জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেল। আগে থেকেই জেলের ভেতর অপেক্ষা করছিলেন মেজদাদা শরৎচন্দ্র। দু-ভাই ঘর পাতলেন জেলের ভেতর। কিন্তু ভাগ্য-যে বড় কথা। কিছুদিন কাটতে-না-কাটতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। পাঠানো হল ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসে।

দিন-দিন দেহ অচল হয়ে আসতে থাকে। হজমশক্তি কমে গেল। পেটে জ্বালা। অল্প অল্প জ্বর। ডাক্তারী পরীক্ষার সুবিধের জন্যে পাঠানো হল লক্ষ্ণৌএর বলরামপুর হাসপাতালে। উদ্বেগজনক সংবাদ রটে চারদিকে। ছুটে যান মমতাময়ী মেজভ্রাতৃজায়া বিভাবতী দেবী। যান দিল্লী। দরবার করেন কতজনের সঙ্গে। ডাক্তার লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্ণেল বাক্‌লি ইউরোপে যাবার সুপারিশ করে পাঠান। সরকার রাজী হয়ে যায় কিন্তু জুড়ে দেয় সর্ত। নিজের খরচায় যেতে হবে।

বম্বেতে জাহাজে ওঠবার প্রাক্কালে নেতার বন্দী-জীবনের অবসান হল। মুক্তির আদেশ এল—নির্বাসনের ছাপ কপালে এঁটে দিয়ে। জাহাজে উঠলেন নেতা। ভিয়েনায় পৌঁছোলেন ১৯৩৩এর মার্চ মাসে।

আট

জাহাজের নাম গঙ্গা। ইটালিয়ান জাহাজ। লয়েড্‌ ট্রিষ্টাইন কোম্পানীর জাহাজ। পূর্বাহ্নে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। চারদিক থেকে লোক এল জাহাজ ঘাটে ভিড় করে। দেশ ছেড়ে নির্বাসনে

চলেছেন দেশের একনিষ্ঠ সেবক। জীর্ণ দেহ। রোগগ্রস্ত দেহ। আবার কবে ফিরবেন কে জানে? ইংরেজ কি ফিরতে দেবে? হয়তো আর দেখা হবে না।

কিন্তু যাবার আগে একবার চোখের দেখা? চোখের দেখাও দেখব না? না। ইংরেজের হুকুম। পুলিশ সার বেঁধে দাঁড়াল। জেঠির পথে। কাউকে ঢুকতে দিল না। ধারে-কাছেও না। বন্ধ এ্যাম্বুল্যান্স-গাড়ীতে পুলিশ নেতাকে নিয়ে এল। ষ্ট্রেচারে করে চড়িয়ে দিল জাহাজে। ক্ষুণ্ণমনে ফিরে গেল জনতা। পথে পথে ভিড় করে বলতে লাগল,—অন্যায়···ভয়ানক অন্যায়······

ক্যাবিনে শুয়ে নেতা। বাইরে তাকিয়ে থাকেন। দূরে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে ভারতবর্ষের তীরভূমি। নীল রেখা মিলিয়ে যায় অসীম সমুদ্রের নীলাম্বুর মাঝে। শান্ত স্থির সমুদ্র। শীতের সমুদ্র। ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হতে চলেছে। চারদিকে শুধু নীলের লীলা। নীল সমুদ্র। নীল আকাশ। পোর্ট সয়েদের দিকে জাহাজ চলে। শীত কমে এসেছে। বেশ গা-সওয়া আবহাওয়া। ইউরোপিয়ান যাত্রীরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কাছে ঘেঁষে না। লোকটি বিপজ্জনক তো বটেই, নইলে পুলিশ ঘিরে ছিল কেন? আর ওঁর জামা কাপড়?—তাই-বা অমন কেন? মোটা চটের মত। না আছে শ্রী, না আছে ছাঁদ। কিন্তু মানুষের ঐ মেলা,—ওরা কেন? এই মানুষটাকে দেখতে? তবে কি···জাগে ওদের মনে দোলা। সংশয়ের দোলা। সন্দেহের দোলা।. আবার তাকিয়ে দেখে। দেখে আর মনে মনে বিচার করে। তারপর একজন একজন করে এগোয়। এগোয় সন্তর্পণে। কথা হয়। হয় পরিচয়। বিস্ময় জাগে ওদের চোখে। বিদ্রোহ···বিপ্লব···গান্ধী···সুভাষ বোস।

২রা মার্চ জাহাজ ঢোকে সুয়েজে। সুয়েজ বন্দর-ঘেরা সুয়েজ-খাল। সবটা ঘেরা নয়। অর্ধবৃত্তাকারে। দুধারে চমৎকার দৃশ্য। নয়নাভিরাম। অপলকে নেতা চেয়ে থাকেন। জুড়িয়ে যায় শ্রান্ত

ক্লান্ত চোখ। এশিয়ার শেষ প্রান্ত। ভারতবর্ষের সঙ্গে জড়িয়ে. আছে অঙ্গাঙ্গী। শিরশির করে ওঠে ভেতরটা। রক্তে লাগে টান। টের পাওয়া যায় ধমনীর গতির তালে। দূরে লোহিত সাগরের মোহনা। ইউরোপের দ্বার। এশিয়া ফুরিয়ে গেছে।

জাহাজ চলল পোর্টের দিকে। ঘন সবুজের জাঙ্গাল দুধারে। ছোট বড় জাহাজ চলে। পাশ কাটিয়ে যায়। মাল্লায় মাল্লায় কথা হয়। রাত্রি নেমে আসে। পোর্টে জাহাজ ভেড়ে।

ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ে। ভূমধ্যসাগর। ইউরোপের গা-ঘেঁষা সাগর। বড় বড় ঢেউ। অশান্ত। অস্থির। উদ্বেল। বিকলদেহ নেতার, —গা গুলিয়ে ওঠে। ক্যাবিনে প'ড়ে থাকেন নির্জীব হয়ে। প'ড়ে থাকেন একা।

৫ই মার্চ। ব্রিন্দিসী। ইটালীর বিখ্যাত বন্দর। রোমের হিন্দুস্থান সমিতির তরফ থেকে আসে তার-বার্তা। নেতাকে ওরা জানিয়েছে স্বাগত। পরদিন ভিনিসের ঘাটে। বেলা তখন ১১টা। অনর্গল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। চাপ-বাঁধা কুয়াশা। চারদিক ঝাপসা হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের বালসূর্যের পরশ নেই। নেই মধ্যাহ্নের খর-কর-ধারা। দেশের সোনা-মাখা রোদ। প্রাণ ককিয়ে ওঠে।

কোম্পানীর ম্যানেজার আসেন। আসেন এজেন্ট। নেতাকে যত্ন আর সতর্কতার সঙ্গে দেখবার জন্যে রোম থেকে আদেশ এসেছে। কাষ্টমৃসের ঝক্কি আর গড়িমসি পোহাতে হল না। নেতা সোজা চলে গেলেন ওখানকার হোটেলে।

কয়েকদিনের সমুদ্র-ভ্রমণেই ফল ফলেছে। একঘেয়ে রুগ্নতা কম লাগছে। বাইরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু উপায় নেই। অবিরাম বৃষ্টি। ঘরে বসে থাকেন গোটা দিন। ওর মধ্যেই সংবাদ রটে যায়। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা খুঁজে বের করে নেতার ঘর। দেখা করে নেতার সঙ্গে। জেনে নেয় ভারতবর্ষের নানা কথা। পরদিন যুগপৎ রোম, মিলান, ফ্লোরেন্স, বোল্না, আর ভিনিসের কাগজে ছড়িয়ে পড়ে

ওঁর আগমন-বার্তা, ছবি, বাণী, আর ওঁর কাছ থেকে জেনে-নেয়া সংবাদের বিবরণ।

পরদিন ভিয়েনার পথে। সন্ধ্যার ট্রেনে নেতা চললেন ভিয়েনায়। সকাল হল টাইরলের হিমানী-মাখা পাহাড়ের উপত্যকার মাঝখানে। পাহাড়। গায়ে গায়ে লাগা। থোকা থোকা শুভ্র তুষার মাথায় পরিয়ে দিয়েছে উষ্ণীষ। দূর থেকে ভিয়েনার স্টেশন চোখে পড়ে। জনাকীর্ণ। উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন নেতা। স্টেশনে গাড়ী থামতেই বন্দেমাতরম্ আর ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি গর্জে ওঠে জনতার কণ্ঠে। এসেছে ভারতীয় ছাত্রের দল। সঙ্গে এসেছে অনেক ও-দেশী বন্ধু। নেতা বিচলিত হয়ে ওঠেন। দেশ ওঁকে ভোলেনি। ওরা-যে ভারতেরই প্রতিনিধি।

হোটেলে ওঠবার পরক্ষণেই ডাক্তারি-পড়া ছাত্রেরা ছুটে আসে। বসে পরামর্শ-সভা। চিকিৎসার আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হতেও দেরি হয় না। ১১ই মার্চে নেতা এসে উঠলেন ডাঃ ফার্থের (Dr. Furth) স্বাস্থ্য-নিবাসে।

চিকিৎসা চলতে থাকে। ভিড় জমে যায় নানা ধরনের ডাক্তার-দের। সবাই বিশেষজ্ঞ। চলতে থাকে পরীক্ষা। এক্‌স্‌রের ফটো নেওয়া হয় বার বার। রোগ ধরা পড়ে না। গবেষণা চলতে থাকে। ফুসফুস ঠিক স্বাভাবিক নয়। আর ওর ওপরের ঝিল্লী (Plura) ফুলে গেছে। তাছাড়া পাকস্থলীর ব্যথাটা : ওটা কেন? ঘা হয়নি তো? পরামর্শ সভা বসে ডাক্তারদের। আবার পরীক্ষা। ওঁদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়। ফুসফুসের অবস্থা এমন হল কেন? তবে কী যক্ষার বীজাণু দাঁত বসিয়েছে? আরও-আরও বিশেষজ্ঞদের ডাক পড়ে।

রোগ যন্ত্রণা আর চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে চোখের ওপর ভেসে ওঠে ভারতবর্ষের ছবি। ক্ষত বিক্ষত ভারতবর্ষ। তাঁর দেশ। জন্মভূমি। কেঁদে ওঠে সমগ্র সত্তা। সন্ধ্যা যখন নেমে আসে, রোগশয্যায় শুয়ে

বাংলার সুভাষ আকুল হয়ে ভাবতে থাকেন দেশের কথা। ভারতবর্ষের কথা।

ভিয়েনা থেকে সুইজারল্যাণ্ড। ওখানকার স্বাস্থ্য-নিবাসে থেকে রোগের উপশম হল। জ্বর আর নেই। দেহের ওজন বেড়েছে। একটু ভাল হতে-না-হতে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কর্ম-ব্যস্ত ইউরোপে এসে কি বসে থাকা যায়? কত কাজ করবার রয়েছে। কিন্তু দেহ? ও কি চলবে? চলতে দেবে? মনে জাগে অদম্য সঙ্কল্প। যেমন করেই হোক এই ভগ্ন স্বাস্থ্য সুস্থ করে তুলতে হবে। চিকিৎসার সাথে সাথে চলতে থাকে আসন আর অল্প অল্প প্রাণায়াম। লুপ্ত শক্তি জাগতে থাকে।

১৯৩৩এর মাঝামাঝি নেতা বেরিয়ে পড়েন নানা স্থান ঘুরতে। যান চেকোশ্লোভাকিয়ায়, পোল্যাণ্ড আর রুমানিয়ায়। যান বুলগারিয়ায়। বুখারেষ্টে দেখা হয় নরসিংহ মূলগন্ধের সঙ্গে। লেঃ কর্ণেল মূলগন্ধ। রুমানিয়ার সামরিক বিভাগের ডাক্তার। মূলগন্ধ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ সহরের মাইল ষাটেক দূরে তালুক ভুবনগীর, ওঁর পৈত্রিক বাসভূমি সেখানেই। বম্বে থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে যান কলকাতায়। স্কটিশ চার্চ কলেজে ফার্ষ্ট আর্ট পড়তে পড়তে ডাক্তারিও শিখতে থাকেন। ডাঃ এস, কে, মল্লিকের ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মূলগন্ধ যান লণ্ডনে। সেখানে এম, আর, সি, এস, ডিপ্লোমা লাভ করেন।

ঠিক এই সময়ে তুরস্কের সঙ্গে গ্রীস, সারভিয়া আর বুলগারিয়ার লড়াই বেধে যায়। ভারতবর্ষ থেকে এই লড়াইএর সময়ে দুটি মেডিক্যাল মিশন আসে তুরস্কে। একটির নায়ক ছিলেন ডাঃ আনসারী। আর একটির ডাঃ আব্দুল হোসেন। ডাঃ মূলগন্ধ, ডাঃ হোসেনের মিশনে যোগ দেন। ছ'মাস তুর্কী ফৌজের সার্জেন হিসেবে কাজ করবার পর

তুর্কী সরকার সামরিক উচ্চপদে ওঁকে নিযুক্ত করেন। এর পর যান রুমানিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেলা রুমানিয়া জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মূলগন্ধ ১৯১৭য় হন লেফট্ন্যান্ট, ১৯১৮এ ক্যাপ্টেন, ১৯২৬এ মেজর, আর ১৯৩৪এ লেঃ কর্ণেল। বুখারেষ্টে নেতা পৌঁছেন এর ঠিক পরই।

রুমানিয়ার একটি মেয়েকে বিয়ে করেছেন মূলগন্ধ। দুটি সন্তান। দুটিই মেয়ে। চমৎকার পরিবার। সবাই তাঁদের চেনে বুখারেষ্টে। মূলগন্ধ নামী লোক। নেতা বুখারেষ্টে পৌঁছোতে-না-পৌঁছোতে মূলগন্ধ এসে হাজির। প্রাণ খোলা হাসি আর অমায়িক সৌজন্যে সাথী হয়ে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে। যৌবনের প্রারম্ভে দেশছাড়া। দেশকে ভোলেননি মূলগন্ধ। গীতা পড়েন নিয়মিত। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করেন। হিন্দীর ওপরও দখল কম নয়। ওঁকে দেখে ও পেয়ে নেতা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ওঁর গৃহে কাটল কয়েকটা দিন। মমতা-স্নিগ্ধ একটা মধুর স্মৃতি নিয়ে নেতা রুমানিয়া ত্যাগ করলেন।

রুমানিয়া যাবার আগে নেতা গিয়েছিলেন পোল্যাণ্ডে। পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করেছে সম্প্রতি। কিছুদিন আগেও ছিল পরাধীন। পরাধীনতার জ্বালা আর বেদনা তাই ওর অজানা নয়। কেমন করে আর কতখানি বুকের রক্ত ঢেলে স্বাধীনতা পেতে হয়, ও জানে। তাই ও ভারতের মুক্তি-আন্দোলন সাগ্রহে লক্ষ্য করে চলেছে। ভারতের মুক্তিব্রতীকে তাই ও শ্রদ্ধা করে। সুভাষচন্দ্রকে পোল্যাণ্ড শুধু সমাদরই জানাল না,—সাক্ষাতের পরক্ষণেই ভালোও বেসে ফেলল।

আগে থেকেই নেতার কতিপয় বন্ধু ওখান থেকে নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। নেতা আসবেন জেনে ওঁরা পুলকিত হয়ে উঠলেন। নেতার অভ্যর্থনায় ওঁদের উৎসাহের অবধি নেই। পোল্যাণ্ডের নানাস্থানে ওঁরা নেতাকে নিয়ে গেলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন নানা প্রতিষ্ঠান আর সমিতির সঙ্গে। পোল্যাণ্ডের পল্লীজীবন দেখাতেও ছাড়লেন না। নেতা গেলেন গ্রামের কৃষি বিদ্যালয়ে। হাতে-কলমে

ওখানে ছেলেমেয়েদের সব শেখানো হয়। অতি আধুনিক আর বৈজ্ঞানিক প্রথায় কেমন করে কৃষি আর কৃষক-জীবনের আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর, তার পরিচয় পেলেন নেতা।

এখানেই নেতার সঙ্গে দেখা হয় এক গ্রাম্য বৃদ্ধার। থুরথুরে বুড়ী। মুখের হাসি কিন্তু মিইয়ে যায়নি। বলি-রেখায় ঢাকা সেই মুখের হাসি নেতাকে মুগ্ধ করে। বুড়ী ভারত সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞেস করেন। জিজ্ঞেস করেন মহাত্মাজির কথা। তিনি ভালো আছেন তো? কোথায় আছেন তিনি? কী করছেন? নেতা বিচলিত হয়ে ওঠেন। মা। সার্বজনীন মা চিরদিনের মা। বিশ্ব জননী। এদের জাত নেই। দেশ নেই। ভূগোলের সীমা-রেখা পাঁচিল গাঁথে না এদের মনে। এরা আকুল হয়ে বলে বেড়ায়,—সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া।

পোল্যাণ্ড নবযুগের ডাকে সাড়া দিয়েছে। উঠে-প'ড়ে লেগেছে দেশ শিল্প-সম্ভারে ভরে তুলতে। ওরই গায়ে-ঘেঁষা জার্মেনি। নিছক একাগ্র সাধনায় জাতটা কতই-না এগিয়ে গেছে। সেও পেছনে পড়ে থাকবে না। সব চাইতে বেশি জোর দিয়েছে পোল্যাণ্ড বস্ত্র-শিল্পের ওপর। লজের বস্ত্র-শিল্প ইউরোপে নাম করা। লৌহ আর ইস্পাত শিল্পও উন্নতির পথে।

ওয়ারস্যতে একটি প্রাচ্য সমিতি আছে। প্রাচ্যের নানা দেশের কৃষ্টি আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই সমিতি আলোচনা করে, গবেষণা করে। নেতা ওখানে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। ভারত-পোল্যাণ্ড মৈত্রী-সমিতি গড়বার কল্পনা নেতার মনে জাগে। সমিতির সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেন নেতা।

ওখানকার ছাত্র-সমাজ বেশ সজাগ। কৌতূহলীও। ওরা শুধু স্কুল-কলেজের সীমানার মধ্যে আটকা প'ড়ে থাকে না। খোঁজ রাখে চারদিকের। নানা দেশের। নানা বিষয়ের। ভারতবর্ষও বাদ যায় না। নেতাকে পেয়ে ওরা খুশিতে ভরে ওঠে। ভারতের কত কথা

ওরা জানতে চায়। জিজ্ঞেস করে ছাত্রদের কথা। যুব সঙ্ঘের কাজ। ওদের সমিতির নাম 'লিগা' (Liga)। অনেক দেশের ছাত্র আর যুব-সমিতির সঙ্গে ওদের যোগ আছে। প্রত্যেক দেশের ভার রয়েছে এক-একটা শাখার ওপর।

এই পোল্যাণ্ডেই নেতার সঙ্গে পরিচয় হয় অধ্যাপক মাইকালাস্কির সঙ্গে। ষ্টালিস্‌ল্য এফ, মাইকালাস্কি। এই জ্ঞান তাপস সারা জীবন কাটিয়েছেন সংস্কৃত ভাষা, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য আর ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায়। ওয়ারস্যর বিখ্যাত বিজ্ঞান-সমিতির প্রাচ্য-বিভাগ এঁরই সৃষ্টি। আশ্চর্য এই মানুষটি। নেতা অধ্যাপককে দেখেন আর ওঁর চোখের ওপর ভেসে ওঠে প্রাচীন ভারতের ছবি। ঋষির ছবি। তেমনি স্বচ্ছ, সুন্দর আর ধীদীপ্ত অবয়ব। মৃদুকণ্ঠের সুরে রয়েছে গানের গমক। সামগানের। গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ গাথা নিয়ে বই লিখেছেন এক গাদা। গড়ে তুলেছেন ভারত সম্বন্ধে এক পাঠাগার। দুশোর ওপর ভারতীয় পুস্তক সংগ্রহ করেছেন। তার অনেকগুলো সংস্কৃত ভাষায় লেখা। আধুনিক সাহিত্যও বাদ যায়নি। পোল্যাণ্ড থেকে নেতা লিখেছিলেন,—

"অধ্যাপকের আতিথেয়তার তুলনা নেই। কী আদর আর যত্ন করেই-না আমাকে খাওয়ালেন। ওঁর লেখা আর ওঁর দেয়া-খাদ্য দুটিই সমান উপাদেয়। খাবার শেষে ভোজন-দক্ষিণা থেকেও বঞ্চিত হইনি। ফেরবার পথে গাড়ীতে তুলে দিলেন এক গাদা বই,—ওঁরই লেখা।"

ইউরোপে নেতার পুরোপুরি স্বাধীনতা ছিল না। ইংলণ্ড, রাশিয়া, জার্মেনী এবং আমেরিকায় যাবার অনুমতি পাননি। পরবর্তী সময়ে অবিশ্যি জার্মেনীতে যাবার অনুমতি মিলেছিল। ইংরেজ ইউরোপে সুভাষচন্দ্রকে থাকবার অনুমতি দিয়েও স্বস্তি পায়নি। এই বিপজ্জনক ব্যক্তিটির জন্যে ইংরেজের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। কোথায় কী করে বসে সুভাষ বোস, এর জন্যে ভারতে থাকতেও ইংরেজের যেমন ছিল সদা সতর্ক দুশ্চিন্তা, ভারতের বাইরে, ইউরোপে থাকবার অনুমতি

দিয়েও খাস বিলিতি সরকার কাটাত তেমনি উদ্বিগ্নতা নিয়ে। কিন্তু চারটি দেশ ছাড়াও দেশ ছিল ইউরোপে। নেতা একটার পর একটা দেখে চললেন। প্রতিটি দেশের ভালো-মন্দ নিবিষ্ট হয়ে দেখলেন উনি। দেখলেন মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন-প্রণালী। মিশলেন নানা ধরনের লোকের সঙ্গে। আর নানা মতের। বভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্য-কলাপ শুধু চোখেই দেখলেন না, অন্তরে গেঁথে নিলেন ওদের ভালোটা।

প্রেগে যখন গিয়েছিলেন, ওখানকার লর্ড মেয়র নিজে সুভাষকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত বিভাগ তন্ন তন্ন করে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন আর নিজের দেশের ঐরকম প্রতিষ্ঠানের কথা তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল। নেতা তখনও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র।

প্রেগের 'ম্যাসারিক হোম', কুষ্ঠরোগীর হাসপাতাল আর অথর্ব-আশ্রম দেখতে নেতা ভোলেন নি। দেখলেন ইউনিভারসিটি আর পিল্‌সনের স্কোডা ফ্যাক্টরী। বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ বেনিসের সঙ্গে নেতার পরিচয় হয় এই প্রেগেই। পরিচয় বন্ধুত্বে পৌঁছোতে দেরি হয় না। দুজনের মধ্যে দীর্ঘ আর নিবিড় আলোচনা হয় নানা বিষয়ের। দশদিন ওখানে কাটিয়ে নেতা ফিরে আসেন ভিয়েনায়।

নয়

কারাগার থেকে গান্ধীর মুক্তি পাবার পরদিন কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি এ্যানের বিবৃতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হল। সকাল বেলার সংবাদ পত্র খুলে কংগ্রেসের কর্মীরাই শুধু নয়, দেশের আপামর সবাই চমকে উঠেছিল সেদিন। সংগ্রাম প্রত্যাহৃত হল। আইন অমান্য আর নয়। ১৯২০ আর একবার শ্মশান থেকে উঠে এল। দেখা দিল

মূর্তি নিয়ে। গান্ধীজি জেল থেকে বেরিয়েই এ-ব্যবস্থা করেছিলেন। (১) কারাগারে অসংখ্য কর্মী। নেতাদেরও অনেকে। সুভাষ নির্বাসনে। জহরলাল তখনও বন্দী।

কারাগারের শোকস্তব্ধ সে-দৃশ্য আজও চোখের সামনে ভাসছে। আমরা বাংলার অনেকেই তখন রাজবন্দী—অর্থাৎ ডেটিনিউ। প্রত্যক্ষ-ভাবে সে-বারের আইন-অমান্য-আন্দোলনের অংশ নেবার সুযোগ আমাদের হয়নি। তবুও মনে হল, সহসা যেন এক অমূল্য সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। পরাজয়ের বিবর্ণ নির্জীব কালীমাখা হতাশায় সবাইএর অন্তর, দেহ, মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম,—মুক্তি নয়, তারই আবাহন,—নিঃশেষ হয়ে গেল।

আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজি গভর্ণমেন্টের কাছে বিনীত নিবেদন জানালেন। জানালেন অর্ডিন্যান্স-গুলি উঠিয়ে নিতে, আর সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিতে। আবেদন নিষ্ফল হল। শক্তিহীন সংগ্রামত্যাগী গান্ধীর কথা শোনবার আবশ্যকতা আর নেই। প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। পরাজিত প্রতিপক্ষের সর্ত নেই। আত্মসমর্পণের সর্ত থাকতে নেই।

মহাসাগরের ওপার থেকে সংগ্রামী ভারতের কণ্ঠ গর্জে উঠল। গর্জে উঠল বজ্র গম্ভীর নাদে। পাশে ছিলেন আর একটি মানুষ। জ্যান্ত মানুষ। ক্ষুরধার বুদ্ধি, সহজাত রাজনৈতিক প্রতিভা আর দেশপ্রেম এই মানুষটিকে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে শুধু অসামান্যতাই দান করে নি, করে তুলেছিল প্রায় অতুল্য। ১৯২২এ গান্ধীর খেয়ালে আর-একবার সত্যাগ্রহ প্রত্যাহৃত হয়েছিল। ঠিক এমনি কালো অন্ধকার নেমে এসেছিল সমগ্র জাতির চোখের ওপর। একটিমাত্র লোক বজ্রমুষ্টিতে

(১) মহাত্মাজিকে মুক্তি দিলেই আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবে, একথাটা ইংরেজ-সরকার আগে থেকেই জানতে পেরেছিল বলে অনেকেই অনুমান করেছে। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলস, ১৯২১—৩৪, ৩৬২ পৃঃ

সেদিন নিজের প্রাণের অম্লান শিখার মশাল ধারণ করে দাঁড়িয়েছিলেন। দাঁড়িয়েছিলেন শোক-মুহ্য জাতির পুরোভাগে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (১)। আর তাঁর চারপাশে যাঁরা সেদিন এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বিঠলভাই ছিলেন তাঁদেরই একজন। বিঠলভাই প্যাটেল। কেন্দ্রীয় আইন সভার সভাপতি। স্পীকার। নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্য উপেক্ষা করেও গিয়েছিলেন আমেরিকায়। গোটা তিনমাস নিরবচ্ছিন্ন প্রচার চালিয়ে ফিরে এসেছেন ভিয়েনায়। দেহ আর রাজী নয় দাঁড়াতে। অচল দেহ। ভগ্ন দেহ। সুভাষের পাশে এসে দাঁড়ালেন ভিয়েনায়। ওঁর দিকে চেয়ে দেখলেন। দেখলেন অপলকে। চিনলেন। ওঁর ভেতর দেখলেন ভবিষ্যৎ। মূর্ত ভবিষ্যৎ। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। স্বীকার করে নিলেন বিপ্লবী ভারতকে। অনাগত মুক্তির দূতকে। দুজনের মিলিত বিবৃতি হুঙ্কার দিয়ে উঠল ভারত মহাসাগরের ওপার থেকে।

১৯৩৪এর আগষ্ট মাসে মুক্তি পেলেন জহরলাল। ১২ই আগষ্ট। পরদিন চিঠি লিখলেন মহাত্মাজিকে। (২)

আনন্দ ভবন, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৪

প্রিয় বাপু,

আমি খুবই ক্লান্ত। সারাদিন সময় পাইনি। মধ্যরাত্রে আপনাকে চিঠি লিখছি।…(জেলে বসে) যখন শুনলাম, আপনি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন, আমি ব্যথা পেয়েছিলাম। সংক্ষিপ্ত

(১) "স্বরাজ্য দলই বর্তমান সময়ে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী।" ২৬-৭-২৫ তারিখ। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহনের মেয়র-নির্বাচন উপলক্ষে গ্রাণ্ড হোটেলের সভায় প্রদত্ত গান্ধীর বক্তৃতা থেকে।

(২) ডাঃ পট্টভি তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ৫৬৪পৃষ্ঠায় জহরলালের মুক্তির তারিখ দিয়েছেন ৩০শে আগষ্ট। কিন্তু জহরলালের চিঠি প্রমাণ করছে যে, ওটা ভুল। তারিখটা হবে ১২ই আগষ্ট।

সংবাদটাই শুধু সেদিন জানতে পেরেছিলাম। অনেক পরে আপনার বিবৃতি পড়লাম। জীবনের কঠোরতম আঘাত আপনার বিবৃতি আমাকে দিয়েছে।...সহসা মনে হল, আমার অন্তরের ভেতরকার কী যেন ভেঙ্গে গেছে। জীবনে যে-আকর্ষণ ছিল আমার সব চাইতে প্রিয়, —ছিঁড়ে গেছে।...জগতের বড় বড় সংগ্রামের ভেতরও পশ্চাদপসরণ এবং সাময়িক পরাজয় আমরা দেখতে অভ্যস্ত। এতেও আঘাত লাগে কিন্তু তা একান্তই সাময়িক। আদর্শের অগ্নিশিখা যদি স্তিমিত না হয়ে পড়ে, লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, সংগ্রামের মোড় ফিরতে বিলম্ব ঘটে না। কিন্তু আমি যা আজ দেখছি, তা সাময়িক পশ্চাদপসরণ বা পরাজয় নয়, নৈতিক পরাজয়। আর সব চাইতে ওটাই সর্বনেশে মারাত্মক।...আজ অকস্মাৎ এমন একদল লোক কংগ্রেসের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে, যারা সংগ্রামের সময় পদে পদে আমাদের বাধা দিয়েছে, আমাদের যাত্রা-পথ করেছে বন্ধুর, সংগ্রামের ধারে কাছেও যারা ঘেঁষেনি কোনও দিন, সর্বোপরি আমাদের চরম সঙ্কট মুহূর্তে প্রতিপক্ষের সঙ্গে করেছে সহযোগিতা। আমাদের মুক্তি-মন্দিরের তারাই হয়েছে আজ পুরোহিত। আর সেই সব বীর সৈনিক, যারা সেদিন দুর্বিপাক আর আপদকে মাথায় করে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তারা মন্দিরে ঢোকবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঐসব পুরোহিত পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে একটি কথা বললে বা তাদের কাজের সমালোচনা করলে কারও নিস্তার নেই। ও-কাজ যে করতে যাবে, তাকে বলা হবে বিশ্বাসঘাতক। তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়া হবে চিরতরে। তার কাজে নাকি পুজোর বিঘ্ন ঘটে। ঐক্য আর মিলনের ছন্দে পড়ে ছেদ!...

স্বাধীনতার ধ্বজা সাড়ম্বরে আর উৎসবের সজ্জায় বহন করে চলেছে আজ তারাই, যারা আমাদের চরম সংঘর্ষের সময় একদিন ঐ পতাকা শত্রুপক্ষের নির্দেশে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে, যারা উচ্চকণ্ঠে একদিন চিৎকার করে বলেছিল যে, রাজনীতির পথ তাদের জন্যে নয়। রাজনীতির পথ আজ সুগম আর নিরাপদ। আর

তাই সকলের আগে তারাই ঝাঁপাঝাঁপি করে পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।...

বাংলার কংগ্রেসের দিকে চাইলে কী মনে হয়? এই কথাই কি মনে হয় না যে, ওটা নলিনীরঞ্জন সরকারের ব্যক্তিগত জীবন সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী করবার একটা প্রতিষ্ঠান বা সোসাইটি? অথচ এই নলিনীরঞ্জন সরকার যত-সব সরকারী কর্মচারীদের আদর ও আপ্যায়ন করবার কোনও সুযোগ পেলে উল্লসিত হয়ে ওঠেন প্রচুর। এই ভদ্র লোকটিই সরকারী স্বরাষ্ট্র বিভাগের হোমরা-চোমরাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন সতৃপ্ত অন্তরে। এমনি আরও অনেকেরই উনি তোয়াজ করে চলেন। আর এটা ঘটেছিল কখন? আমরা প্রায় সবাই যখন ছিলাম লৌহ কারার অন্তরালে, সংগ্রাম যখন চলছিল অব্যাহত। কিন্তু এটা শুধু বাংলার কথা নয়। সর্বত্রই এমনি দৃশ্য আর ঘটনা দেখা যাবে। কংগ্রেসের আগাগোড়া একটিমাত্র কাজে আজ মেতে উঠেছে। নির্বাচনের কাজ। কংগ্রেসকে আজ 'ককাস' (ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলীয়চক্র) ছাড়া আর বলা কিছু চলে না।। সুবিধাবাদের আজ জয়-জয়কার।...ইতি

আপনার স্নেহধন্য জহর (১)

চিঠি নয়। ইতিহাস। মর্মান্তিক ইতিহাস। আর লিখেছেন বিক্ষুব্ধ, মর্মপীড়িত সদ্য কারামুক্ত জহরলাল। লিখেছেন গান্ধীকে। সত্যাগ্রহ, কংগ্রেস তথা সমগ্র দেশের ভাগ্য নিয়ন্তা গান্ধীকে।(২)

গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করেই ক্ষান্ত রইলেন না। তাঁর আদেশে কংগ্রেস ভেঙ্গে দেওয়া হল। দেওয়া হল নতুন করে কংগ্রেসকে তাঁর আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী আর মতবাদের দিকে লক্ষ্য রেখে গড়ে তুলতে।

(১) বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটার্স —১১২ পৃঃ।

(২) জহরলালের এই চিঠিখানার একটা সার্বজনীন রূপ ও স্থায়ীমূল্য আছে। প'ড়ে মনে হয়, আজকার দিনেও এ-চিঠি কতখানি প্রযোজ্য ও সত্য।

যে-কংগ্রেস হবে সত্যের পূজারী, সকল প্রকার অন্যায়, দুর্নীতি আর গোপনীয়তা থেকে মুক্ত। জহরলালের পরই কারামুক্ত হলেন নরীম্যান। উনি ছিলেন বম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। ১৯৩০ থেকে ছিলেন ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য।

বাইরে বেরিয়েই নরীম্যান যে-কঠোর ও অপ্রিয় বিবৃতি প্রচার করলেন, তার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেল গান্ধী-নেতৃত্বের দুর্বলতা, তাঁর নীতি ও মতবাদের অসামঞ্জস্যতা আর গান্ধী-চক্রের স্বরূপ। ওয়েলিংডনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন গান্ধী। ওয়েলিংডন রাজী হননি! এই প্রত্যাখ্যান উল্লেখ করে নরীম্যান বললেন,—"ওটা সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রার্থনা, না, মৃত্যু?"—Interview or death?

গান্ধীজি বড়লাটের প্রত্যাখ্যানের পর ব্যক্তিক আইন অমান্য (Individual satyagraha) অনুমোদন করেছিলেন এবং তাঁর কিছু সংখ্যক ভক্ত নিয়ে ওটার পরীক্ষাও চালিয়েছিলেন কিছুদিন। নিজেও কারাবরণ্ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ তাঁকে কারাগারে বেশি দিন থাকতে দেয় নি। মুক্তি দিয়েছিল। এর উল্লেখ করে নরীম্যান বলেছিলেন—"ব্যক্তিগত ভাবে আইন অমান্য করবার জন্যে কংগ্রেসের অনুমতির প্রয়োজনীয়তা কি আবশ্যিক? ওতো যে-কেউ করতে পারে আর যখন-তখন। সেই আদিম কাল থেকে যে-কেউ যখনই ইচ্ছে করেছে আইন ভেঙ্গেছে, আর তার জন্যে সাজাও বরণ করে নিয়েছে।"

কিন্তু গান্ধীবাদ একথা স্বীকার করে না। গান্ধীর নির্ভেজাল অসপত্ন অহিংসা আর সত্যনিষ্ঠা সামগ্রিক সত্তায় বিশ্বাসী নয়। এককত্বের পূজারী গান্ধী। ব্যক্তি তাঁর কাছে সর্বস্ব। সমষ্টি নয়। একটি মানুষ তার ত্যাগ আর কৃচ্ছ্রতার মাধ্যমে জগতের সকল গ্লানি ও দুর্নীতি পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে।—continuance of one person ensures revival into such an irripressible mass move-

ment as no amount of repression will suppress (১) এক জন যিশু, একজন প্রহ্লাদ,—তাদের পাশে একদা আর একটি নাম যুক্ত হবে,—একজন গান্ধী। নরীম্যান বলে ওঠেন,—"এই এক-ব্যক্তি-বাদ যদি সত্য হত, ম্যাক্‌সুইনী আর যতীনদাশের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষ আর আয়র্লণ্ড রূপান্তরিত হয়ে যেত। বহুর পক্ষে জাতীয় সংগ্রামে যোগদানের প্রয়োজনীয়তাও থাকত না। হৃদয় পরিবর্তনের মত একটা অবাস্তব ও অযৌক্তিক দুরাশাই এই ভ্রান্তির জন্মদাতা।"

"How can we induce Gandhijee to rid himself of this almost incorrigible habit…this perpetual blundering and blending of religion and politics?" গান্ধীজির এই অসংশোধনীয় মনোভাবের প্রতিষেধক কোথায়? রাজনীতি আর ধর্মের জগাখিঁচুরি আর তার ভুল-ভ্রান্তির ছেদহীন পরিক্রমা, এর থেকে জাতি পরিত্রাণ পাবে কবে? কেমন করে?

"উপায় আছে।" নরীম্যান বলতেই থাকেন,—"গান্ধীর চারপাশ ঘিরে রয়েছে ঐ-যে ভৈরবীচক্র, স্বাধীন সত্তাহীন কতকগুলি কলের পুতুল, গান্ধীকে দেখে দেখে যারা মাথা নাড়ে, কথা কয়, সায় দেয়, ওদের স্থানে যদি এমন একটি মানুষ পাওয়া যেত, যার ব্যক্তিত্ব আছে, যে সোজা কথা সহজ করে বলতে পারে, আর যার আছে রাজনৈতিক মস্তিষ্ক।"

গান্ধী আর তাঁর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে কেউ নিস্তার পায়নি। নরীম্যানও পাননি। পরবর্তীকালে এর জন্যে বম্বে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব তাঁকে হারাতে হয়েছিল। ১৯৩৭এর মন্ত্রিত্ব তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। (২)

(১) জুলাই মাসে গান্ধীজি যে-বিবৃতি দেন তার অংশ।

(২) "বেচারা নরীম্যান! কংগ্রেসের কর্তাদের বিচার ওঁকে ধরাশায়ী করতে কালবিলম্ব করল না। নরীম্যানের দেশসেবার পথে নেমে এল কালো যবনিকা।" ইণ্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রীডম—আজাদ, ১৬ পৃঃ

কিন্তু এহো বাহ্য। মোদ্দা কথা সবাই বুঝল, কংগ্রেস ভেঙ্গে গেছে। সংগ্রামমুখী কংগ্রেসের আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে নেতারা ঝুঁকে পড়লেন কাউন্সিলে ঢোকবার জন্যে। ১৯৩৪এর রাঁচী-সম্মেলনে মহাত্মাজির আশীর্বাদ নিয়ে নেতারা কাউন্সিলে ঢোকবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। (১)

অতীত আরও একবার জ্যান্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। ১৯২০ থেকে ১৯৩৪, চোদ্দ বছর পর যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, দেখা গেল নেতারা সেইখানেই শক্ত হাতে খুঁটি চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

কংগ্রেসের এ-পরিণাম নেতা চোখে দেখতে পেয়েছিলেন। ১৯২৮ থেকে বার বার তাই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ভেতর এমন একটা আদর্শ দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, যার ফলে একদিকে এই প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে সংগ্রামমুখী, আপোষ বিরোধী আর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতীক ; এই কংগ্রেসই জাতিকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে পূর্ণ স্বাধীনতার অটুট সঙ্কল্পে। অন্যদিকে যারা দুর্বল, সংশয়ী, মধ্যপন্থী, তারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবে। করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। তার পূর্বেই গান্ধী আঁটঘাট বেঁধে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কংগ্রেসের ভেতরে পূর্বাহ্নেই এমন একটি দল তিনি গড়ে তুলেছিলেন, যা ছিল দুর্ভেদ্য। দুর্গের মত। একটার পর আর একটা বেষ্টনী। প্রথম শ্রেণীর দলে ছিলেন প্রায়-প্রত্যেক প্রদেশের নামজাদা এক-একজন। একে ঘিরে ছিল কাটুনি সঙ্ঘ, গ্রামোন্নয়ন সমিতি, মায় গোরক্ষা সমিতি। সকলের পেছনে ব্যবসায়ী, ধনী, পুঁজিপতির দল। এরাই দলের স্তম্ভ। বোনেদ। রশদদার।

(১) ডাঃ আন্সারীর বিবৃতি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহাত্মা গান্ধীর সর্বথা ও স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্যে কাউন্সিলে ঢোকবার পথে কংগ্রেসের ভেতরকার সকল বাধা ও বিরোধের অবসান হয়ে গেল…। ডাঃ পট্টভি—কংগ্রেসের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৫৭০ পৃঃ

বোস-প্যাটেল বিবৃতির ভেতর দ্ব্যর্থতার বিন্দু-বিসর্গ বাষ্পও ছিল না। ছিল না কোন সস্তা উচ্ছ্বাস। কোন ভাব-প্রবণ কাব্য। প্রাণ নিঙড়ে বেরিয়েছিল মুক্তি-পিপাসুর অন্তরের বাণী। প্রাণের মত তা স্বচ্ছ আর বাস্তব।

"বিগত তের বৎসরের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, আমাদের চরম আত্মত্যাগের আদর্শ আর আমাদের প্রতিপক্ষের ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার, এই দুটোর ভিত্তিতে সফলতা লাভ করা সম্ভবপর হবে না। প্রতিপক্ষকে ভালোবসে অথবা নিজেরা চরম দুঃখ বরণ করে আমাদের শাসকদের হৃদয় আমরা জয় করতে পারব, এ-আশাও দুরাশা।

"আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহার করে গান্ধী পরাজয়ই স্বীকার করে নিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ওঁর অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। কংগ্রেসকে চরমপন্থী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলবার সময় এসেছে। এর আদর্শ হবে নতুন, পথও স্বতন্ত্র। একে পরিচালিত করবার জন্যে নতুন নেতৃত্ব, তাই, অত্যাবশ্যকীয়। সমগ্র কংগ্রেসকে এই নবরূপে যদি রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয়, তাই হবে সব চাইতে কাম্য। তা না হলে কংগ্রেসের ভেতরেই এই নব আদর্শের পূজারীদের নিয়ে একটি পার্টি গড়ে তুলতে হবে।" (১)

এক বছরের স্বরাজ-স্বপ্ন যেদিন ভেঙ্গে গেল সেই দিন থেকেই মহাত্মাজি জানতেন যে, তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহের পথে এগিয়ে যেতে ভবিষ্যতে সহসা তিনি রাজী হননি। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, অনভিজ্ঞতা এবং চরম-পন্থার প্রতি স্বাভাবিক ভীতি ও বিতৃষ্ণা দিন দিন তাঁর কার্যকলাপে যে-ভাবে ও যে-পরিমাণে পরিস্ফুট হতে থাকল, তত বেশি করে তিনি তাঁর মতবাদের

(১) বিবৃতি প্রচারিত হয়েছিল ১৯৩৩এর ৯ই মে।

অন্যদিক,—আধ্যাত্মিকতা ও আধিদৈবিক অস্পষ্টতার দিকে ঝুঁকতে লাগলেন। (১)

জনমতের প্রবল চাপে এর পরেও ১৯৩০,'৩১, ও'৩২এ সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্য-আন্দোলনে গান্ধী নেমেছেন। নেমেছেন আপোষের দিকে দৃষ্টি রেখে। অকিঞ্চিৎকর আপোষের ইঙ্গিতে তিনি সংগ্রাম বন্ধ করেছেন। আলোচনায় মেতে উঠেছেন। অধিকাংশ-ক্ষেত্রে বিপক্ষের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। আর এই করতে যেয়ে পথ ও মতের অসামঞ্জস্য ঘটেছে প্রতিপদে।

দশ

প্রেগ থেকে ফিরে এসেছেন নেতা। এসেছেন ভিয়েনায়। নির্বাসিত জীবনের একমাত্র সাথী বিঠলভাইয়ের দেহ আরও অবনতির দিকে। নেতার মনে দুশ্চিন্তা ঘনিভূত হয়ে ওঠে। জন্মভূমি থেকে বহুদূরে এই বিদেশেই কি এই মহৎ জীবনটি নিঃশেষ হয়ে যাবে? নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে যান নেতা। শয্যাশায়ী বন্ধুর পাশে দিনরাত বসে থাকেন। বসে থাকেন একা। মনে কত কথা ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে কৈশোরের কথা, কটকের কথা, কলকাতার

(১) ১৯৩৪এ সহসা গান্ধী স্থির করলেন যে, তিনি আর কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না। এবং এ সম্পর্কে এক বিবৃতিও প্রচার করেছিলেন। অবশ্য এর পরও কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন,—কিন্তু সেটা সূক্ষ্মদেহে। এই বিবৃতির একস্থানে তিনি বলেছেন,—"চোদ্দ বছর পর অধিকাংশ কংগ্রেস সভ্যের নিকট অহিংসা একটা পথ মাত্র (policy), কিন্তু আমার কাছে অহিংসা মূল ধর্ম। ...এরই পরীক্ষায় আমার জীবন উৎসর্গ করেছি।...একে সার্থক করতে হলে পেতে হবে আমায় সর্বপ্রকার বাঁধন থেকে মুক্তি আর আমার কাজের অখণ্ড স্বাধীনতা।...সত্যাগ্রহ আমার কাছে সামগ্রিক জীবনের শাশ্বত নীতি। সত্য আমার ভগবান..."

প্রারম্ভিক জীবন। লোকসেবার ব্রত। বিবেকানন্দের কথা।…প্রতিটি ভারতবাসী তোমার রক্ত, তোমার ভাই…সেই ভাই মৃত্যুশয্যায়।

স্বপ্নাতুর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। চেয়ে থাকেন বন্ধুর রোগজীর্ণ মুখখানির দিকে। প্যাটেলের মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। ভেজা হাসি। অশ্রুতে ভেজা। তিনি বলেন,—"আর দেশে ফেরবার অবকাশ আমার হবে হবে না সুভাষ! আমার দিন শেষ হয়ে এল। দুঃখ ক'রো না। আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল। নতুন করে মুক্তি সংগ্রাম শুরু করতে হবে।"

নেতা বিচলিত হয়ে ওঠেন। সংগ্রাম, কৃচ্ছ্রতার উপাসনা আর দুঃখ বরণের অপার ক্ষমতার পেছনে এই মানুষটির প্রশস্ত বক্ষের এক দুর্জ্ঞেয় কোণে ছিল এক আশ্চর্য সংবেদনশীল অন্তর। মৃদুতম আঘাতেও সেখান থেকে ঝরে পড়ত অশ্রু। অশ্রু-মাখা কণ্ঠে নেতা বলে উঠলেন,—"আপনি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবেন মিঃ প্যাটেল!"

"না। সে-দুরাশা ক'রো না। ও-কথা যাক। ইউরোপের যেখানেই যাবে কর্ম-কেন্দ্র গড়ে তুলতে ভুলবে না। যে-কাজ শুরু করেছ,—চালিয়ে যাও। ডাবলিনে আমি একটা সংঘ গড়ে এসেছি। ওটাকে শক্তিশালী করে তুলো। আমেরিকাতেও কিছু করেছি। যোগাযোগ রেখো।"

এমনি কত কথা হল সেদিন। কিন্তু কথা ফুরিয়ে যেতে বেশিদিন লাগলও না। অফুরন্ত স্নেহসিক্ত আশীর্বাদে সুভাষকে ভরে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন কর্মবীর। মৃত্যুর পূর্বে বিদেশে প্রচার-কাজ চালাবার জন্যে এই দেশহিতব্রতী সুভাষের নামে একলক্ষ টাকা উইল করে গেলেন।(১)

(১) সত্যাগ্রহী ও গান্ধী-শিষ্য বল্লভভাই প্যাটেল ভ্রাতার মৃত্যুর পর আদালতের সাহায্যে এই উইল না-মঞ্জুর করিয়েছিলেন।

নির্বাসিত জীবন হয়ে উঠল নিঃসঙ্গ। বাইরে ছুটে বেরোতে চাইছিলেন নেতা। সুযোগও মিলল। আমন্ত্রণ এল নানা দেশ থেকে। ফ্রান্স থেকে এল। এল রোম থেকে। এল খাস বিলেত থেকে। ওখানকার ভারতীয়েরা সর্বদলীয় এক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচন করল সুভাষচন্দ্রকে। কিন্তু ইংরেজ সরকার ইংলণ্ডে যাবার অনুমতি নেতাকে দিল না।

কিন্তু আশ্চর্য, জহরলালকে ইংরেজ বাধা দেয়নি! যেতে দিয়েছে। আর সমাদরও কম করেনি। সমাদর জানিয়েছে অনেক বড় আর অভিজাত ইংরেজ। লর্ড ও রক্ষণশীল দলের অনেক সদস্যও হাত বাড়িয়েছে। পত্নী কমলা দেবী অসুস্থা হয়ে জার্মান স্বাস্থ্য-নিবাসে ছিলেন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই জহরলাল চলে আসেন ইউরোপে। নিমন্ত্রিত হয়ে যান ইংলণ্ডে।

বিলেতে গিয়েও কি সুভাষ বোস বিপ্লব বাধিয়ে বসবেন? বিশ্বাস নেই ওঁকে। যে-ব্যক্তিটি নিজের কল্যাণ বিনা দ্বিধায় বার বার মাড়িয়ে চলতে পারেন, জীবনের কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ভোগ লিপ্সাই যাঁর মোহ জাগাল না এতদিনেও, সেই লোকটিকে ইংরেজ ভরসা করবে কিসের জোরে? বিপ্লবই বড় কথা নয়,—ঐ-যে শ্রমিক দল রয়েছে, ওদের হাতে আবার কখন-যে ক্ষমতা যেয়ে বর্তাবে, তার তো নিশ্চয়তা নেই। সুভাষ বোসকে ঐ দলের অনেকেই পছন্দ করে, আর অনেকে করে শ্রদ্ধা। গান্ধী আর জহরলালকে নিয়ে খুব বেশি ভয়ের কারণ আর হয়তো দেখা দেবে না। ও-দুজনকেই ইংরেজ চেনে। জানেও। কিন্তু এই একগুঁয়ে মানুষটি শুধু তো দুর্বোধ্য নয়,—ভয়ঙ্করও। ওঁর হাতে কোনদিন ক্ষমতা এলে ইংরেজের সঙ্গে উনি খুব বেশি মধুর সম্পর্ক রাখতে চাইবেন, একথা মনে করবার মত নজির ওদের জানা নেই। সুভাষ বোসকে ইংরেজ পছন্দ করবে কোন প্রত্যাশায়?

নেতা সভাপতির অভিভাষণ পাঠিয়ে দিলেন ডাকে। ডাঃ কিরণ

ভট্টাচার্য ঐ-অভিভাষণ প্রকাশ্য অধিবেশনে পাঠ করেন।(১) অভি-ভাষণের ছত্রে ছত্রে আগামী কালের সুভাষ ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে প্রদীপ্ত হয়ে। নেতা নতুনের সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে চেয়েছেন আগামীকাল। বর্তমানকে করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ, ইংরেজ রাজত্বের শক্তি ও দুর্বলতা, জাতীয় সংগ্রামের দায়িত্ব, তার অসঙ্গতি, তার নবতম আধুনিক প্রয়োজনীয়তা,—একের পর এক সূক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ফুটে উঠেছে নেতার অভিভাষণে। আর নেতা যে-বলিষ্ঠ ও নির্ভীক বাণী উচ্চারণ করেছেন, শুধু ভারতবর্ষে নয়, সর্বদেশে ও সর্বকালের পরাধীন দেশের মুমুক্ষু কণ্ঠে তা ধ্বনিত হবার যোগ্য।

"১৯৩২এর জানুয়ারী পর্যন্ত সত্তর হাজার ভারতবাসী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাছাড়া আরও নানাভাবে সমগ্র দেশ ইংরেজের বিরুদ্ধতা করছে। এ সত্ত্বেও ইংরেজ এ-কথা বলতে পারে যে, তার সামরিক শক্তি আজও অনুগত, তার পুলিশের ভক্তি ও বিশ্বাসের তুলনা নেই, তার শাসন-যন্ত্র চলেছে অব্যাহত, রাজকর্মচারী ও রাজকীয় সম্পদ শুধু অক্ষতই নয়, তার ছত্র-ছায়ায় সর্বথা নিরাপদও এবং এ-গর্বও ইংরেজ করতে পারে যে, ভারতবাসীর নিষ্ক্রীয় বিরুদ্ধাচরণের সে পরোয়া করে না। ইংরেজের এই মনোভাব আর তার অস্তিত্ব হয়তো আরও অনেকদিন এমনি অটুটই থাকবে যদি আমরা অস্ত্রের সাহায্যে অথবা আর্থিক অবরোধের দ্বারা ইংরেজ-সরকার আর তার পৃষ্ঠপোষকদের জীবন ভীতিপ্রদ, অচল আর অতিষ্ঠ করে তুলতে না পারি। অসহযোগিতা বা আইন-অমান্য-আন্দোলন এ কাজ করতে পারেনি।"

প্রাজ্ঞ বিচার ও বিশ্লেষণের এই অনুত্তেজিত নির্দেশের ভেতর

(১) সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়েছিল লণ্ডনের ফিয়ার্স হলে, ১৯৩৩এর ১০ই জুন।

ভাবপ্রবণতা বা সস্তা উচ্ছ্বাসের স্থান নেই। অদূর ভবিষ্যতে গান্ধীবাদ ও গান্ধী-নেতৃত্বের ব্যর্থতার ওপর আগামীকাল যে-বৃহৎ ও অনিবার্য মহাবিপ্লবের ধ্বংস ও নবসৃষ্টির সম্ভাবনা রচনা করে তুলবে, এই অভি-ভাষণে রয়েছে তারই সূত্ররূপ। বিপ্লবোত্তর ভারতবর্ষের মহিমময় পরিণতি রূপ পেয়েছে নেতার অবিনাশী কণ্ঠে আর দৃষ্টিতে। নেতা বলে চলেছেন,—"মুক্ত ভারত কোনক্রমেই পুঁজিপতি, ভূস্বামী আর উচ্চ জাত্যাভিমানীদের মুঠোয় ভরা দেশ হবে না। এ-ভারত হবে সমাজও রাজনীতি নির্বিশেষে গণ-তান্ত্রিক।"

আর এ-কাজ করতে হলে যে বিপুল শক্তি ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজন, তা পেতে হলে একদল কর্মীকে খুঁজে বের করতে হবে,—তৈরী করে তুলতে হবে,—"যারা কোন রকম ত্যাগ ও দুঃখ বরণকেই বড় করে দেখবে না, শুধু এগিয়ে যাবে অভিষ্টের সার্থক অভিযানে।" এদের নিয়ে গড়ে উঠবে "সাম্যবাদী সংঘ"। নেতার কল্প-লোকের নতুন দল।

অভিভাষণ পড়ে ও পার্টির নাম শুনে বিলেতের টোরীরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। নানা সংবাদ পত্রে বেরোল কঠোর সমালোচনা। নেতার ইউরোপের সফর আর কাজকর্ম ওরা আগে থেকেই সন্দেহের চোখে দেখছিল।

সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে সেদিন ইংরেজ যে প্রচার চালিয়েছিল তা শুধু জঘন্য বলেই ঘৃণ্য নয়,—আঁতে ঘা লাগলে ইংরেজ কতখানি মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে, তারও বিচিত্র হদিস তাতে মেলে। নেতা যখন রোমে যান, ইংরেজ অবলীলায় বলে যায়, এই মারাত্মক কমিউনিষ্ট সম্বন্ধে ইটালীবাসী যেন সতর্ক থাকে। যখন চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স বা পোল্যাণ্ডে যান, ইংরেজের বলতে আটকায় না যে, সুভাষ বোস একজন পাকা ফ্যাসিষ্ট। এই কথা বলেই নেতার ইংলণ্ড ভ্রমণের ইচ্ছা ইংরেজ নামঞ্জুর করে দিয়েছিল। রক্ষণশীল দল আর ওদের সংবাদ পত্র দিনকার দিন নেতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে মেতে উঠল।

জেনিভা থেকে নেতা এর জবাব দিলেন। নিজের মতবাদ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার এক অপূর্ব বিশ্লেষণ রয়েছে এই বিবৃতির ছত্রে ছত্রে। "একটা পরাধীন দেশের পক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস জানা যেমন প্রয়োজনীয়, তাদের গঠন শক্তি ও বিভিন্ন মতবাদও ঠিক তেমনি বিচার্য। বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক সংস্পর্শহীন। তার বাণিজ্য, রাজনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা সবই বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ হারিয়ে নিজের ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আজ তার পরিবর্তন এসেছে। সে তাই জানতে চাইবে, দেখতে চাইবে, বুঝতে চাইবে বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারা ও কর্ম প্রণালী। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করতে হবে। যদিও বিশ্বে আজ দুটি মতবাদই প্রাধান্য লাভ করেছে, তবুও একথা বলা মারাত্মক ভুল হবে যে, কমিউনিজম অথবা ফ্যাসিজিমের মধ্যে যে-কোনও-একটা ভারতবর্ষকে বেছে নিতেই হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কোন নীতিই শেষ কথা নয়। মানবের অপার অগাধ সৃজনী শক্তি আছে। তার প্রজ্ঞারও ইতি নেই। প্রত্যেক জাতি বা দেশ তার পারিপার্শ্বিকতা, তার অতীত ইতিহাস, তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী তার সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও সংস্থা গড়ে তোলে। মানব জীবনের ক্রম-বিকাশের ন্যায় ওরও পরিবর্তন আসতে পারে। আর আসেও।" নেতার এ-বিবৃতি শুধু পরিষ্কার নয়,—পরিচ্ছন্নও। কোন কুয়াশা নেই। নেই কোন দ্ব্যর্থতা। আর নেই ভাবের ঘরে চুরি। তিনি আরও প্রাঞ্জল করে তুললেন,—"বর্তমান জগতের প্রচলিত সকল মতবাদের মধ্যে যা সুন্দর, যা ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর, যা কার্যকরী, তাই আমরা গ্রহণ করব। বিশ্বজোড়া চলছে নানা মতবাদের পরীক্ষা আর নিরীক্ষা। এর কোন্‌টা টিকে থাকবে আর কোন্‌টা অবলুপ্ত হয়ে যাবে, তারও তো স্থিরতা নেই। আগেভাগে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের কাছে আমাদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখতে আমার আপত্তি আছে।

জেনিভা থেকে নেতা ফ্রান্সে যান। ইটালীতে যান এসিয়াবাসী ছাত্র-সম্মেলনের ডাকে। সোফিয়া, বুদাপেস্ত, বুখারেষ্ট, আর বেলগ্রেড, —জার্মেনী ছাড়া ইউরোপের অনেকস্থানেই নেতার নিমন্ত্রণ হতে থাকে। সবাই ভারতবর্ষের কথা তার এই নির্বাসিত সন্তানের মুখ থেকে শুনতে চায়। দেখতে চায় নবীন ভারতের বিপ্লবী প্রতিনিধিকে। বুঝতে চায় ভারতবর্ষের আশা আর আকাঙ্ক্ষা।—ইংরেজের জমিদারী ভারতবর্ষ নয়, যে-ভারত সনাতন, যে-ভারত মানব সভ্যতার জননী।

এই নিরবচ্ছিন্ন কর্ম প্রবাহের মধ্যেই চলতে থাকে আরও একটি বিশেষ কাজ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা। হাতের কাছে মাল-মশলা নেই। নেই প্রয়োজনীয় উপকরণ। তবু লেখেন। নিজের স্মৃতি-সমুদ্র উজাড় করে লেখেন।

একা। সঙ্গীবিহীন। ভিয়েনার স্বাস্থ্য-নিবাসের কক্ষে যখন ফিরে আসেন, মাঝে মাঝে মন ছুটে যায় দূরে। ইউরোপের ভূমধ্য-সাগর পেরিয়ে আফ্রিকার ধার ঘেঁষে ছুটে যায় দুটি চক্ষু। ছুটে যায় দেশের বুকে। অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটি ফিরিয়ে পাশে তাকান, নিশ্চল প্রতিমার মত পাশে কর্মরতা একটি নারী,—তার দিকে। মমতায় আকণ্ঠ ভরে ওঠে।

বাক্‌রুদ্ধ সুভাষের দিকে না-চেয়েই শ্রীমতী এমেলী বলে ওঠেন,— "হ্যাঁ, তারপর ?"

তন্দ্রা ভাঙ্গে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে নেতা বলতে থাকেন,—"হিন্দুর কাছে ভারতবর্ষ শুধু একটা দেশ নয়,—তীর্থক্ষেত্র। ভারতবর্ষের নদ-নদী, তার পাহাড় আর অরণ্য, তার সরোবর আর বৃক্ষলতা,—সবই পবিত্র। পূজোর পাত্র। দক্ষিণের সমুদ্র-মেখলা-সেতুবন্ধ থেকে তুষার-কিরীটি-হিমাচলের তুঙ্গ-শৃঙ্গ পরিক্রমার পর এ-তীর্থ-যাত্রা পূর্ণ হয়।" (১)

(১) ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্, ১৯২০—১৯৩৪, ১১ পৃঃ

টাইপ রাইটার চলতে থাকে। বিরামবিহীন। শেঙ্কলের নিরলস আঙ্গুলগুলোর দিকে নেতা চেয়ে থাকেন। বলায় ছেদ পড়ে। চোখের পাতায় জমে ওঠে মায়ার কাজল। শেঙ্কলের কাজ চলতেই থাকে। শ্রীমতী এমেলী শেঙ্কল। সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারী।

দেশ থেকে আসে নিদারুণ বার্তা। পিতা মৃত্যু শয্যায়। ব্যাকুল হয়ে ওঠেন সুভাষ। স্নেহময় পিতার পূর্ণ অবয়ব চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। দীর্ঘ, উন্নত, পৌরুষ ব্যঞ্জনায় গম্ভীর, কঠোর আর কোমলের সমন্বয়ে গড়া ধীমান্ পিতার অবয়ব। বহু পুত্র-কন্যার জনক হয়েও যে-পিতা ক্ষণেকের তরেও কারও প্রতি অমনোযোগী হননি, যাঁর স্নিগ্ধ স্নেহের অযাচিত ছত্র-ছায়ায় শুধু তিনি নিজেকে গড়বার পরিপূর্ণ সুযোগই পান নি, পেয়েছেন নিজের আদর্শ আর লক্ষ্যের দিকে চলবার অবাধ স্বাধীনতা ;—সেই পিতা। আর পিতার পাশে আর একখানি মুখ সব ছাপিয়ে তাঁকে আকুল করে তোলে। তাঁর মা। মা জননী। ছোট্ট এক ফোটা একরত্তি দেহ। সেই দেহের ওপরকার শান্ত মুখখানির ওপর বসানো ছুটি সজল চোখ। বড় বড়। কোমল। বিষণ্ণ আর স্বপ্নাতুর। বহু সন্তানের জননী। বেদনা আর গৌরব এক সঙ্গে বহন করে চলেন নীরবে—প্রতিটি সন্তান মানুষ করবার বেদনা, ওদের জীবন-কোষ পূর্ণ দেখবার গৌরব। সেই মায়ের বৈধব্যের কল্পনায় সুভাষ শিউরে ওঠেন। ছোট্ট কপালের সেই জ্বলজ্বলে সিঁদুর ফোটা মায়ের কপালে আর দেখা যাবে না। তাম্বূল রঞ্জিত ওষ্ঠের সেই স্মিত হাসি চিরতরে বোবা হয়ে যাবে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ে সুভাষের গণ্ড ধুয়ে। আরক্ত মুখ। সোফায় চোখ বুজে পড়ে থাকেন। পাশ থেকে এমেলী চেয়ে থাকেন অনিমেষে। বেদনায় সিক্ত হয়ে ওঠে ওঁরও সমগ্র অন্তর।

জাহাজে যাবার সময় নেই। যেতে হবে ছুটে। উড়ে। বিমানে

উড়ে চললেন নেতা। প্রথম করাচী, সেখান থেকে দমদম। করাচীতেই জানতে পারলেন পিতার অন্তিম প্রয়াণের কথা। দমদমে বিমান থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের এক আদেশ-নামা ইংরেজের পুলিশ ধরল তার চোখের সম্মুখে। কাগজ-খানায় লেখা ছিল :

(১) পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়ীতে সোজা যেয়ে থাকতে হবে ;

(২) বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও যাওয়া চলবে না, সকল সময় বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা নিষিদ্ধ ;

(৩) বাড়ীর লোকজন ছাড়া আর কারও সঙ্গে মেলা-মেশা, চিঠি-পত্রের আদান প্রদান এবং বাক্যালাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ;

(৪) না-খুলে সব চিঠি-পত্র ও তার, ডাকে-পাওয়া বই বা কোনও পার্শেল জমা দিতে হবে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টএর কাছে ;

(৫) স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রেরিত লোক বাস-স্থানে যে-কোনও কাজে গেলে তার গতায়াত ও অনুষ্ঠিত কর্মে বাধা দেওয়া চলবে না ;

(৬) এর যে-কোন ধারা অমান্য করলে সাজা পেতে হবে এবং সাজার পরিমাণ ৭ বৎসর কারাদণ্ড।

সাতটা দিনও কাটল না। গৃহ শোকদগ্ধ। সবাই বিহ্বল। একটা হাহাকার সমস্ত পরিবারের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু মরার ওপর খাঁড়ার ঘা কথাটাও আছে। নেমে এল সেই খাঁড়া। আদেশ এল ফিরে চল দেশ ছেড়ে। মৃত্যুর মতই দুর্বার আর হৃদয়হীন সে-আদেশ। নিস্পৃহ। অবিচল। দেশ ছেড়ে চললেন নেতা। ১৯৩৫-এর ৮ই জানুয়ারী আবার নির্বাসনের অনির্দিষ্ট পথ নেতাকে স্বাগত জানাল। যাবার মুহূর্তে দেশবাসীকে বলে গেলেন,—"অবসাদ আর নির্জীব নিরুৎসাহ সাময়িক। যেমন করেই হোক প্রাণ-বন্যা বইয়ে রাখতে হবে।"

পিতৃবিয়োগের পর

বইয়ে রাখতে হবে অবিরাম। দূরে—আর একটু দূরেই মুক্তির দুয়ার। ঐ রুদ্ধ দুয়ারের ওপারে মুক্তি অপেক্ষা করছে।

এগার

এবার ভিক্টোরিয়া। এখানাও ইটালিয়ান জাহাজ। ১৯৪৫এর ১৩ই জানুয়ারী ভিক্টোরিয়া এসে ভিড়ল এডেনে। আগে থেকেই নেতার আসবার কথা প্রচারিত হয়েছিল। এডেনের অনেক ভারতীয় বাসিন্দা জাহাজ-ঘাটে জমা হয়েছিল। সাদরে ওরা নেতাকে অভ্যর্থনা জানাল। নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল নিজেদের মহল্লায়। নেতার আনন্দের আর সীমা নেই। সব ক্ষোভ নিমেষে মুছে গেল। ইংরেজের বর্বরতার ক্ষোভে বুক ভরে উঠেছিল। সদ্য পিতৃবিয়োগের দগদগে ঘা তখনও মনে। মা-ভাই-বোনদের আকুল কান্না তখনও কানে বাজছিল। তাছাড়া এই অনির্দিষ্ট নির্বাসন : এর শেষ হবে কবে ? কোথায় এর সমাপ্তি ? হবে কি ? কোনও দিন ?

এডেনের সঙ্গে শেষ দেখা ১৯১৯এ। সেদিনকার সুভাষচন্দ্র বসু আই, সি, এস, হতে বিলেত যাচ্ছিলেন। আচ্ছা, আই, সি, এস, না ছাড়লে কী হত আজ ? হয়তো কোন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট—বড় জোর কমিশনার। তাইতো হয়েছে অনেকে। ওঁরই সময়কার আই, সি, এসরা, তাদের মধ্যে জন-কয়েক বান্ধবও আছে—জেলা শাসন করছে। শাসন করছে প্রবল প্রতাপে। ওরা বিচারক। বিচার করছে সুভাষ বোস-দের। দণ্ডও দিতে ছাড়েনি। চোখের ওপর জ্বলজ্বলে ছবি ভেসে ওঠে।

কিন্তু কথাটা মনে হতে হাসিই পায়। সুভাষ বোস আই, সি, এস ! ইংরেজের চাকর। বেতনভুক ভৃত্য ! সে-জীবন সহ্য হত কেমন করে ? ভারতবাসীর চরম আকাঙ্ক্ষা নাকি আই, সি, এস

হওয়া। হবেও বা। পরাধীনতার পঙ্কতিলক। আর তারই গর্ব, জৌলুস, বড়াই! ইংরেজের নিজের হাতে গড়া এই আই, সি, এসরা। ভারত-শাসনের সবচাইতে দামী হাতিয়ার। কপালের তিলক মুছে ফেলে সেই চরম ছাড়পত্র ইংরেজের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বলেই-না ইংরেজের এত আক্রোশ!

সহসা মনের মধ্যে জেগে ওঠে একটা অনাস্বাদিত ভাব-তরঙ্গ। ভবিষ্যতের বিচিত্র কল্পরূপ। গায়ে ওর জ্বালা। চোখে সঙ্কল্পের শিলা-কাঠিন্য। দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে ভারতবর্ষের সীমানা। আরব সাগরের ওপার থেকে এক অপরূপ মাতৃরূপ সুভাষের সমস্ত অন্তর সমগ্র সত্তা কানায় কানায় ভরে দিল। মহাকালের করাল ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে যে-ভারতবর্ষ শত সহস্র শতাব্দীর দুর্বার শাসন অগ্রাহ্য করতে পেরেছে—সেই মৃত্যুঞ্জয়ী, কালজয়ী শাশ্বত ভারতবর্ষ সম্মুখে ফুটে উঠেছে তার সর্ব-কালের, সর্ব-যুগের অপার মহিমা নিয়ে। পদতলে আপন সন্তানেরা তাঁরই স্তব গাইছে। চক্ষু মার্জনা করতে করতে নেতা দেখলেন সত্যি তার চারপাশ ঘিরে রয়েছে ভারতবর্ষের অগণিত মানব-সন্তান।(১)

জয়ধ্বনি আর কোলাহলে তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। চারদিকে ফিরে ফিরে দেখেন নেতা। গায়ে লাগে ওদের গায়ের পরশ। শিউরে ওঠে সারা অঙ্গ। ভারতবাসী। নিজের রক্ত। নিজের ভাই। পরমাত্মীয় বলে মনে হয় সবাইকে। হোক ওরা কুলী, কেরানী বা দোকানদার। ও-পরিচয় অন্যের কাছে।

এডেনের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। ভারতবাসীর সংখ্যা দু' হাজার। এদের মধ্যে কাথিয়াবারের লোকই বেশি। অধিকাংশই ব্যবসাদার। সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে ওরা চামড়া আর কফি সংগ্রহ করে। চালান দেয় ইওরোপে। ওখান থেকে আনে রকমারি শিল্প-

---

(১) ১৯৩৯এর কারাবাস-কালে এই সময়ের কথা বলবার সময় আমি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি, ওঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল।

সম্ভার। কাপড়-চোপড়ই বেশি। গ্রামে গ্রামে বেসাতি করে। শাসনকার্যের ওপরতলার সবাই ইংরেজ। বাদ-বাকী আরবী আর ভারতীয়। কথায় কথায় নেতা সব জেনে নেন।

বেশ বড় গোছের মজলিশ বসে। নেতাকে ঘিরে পিপাসার্তের মতই ওরা উন্মুখ হয়ে ওঠে। দেশের খবর জানতে চায়। নেতা বলতে থাকেন। তন্ময় হয়ে ওরা শোনে। শোনে কংগ্রেসের কথা। সংগ্রামের কথা। মহাত্মাজির কথা। তারপর খানাপিনা। সে এক মহোৎসব। খানাপিনার পর নেতা বেরিয়ে পড়েন সহর দেখতে।

এডেনের শাসন চলত ভারত-সরকারের মারফত। কিন্তু এ-ব্যবস্থা বেশি দিন আর চলবে না। ভারতবর্ষ থেকে এডেনকে পৃথক্ করবার কথা শুরু হয়ে গেছে। নেতা বললেন,—"এ পৃথক্ ব্যবস্থার মূলে রয়েছে রাজনীতির খেলা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও এডেন যাতে ইংরেজের খাসদখলে থাকে এটা তারই সতর্ক ব্যবস্থা।"

এডেন আর সিঙ্গাপুর। ভারতবর্ষের পূর্ব আর পশ্চিম সীমান্ত। দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মত। ইংরেজের অপরাজেয় নৌবহরের ছুটি সুরক্ষিত ঘাঁটি। এ-ছুটো কি হাতছাড়া করা যায়? দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া, চীন, হংকং আর সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্বার্থ। আর এডেন? ইংরেজের প্রাণকেন্দ্র। সুয়েজের মুখ তাকে আগলাতে হবে না? ছ'হাজার ইংরেজ সৈন্য আছে এডেনে। আরও আছে বিরাট বিমান-বহর। ভারতবর্ষ হাতছাড়া হলে অপূরণীয় ক্ষয় ও ক্ষতি তার নিশ্চয়ই হবে; কিন্তু এডেন হারালে?—ইংরেজ মরতে চায় না।(১)

জাহাজে ফিরে এলেন নেতা। জাহাজ চলল সুয়েজের ভেতর দিয়ে। থামল বন্দরে। নেতা নেমে এলেন। সাত মাইল দূরে কায়রো। নেতা কায়রো গেলেন ওখান থেকে। রাতের বেলা। জ্যোৎস্না-ঢালা রাত্রি। দিগন্তবিস্তৃত নীলাভ চাঁদের আলো ঢেলে

(১) এডেন ও মধ্য-প্রাচ্য সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অপূর্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পড়েছে জলের বুকে। ছোট ছোট ঢেউ-ভরা বুক। বুকের ওপর রূপোলী জরীর কাঁচুলি। ঝলমলে। সুয়েজ আর তিউফিক বন্দরের সব আলো ঠিকরে পড়েছে সুয়েজের বুকে। সহর পেরিয়ে মরুভূমির দিক্‌হারা নিঃসীমতার ওপর দিয়ে ছুটে চলল গাড়ী। ঐ মরুর বালু-ঘরে থাকে বেতুইনরা। মরুর চিরসাথী। দু'পাশে বালুর সাগর। বালুর নরম বুকে পড়েছে পাথরের বোঝা। আস্‌ফাল্‌টের প্রলেপ। থেঁতলে-যাওয়া বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছে কঠিন রাজপথ। সোজা। মসৃণ। পথের ওপর ছিটকে পড়ছে পাণ্ডুর চাঁদের ফুটফুটে আলো।(১)

পরদিন সকালবেলা নেতা দাঁড়ালেন পিরামিডের পাদদেশে। কন্‌-কনে তুহিন-শীতল হাওয়া বইছিল। প্রভাতের নির্মেঘ আকাশের নীচে স্পর্ধাভরে দাঁড়িয়ে আছে পিরামিড। অবাক্-বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন নেতা। কত কথাই-না তাঁর মনে পড়ে। মনে পড়ে নেপোলিয়নের কথা। মনে পড়ে ইজিপ্টের অতীত ইতিহাস। টুটেন্‌হাম্। প্রাচীনতম মেম্‌ফিস্ নগর। তার উত্থান আর পতনের কাহিনী।

সীমাহীন বিশুষ্ক মরুর বুকে দাঁড়িয়ে আছে এক নীরব বিস্ময়। দুর্জ্ঞেয়তা আর অনন্ত জিজ্ঞাসার মুখরতা ওর সর্বাঙ্গে। পিরামিড সৃষ্টি করতে গিয়ে মানুষ রচনা করেছে নিজের হাতে নিজের ইতিহাস। অপেক্ষা করেনি কারও জন্যে। কালের ক্ষয় আর অপচয় উপেক্ষা করে নিজেকে করতে চেয়েছে কালজয়ী। উদ্ধত পিরামিড। চির-বিদ্রোহের প্রতীক পিরামিড।

ওদেরই পাশে মিশরের চিরন্তন রহস্যের খনি—স্‌ফিন্‌ক্‌স্, বিপুল পাথুরে দেহ। নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে নবোদিত সূর্যের পানে। সূর্যোপাসক প্রাচীন মিশরের ধ্যানমূর্তি। বোবা পাথর। কেন, কবে, কে রূপ দিয়েছিল এই বিরাট কল্পনার,—কেউ জানে না। বোবা, কিন্তু কথা বলে। বলে পাঁচ হাজার বছরের অতীত কথা।

(১) নেতার 'ইজিপ্ট ভ্রমণ-কাহিনী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
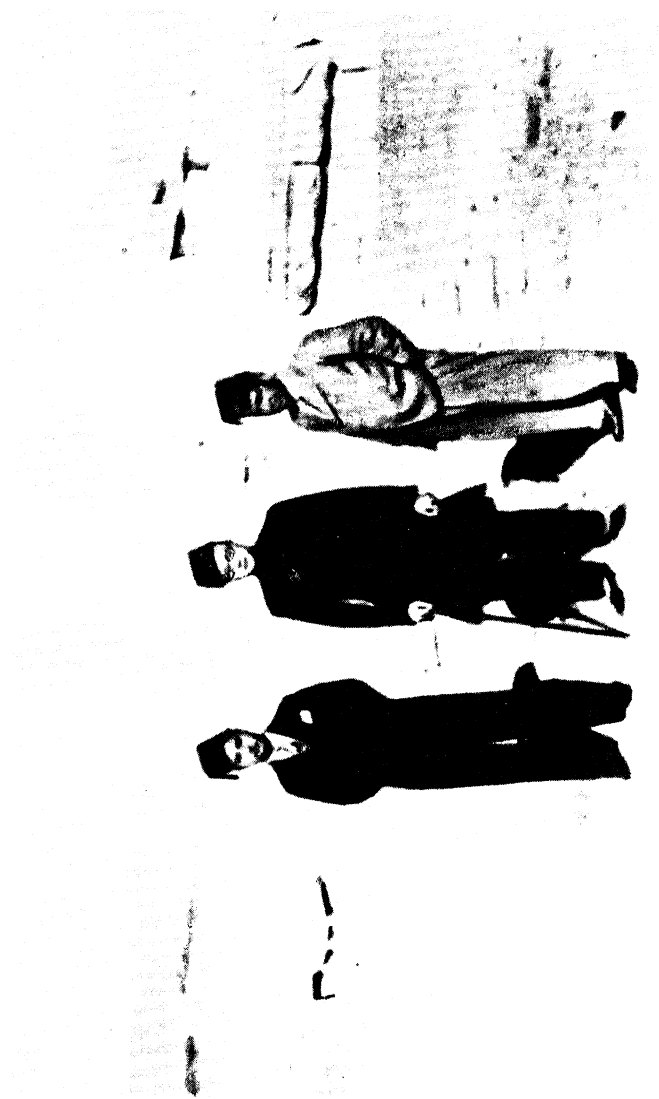
পিরামিডের সম্মুখে

পিরামিড আর স্‌ফিন্‌ক্‌স্‌এর সামনে দাঁড়িয়ে নেতার মনে জাগে ভারতবর্ষের কথা। মিশর তার হারানো পাঁচ হাজার বছরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভারতবর্ষ পারেনি। তার দূর-অতীতের কোনও নিদর্শন নেই। নেই ঋষিদের চিহ্ন। নেই রামায়ণ ও মহাভারতের কোন চিত্ররূপ। সব মুছে গেছে। কিন্তু কেন? প্রশ্ন জাগে নেতার অন্তরে। অতীত বাঁচিয়ে রেখে মিশর পেল কী? কতখানি? আর ভারত?

মরা অতীত বাঁচাতে গেল মিশর, কিন্তু নিজে গেল মরে। প্রাচীন মিশর তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতি, তার ধর্ম আর ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিল বিদেশীর পায়ে। আরবের পায়ে। ভারতবর্ষ অতীতকে অতটা বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু নিজের সবটা হারায়ওনি। তাই সে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লড়াই করতে পেরেছে। আজও লড়াই করেই চলেছে। বেঁচে আছে, আর থাকবেও।

ভারতবর্ষ দেহ চায়নি, চেয়েছিল আত্মা। দেহ তাই ভেঙ্গে গেছে। সে ভুল করেছে। দেহ ছাড়া আত্মা হয়ে ওঠে নিরাশ্রয়। গৃহহীন। নতুন ভারত এ-ভুল যেন আর না করে। নেতা বলে চলেন,—"দেহ আর আত্মার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। কোন জাতই বস্তু উপেক্ষা করে শুধু ভাব নিয়ে বাঁচে না। একটা দুর্বল হলে অন্যটাও আহত হয়। ভারতবর্ষ যেদিন থেকে জাগতিক ক্ষেত্রে দুর্বল হতে শুরু করেছে, তার মনোরাজ্যেও দেউলে-নামা জারি হয়েছে সেইদিন থেকেই। আবার যদি তাকে উঠতে হয় দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে উঠতে হবে। দেহ আর মন। বস্তু আর ভাব। দৈহিক আর পারত্রিক প্রকল্প।"(১)

এই অনেকদিনের পুরোন ইজিপ্টের ওপর দিয়ে কম ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায়নি। নামে মাত্র সে স্বাধীন। তার রাজা আর তার রাজত্বও

(১) সুভাষচন্দ্র লিখিত 'ইজিপ্টের পিরামিড' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শুধু নামে। মালিক সে নয়,—ঐ রাজাও নয়। মালিক ইংরেজ। ইংরেজের সৈন্য আর সাঁজোয়া গাড়ী জাঁকিয়ে বসেছে মৌরশি-পাট্টার বলে। ইউনিয়ন জ্যাক ওড়ে ওর সৈন্যাবাসের চূড়ায়। কিন্তু উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ওর মরা দেহে চেতনা সঞ্চার করেছেন জগলুল। ইজিপ্টের জগলুল পাশা, আর তাঁর জাতীয় দল।

বর্তমান নেতা নেহাস পাশার সঙ্গে নেতার সাক্ষাৎ ঘটে। নেহাস আসেন তাঁর সহকারী নোক্রেশী আর মাক্রাম্ এবিদ্‌কে নিয়ে। নেতা জানতে চান ইজিপ্টের কথা। ওঁরা ভারতবর্ষের। ডুবে যান সবাই আলোচনায়। সমস্যা অভিন্ন। ইংরেজ-বিতাড়নের সমস্যা। দেশের মুক্তি। জাতির জাগরণ আর বলিষ্ঠ বজ্রদৃঢ় বনেদের ওপর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা। এসিয়া ও আফ্রিকার প্রাচীনতম দুটি দেশ আর তাদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা মুক্তিব্রতী দুটি দেশের নেতার ভেতর দিয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভিক্টোরিয়া চলতে থাকে পোর্ট সৈয়দের দিকে।

সুভাষ বোসকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ইংরেজ কতটা ঠকেছে, প্রথমটা ও তা ধারণা করতে পারেনি। দণ্ড দেবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সুভাষকে ইংরেজ বিদেশে যাবার অনুমতি দিয়েছিল। দেশ, আত্মীয়, স্বজন, সর্বোপরি তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন করে রেখে ওঁকে করে দিতে চেয়েছিল পঙ্গু। শক্তিহীন। আর অকর্মণ্যও। এই বিপজ্জনক লোকটিকে দেশে থাকতে দিলে আধ-মরা কংগ্রেসকে উনি কোন্ পথে নিয়ে যাবেন, তার কোন নিশ্চয়তা দিল না। দেশের যুবশক্তি ওঁর কথা শুধু শোনে না, প্রয়োজনে প্রাণটাকে হাতে করে ওঁর সামনে ধরেও দেয়। গান্ধী মেতে উঠেছেন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে, মন্দিরের রুদ্ধদ্বার হরিজনদের সম্মুখে তুলে দিতে। তা ছাড়া হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা তো আছেই। এ-সবই প্রয়োজনীয় কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু। মনে

উদয় হয় আতাতুর্ক কমালের কথা। কী দুর্বিষহ কুসংস্কার, পুঞ্জীভূত সমাজ-জঞ্জাল জমে উঠেছিল ইওরোপের চিররুগ্ন তুরস্কের বুকে। শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছিল ওকে। কমাল জানতেন, বুঝতেন, দেখতেন। আর করতেন অপেক্ষা। স্বাধীনতার অপেক্ষা। শক্তির অপেক্ষা। যেদিন প্রত্যাশিত চাওয়া রূপ নিয়ে ধরা দিল, নিমেষে সব কালো উবে গেল। আলো ফুটে উঠল নবীন তুরস্কের রক্তিম কপোলে।

তৃতীয় গোলটেব্‌ল্‌ বৈঠক সমাধা করে দেশের মাতব্বররা ফিরে এসেছেন দেশের সেবা করে। বিলেতের শ্রমিকদল এ বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠায়নি। কংগ্রেস তো নয়ই।

১৯৩২ থেকেই বাংলার বিপ্লবীরা আক্রমণের নব নব পথে এগোতে থাকে। সরকারও চুপ করে ছিল না। একসঙ্গে গোটা-চারেক অর্ডিন্যান্‌স্‌ জারি করেও ইংরেজ স্বস্তি পায়নি। বিশেষ করে বাংলার জন্যে আরও গোটাকয়েক অর্ডিন্যান্‌স্‌ এবং আইন-সভার সংখ্যাধিক্যের জোরে বিশেষ আইন জারি ও পাশ করিয়ে নিল। এর পর ভারত-সরকার যে বিপুল আর ব্যাপক বিধান জারি করে বসল তা প্রায় সামরিক বিধানের সমতুল। হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা হত্যার চেষ্টা প্রমাণিত হলেই প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হল। প্রয়োজন-মত বাড়ী-ঘর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং আঞ্চলিক জরিমানা ধার্য করবার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হল। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাংলার সশস্ত্র আক্রমণের গতি ও বেগ কমবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস্‌ আর কুমিল্লার পুলিশ সুপারিন্‌-টেন্‌ডেন্ট এলিসন্‌ প্রাণ দিল। স্থানে স্থানে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হল। পাইকারী জরিমানা বসল চট্টগ্রাম, ২৪ পরগণা আর মেদিনীপুরে। ভীত ও সন্ত্রস্ত সরকার আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে চট্টগ্রামের বন্দীদের ও আরও অনেককে আন্দামানে পাঠিয়ে দিল। এর অনেক আগেই কিন্তু সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা রদ করেছিল।

গান্ধীকে গোলটেব্‌ল্ বৈঠকে পাঠিয়ে কংগ্রেসের শক্তি অন্তত সাময়িকভাবে খর্ব করা গেছে। কিন্তু ইংরেজের ভয় গান্ধীকে ততটা নয়, যতটা ঐ ক্ষ্যাপা ছেলের দলকে। ইংরেজ নিজ মুখেই বলে বেড়ায় যে, গান্ধী নাকি ওর সব চাইতে বড় পুলিশ অফিসার।(১) হিট্‌লার আর মুসোলিনী-পরিচালিত ইওরোপের জবরদস্ত ইংরেজ, ও ক্রমওয়েল থেকে ও'ডায়ার-এর ঐতিহ্য বহনকারী ইংরেজ গান্ধীকে খানিকটা তোয়াজ করতে পারে, কিন্তু ভয় পায় না। ইংরেজ ভয় পায় নিজের পরিণামকে! নিজের আচরণের প্রতিক্রিয়াকে। ও জানে ওর এই বর্বর হিংসার প্রতিক্রিয়া একদিন মাথা খাড়া করে দাঁড়াবেই। সেদিন অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র দেখা দেবে,—রক্তের বদলে রক্ত দিতেও হবে। সাধু আর সন্তের দেশ ভারতবর্ষ দখল করতে বা দখলে রাখতে ওকে কোন বেগ পেতে হয়নি। সাধু আর সন্তরা বাধাও দেয়নি। না হয় আর একজন মরল। কিন্তু ঐ-যে পরিণাম-চিন্তাহীন অকুতোভয় যুবকেরা,—ওরা? আর ওদের ঐ নেতাটি? ইংরেজের সমস্যা এইখানে। সুভাষ বোসকে তাই দেশ-ছাড়া না করে ইংরেজের গত্যন্তর ছিল না।

নির্বাসনের প্রথম পর্ব কাটবার সময় সুভাষের যে-রূপ ছিল, যে-দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, যে-চিন্তাধারা তাঁকে উন্মনা আর অধীর করেছিল, দ্বিতীয় বার,—১৯৩৪এ এক স্বতন্ত্র, নতুন ও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ইওরোপকে দেখতে চাইলেন। চাইলেন না,—তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে ইওরোপের এতদিন-না-দেখা এক অভিনব রূপ ফুটে উঠল। প্রথমবার নিজের রুগ্নদেহের চাপ ও চিন্তা ত ছিলই,—তদুপরি সদ্য ভারতবর্ষ থেকে আগত সুভাষের চোখে ভারতের আপাত সমস্যাই বড় ও প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বারের মহাসমরোত্তর ইওরোপের বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁর ওপর

(১) বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যা মিস্ উইল্‌কিন্‌সনের উক্তি।

কম প্রভাব বিস্তার করেনি। আর এরই ফলে উত্তরকালে সুভাষ-চন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের হল আমূল পরিবর্তন।

রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে নেতা বাংলার প্রাচীনপন্থী বিপ্লবীদের সঙ্গে শুধু নিবিড় সম্পর্ক পোষণ করেন নি, খানিকটা তাদেরই একজন হয়ে পড়েছিলেন। বাংলার ঐসব বিপ্লবীদের চিন্তা ও কর্মধারা তিমি সমর্থন তো করতেনই,—তাদের সাহচর্যে ও প্রভাবে তাঁর চিন্তা-ধারা অনেকখানি পরিবর্তিত, বর্দ্ধিত ও লালিতও হয়েছে। ফলত ১৯২৪এ এদেরই সাথী হিসেবে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এদের সঙ্গেই মান্দালয়ে বন্দিজীবন যাপন করেছেন। স্বতন্ত্র, ব্যক্তিত্ব-প্রধান, নেতা-সুভাষ তখনও ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে।

মান্দালয়েই সর্বপ্রথম তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জাগে। জাগে প্রশ্ন। ১৯১৯এর পর নতুন শাসন-সংস্কারের আমলে রাজবন্দীরা মুক্তি পেয়ে মূলত দেশবন্ধুর প্রভাবে গান্ধীবাদ পরীক্ষা করবার সর্ত মেনে নিয়েছিল। বরদলীর সিদ্ধান্তের পর তাদের সর্তের অঙ্গীকার শিথিল হয়ে যায়। নতুন করে সেদিন বিপ্লবীরা বিপ্লব-প্রচেষ্টার কথা ভাবতে চাইল। চেষ্টাও খানিকটা হল। কিন্তু বেশি দূর এগোবার পূর্বেই এসে পড়ল ১৯২৪। বন্দীর বন্দনায় কারাগার আবার মুখর হয়ে উঠল।

সেদিনকার বাংলার নামজাদা অনেক বিপ্লবীদের সঙ্গে নেতা মান্দালয়ে বন্দিজীবন কাটিয়েছিলেন। অনেক আগেই এদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন কিন্তু একসঙ্গে আর এত দীর্ঘদিন বসবাস করবার অবকাশ পাননি। এই স্থানে, এই মান্দালয়ে সুভাষচন্দ্র বাংলার বিপ্লবী চিন্তা, বিপ্লবী চরিত্র, বিপ্লবী কর্মধারার বাস্তব রূপ জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। বিশ্বের বিপ্লবী ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে ওরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বিপ্লবী আর বিপ্লব-কর্মপন্থার বিচার করবার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে ঠিক এই একই সমস্যা আর একবার দেখা দিয়েছিল ১৯২১এ। প্রথম যেদিন জীবনের সকল গতানুগতিকতা

উৎখাত করে সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যতের এক নতুন, অপরিজ্ঞাত ও ব্যাপক আদর্শের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। পরাধীন দেশের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর সুভাষ প্রদীপ্ত যৌবনের অসামান্য সাফল্য, আশা আর আকাঙ্ক্ষা জরাজীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করে এক অভিনব, রূপান্তরিত, নাঙ্গা জীবন আর তারই আনুসঙ্গিক পথ বরণ করে দাঁড়িয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সম্মুখে। সেদিনও তাঁর মনে জেগেছিল এই,—এমনি প্রশ্ন। পথ, আদর্শ, পরিণতি আর পরিণাম বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন গান্ধীকে,—গান্ধীবাদকে। মহাত্মা সেদিন সুভাষ-চন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করতে পারেননি। সেদিনকার বাংলার বিপ্লবীরাও পারল না। ইংরেজকে সাময়িক ভয় দেখনো আর পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকি!

ব্যক্তির জীবনের সামগ্রিক ও যৌথ রূপই জাতির জীবন। অমানুষিক অত্যাচারে ব্যক্তি যেমন হিসেব-নিকেশ অগ্রাহ্য করে প্রতি-আঘাতের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জাতিও তেমনি পড়ে, যখন তার জীবন হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ। ইংরেজের আঘাতের প্রত্যুত্তরে প্রতি-আঘাত নেমে আসবেই, আসবে প্রাকৃতিক বিধানে। কিন্তু ঐ আঘাতই কি শেষ কথা? ওতেই কি সম্ভবপর করে তুলবে জাতির চিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতা? অথবা মুক্তি-পথের শেষ সংগ্রাম?

বিপ্লববাদী,—কিন্তু বিপ্লবের রূপ-বিন্যাস কই? পথের পারম্পর্য কই? ধারা কই? লক্ষ্য আর আদর্শ, পথ ও তার সম্যক্ বিচার, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা কই?

গান্ধীর কর্মধারাকে সুভাষচন্দ্র এই কারণেই কাজে লাগাতে চান। এরই মাধ্যমে সমগ্র জাতির জীবনে ছড়িয়ে দিতে চান ইংরেজের প্রতি একটা অকুণ্ঠ ও দুর্বার বিদ্বেষ। আত্মবিশ্বাস, বন্ধন-বেদনা আর ভীতি-শূন্যতা সম্বল করে ঐ বিদ্বেষ অবলম্বন করেই জাতি সংগ্রামমুখী আর সংগ্রামপ্রিয় হয়ে উঠবে। আর এরই সঙ্গে যুক্ত হবে দেশপ্রেম। অখণ্ড, সর্বথা আপনভোলা দেশপ্রেম। ভালো লাগা নয়—ভালোবাসা।

নেতা ভিক্টোরিয়া থেকে নেমে এলেন। নেমে এলেন নেপ্‌ল্‌স্‌এ। কুমারী এমেলীর কাজের অবধি নেই। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্‌ প্রথম খণ্ড,—১৯২১ থেকে ১৯৩৪, লেখা হয়ে গেছে। পাণ্ডুলিপি টাইপ করা, প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, প্রচারের দিকে লক্ষ্য রাখা, এমনি আরও কত-শত কাজ। এ-ছাড়া দুশ্চিন্তা। ঐ মানুষটি,—আত্ম-ভোলা, উদাসীন, আর রুগ্ন ; নিজের কথা কি উনি ভাবেন ? না, ভাববার ওঁর সময়ই আছে ? দুশ্চিন্তা হবে না ?

ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্‌ প্রকাশিত হবার পরই ইওরোপে খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। অনেককে, ভারতবর্ষের প্রতি যাদের সহানুভূতি আছে, উপহার দেয়া হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বরেণ্য মনীষী রোমা রঁলা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। একখানা পেয়ে তিনি খুশি নন। ওঁর স্ত্রী আর বোন এক-একখানা চান।

ইংরেজের মুখ চুপ্‌সে গেছে। আধুনিক কালে এমন ধারাবাহিক, তথ্যবহুল, যুক্তিসহ আর বিশ্লেষণমূলক ভারত-ইতিহাস লেখা হয়নি। ইংরেজের সঙ্কোচহীন নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতার জীবন-আলেখ্য এই ইতিহাস। ওর চাতুরী আর কাপট্য, সুভাষ বোসের মত আর কেউ বোঝেওনি আর অনাবৃত করে দেখাতেও পারেনি। ইংরেজ এ-বই ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বই নয়, বইএর পাণ্ডুলিপি নেতা সঙ্গে করে নিয়েছিলেন দেশে যাবার সময়। করাচীতে ইংরেজের পুলিশ ছিনিয়ে নিয়েছে।

নেপ্‌ল্‌স্‌ থেকে তার পান এমেলী। নেতার তার। খুশি উপচে পড়ে সারা মুখে। আর দেহেও।

নেপ্‌ল্‌স্‌ থেকে রোম। সেখানে কাটে গোটা সপ্তাহ। সেখান থেকে ভিয়েনা। গাড়ীতে বসেই নেতা দেখতে পান এমেলীকে। তন্বী, শ্রী আর ধী মাখানো সুস্মিতা এমেলী। সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারী এমেলী শেঙ্কল।

ডাঃ নিউম্যান পরীক্ষা করেন সুভাষকে। অনেকটা ভালো। আর

কিছুদিন থাকতে হবে সাবধানে। ভিয়েনা থেকে যান জেনিভা। লোকান্তরিত বন্ধু প্যাটেলের চিত্রালেখ্য উন্মোচন করবার জন্যে। জেনিভার কাজ শেষ করে নেতা যান ফ্রান্সে। বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা শেষ হয়। রোগ-মুক্তির পথে সুভাষ।

কোন্ অশুভ লগ্নে আর কেন-যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছিল, তার হদিস কেউ জানে না। যেদিন আর যে-কারণেই ওটা ঘটুক, বিশ্বের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কূপমণ্ডুকের মতই এ-দেশ পড়ে থাকল নিজের সঙ্কীর্ণ গৃহ-কোণ নিয়ে। আর এমনি করে কেটে গেল কয়েকটা শতাব্দী। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগ : মশাল-বর্তিকা হাতে করে দেখা দিলেন রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং পরে রবীন্দ্রনাথ। রামমোহনের বিলেত-যাত্রা রাজনৈতিক কারণে ঘটলেও সেদিনকার জাতীয়তা-বোধ স্বাতন্ত্র্যে তেমন মুখর নয়। তাই রাজার কণ্ঠেও তার প্রতিধ্বনি তেমন জোরালো হয়ে বাজেনি। কেশব গেলেন ধর্ম নিয়ে ওদের দেশে। কিন্তু পাশ্চাত্যের চমক আর বস্তু ঔজ্জ্বল্যের সম্মুখে নিজের জাতীয় ধর্ম বা দর্শনের কোনও বৈশিষ্ট্য তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এর পর যে-মানুষটি পাশ্চাত্যের সমালোচনা-মুখর দৃষ্টির সম্মুখে অবাধে, অবলীলায় ও একান্ত স্বকীয়তা নিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর কণ্ঠে শুধু এ-দেশের ধর্ম, দর্শন ও সমাজবাদ সম্পর্কে তেজ ও গৌরবের দাবীই ফুটে উঠল না, গোটা পাশ্চাত্য-সভ্যতার সম্মুখে এই সর্বপ্রথম পরাধীন ভারতবর্ষের এক প্রতিনিধি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন একটা প্রবল প্রতিবাদ ও বলিষ্ঠ দ্বন্দ্বের আহ্বান নিয়ে। পাশ্চাত্য-সভ্যতা-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ। ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের ছবি আর ভারতের সৌম্য সাম্যের বাণী একদিকে দিল তাঁর দেশকে মর্যাদা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য-সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে করল তারস্বরে অস্বীকার। বিবেকানন্দের

পর দীর্ঘদিন এ-দেশের কোনও শক্তিমান ব্যক্তি ওদের দেশে যায়নি।

এর পর বিংশ শতাব্দী। প্রত্যক্ষ-রাজনীতির বাইরে বিবেকানন্দের পর রবীন্দ্রনাথ। মহামানবিকতার কবি বিশ্বের সকলের জন্যেই নিজের অন্তরের শুচি-শুভ্র প্রেম ও মানবিক সৌহার্দ্যের অমৃত সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন সত্য কথা ; তবু মাঝে মাঝে ওরই ফাঁকে ফাঁকে দুর্বার সত্য ছিটকে পড়েছে ওদের মুখের ওপর। ওরা চমকে উঠেছে। পরাধীন ভারতবর্ষের অবদান-ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়নি, মহাকবির লেখায় ও ভাষণে এই কথাই শুধু বলা হয়নি, একথাও বহু বলা হয়েছে যে ওদের বলা-কথার সবটাই সত্য নয়। ওরা, বিশেষ করে ইংরেজ জানে কিন্তু বলে না যে, ভারত অপরাজেয়।

রবীন্দ্রনাথের পর বহির্ভারতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুভাষচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যাঁরা বিদেশে ভারতের কথা বলেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন প্রত্যক্ষ-রাজনীতি-সম্পর্কহীন। বহির্ভারতে ওঁরা গেছেন, নিজেদের ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও বাণীর মাধ্যমে ভারতের গৌরব প্রচার করেছেন, আর বিদেশীর শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের পূর্ববর্তী দাদাভাই নৌরজী, লাজপৎ রায় ও বিপিন পালের কার্যাবলী তৎকালীন পরিস্থিতির পটভূমিকায় মূল্যবান মনে হলেও প্রত্যক্ষ মুক্তি-সংগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়নি। ১৯২১ ও ১৯৩০এর ভারতীয় গণ-অভ্যুত্থান ও পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুভাষচন্দ্রের বৈদেশিক কার্যাবলীর পথ সুগম ও ফলপ্রসূ করবার খানিকটা সহায়ক হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বিচক্ষণ রাজনৈতিক চেতনাবোধ ও সাংগঠনিক প্রতিভা অদূর ভবিষ্যতের বিশিষ্ট ভূমিকার পূর্বাভাস রচনা করেছিল এই সময়েই, এর মধ্যে সংশয় নেই।

সুভাষচন্দ্রের ইওরোপ-পরিক্রমার সঙ্গে ব্যক্তি-সুভাষের কোন সম্বন্ধ ছিল না। সংগ্রামী ভারতবর্ষের চরম পন্থার যে-পরিচয় গান্ধীজি

বা আর কারও কাছ থেকে কোনদিন ইওরোপ পায়নি, তা পেল সংগ্রামী ভারতবর্ষের আপোষ-বিরোধী জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে।

প্রথম পর্বে জার্মেনী ভ্রমণের স্বাধীনতা নেতার ছিল না। দ্বিতীয়বার তিনি জার্মেনী যান, এবং বেশ দীর্ঘদিন রোমেও কাটান। বার-কয়েক মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ ওদের গঠনশক্তি আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ লক্ষ্য করেন। গোটা ইওরোপ সেদিন আগামী ধ্বংস-যজ্ঞের আয়োজনে ক্ষেপে উঠেছিল। কিন্তু ওরই ভেতর দিয়ে নতুন এক ইওরোপের সন্ধান মিলল নেতার চোখে। ফরাসী-বিপ্লবের প্রবল বন্যায় একদিন ইওরোপের বুকে জেগে উঠেছিল নবজাগরণের প্রদীপ্ত কামনা। আর এই বিংশ শতাব্দীর বুকের ওপর ফুটে উঠল নবতম এক বিচিত্র, বিশেষ ও বিরাট বিপ্লবের অপরিমেয় বিস্তার, যার সংক্রামকতা প্রবল বেগে আঘাত হানল ইওরোপের তটভূমি। রাশিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে এই নতুন আদর্শবাদ ইওরোপ ত বটেই, বিশ্বের বুকেও দিল নবসৃষ্টির আনন্দ-দোলা।

নেতা লক্ষ্য করেন। ভারতের অতীত নিয়ে এদের বিচার করেন। যুগপৎ আসে অবসাদ, আসে প্রেরণা। তাঁর দেশ : সংগঠন নেই, চেতনা নেই, নেই সুস্পষ্ট নির্দেশ দেবার নায়ক। ওরই মধ্যে দৃষ্টি গিয়ে পড়ে দেশের যুব-শক্তির ওপর। অকুতোভয়, উদ্দাম আর দুর্বার যুব-শক্তি। আনন্দে আর উৎসাহে নেতার মন-বুক ভরে ওঠে। চোখের ওপর ভেসে ওঠে অবশ্যম্ভাবী কিন্তু অনাগত বিপ্লবের ছবি, যে বিপ্লব সৃষ্টি করবে আর করবে সার্থক এরা—ভারতবর্ষের যুবারা।

যেখানেই যান নেতা গড়ে তোলেন ভারত-প্রতিষ্ঠান। সকলকে ডাকেন। দেশের কথা শোনান। দায়িত্ব আর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ইওরোপে গড়ে তুলতে হবে এক শক্তিশালী প্রচার-প্রতিষ্ঠান। ওরই মাধ্যমে চলবে বলা ভারতের কথা। শুধু ইওরোপে নয়—আমেরিকায়, রাশিয়ায়, জাপানে, চীনে। বিশ্বের সকলের কাছে

পৌঁছে দিতে হবে ভারতের আশা, তার আদর্শ, তার আকাঙ্ক্ষার কথা। ইংরেজের অত্যাচরের কথা। ওর মিথ্যা আর কূট প্রচার-কৌশলের ধাপ্পাবাজী খুলে মেলে ধরতে হবে সকলের চোখের সম্মুখে।

হৃদয়হীন পৈশাচিক নির্দয়তা ফুটে উঠেছে ইংরেজের পত্রে ও পাত্রে। ওদের ভাষায় অসভ্য, বর্বর, শিক্ষাদীক্ষাহীন ভারতের জঘন্য চিত্র ওরা ছড়াত শুধু ইওরোপে নয়, সমস্ত দুনিয়ায়। নেতা বলেন,—"অসাড়ে ঘুমোচ্ছি আমরা। কিন্তু ওরা বসে নেই। ওদের পাদ্রী, মিশনারী, আরও অনেকে আসরে নেমে পড়েছে। ভারতবর্ষের সতীদাহ, শিশু-বিবাহ নিয়ে কী জঘন্য চিত্রই-না ওরা এঁকেছে। আমরা নগ্নপ্রায়, আমাদের বসনের আর ভূষণের নেই কোন বালাই, এমনি কত কথা নানাভাবে প্রচার করে ওরা ওদের দেশে টাকা তোলে আমাদের সভ্য করবার জন্যে।"

এক জার্মান সাংবাদিক ভারতবর্ষ থেকে ফিরে নোংরা কতকগুলি কথায় সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ করতে কোমর বেঁধে লেগেছিল। এ ছাড়াও ছিল নানা ধরনের ছবি ও সিনেমা। 'ইন্ডিয়া স্পীকস্' আর 'বেঙ্গলী' তার সাক্ষ্য। কিন্তু মারাত্মক চিত্র এঁকেছিল 'এভরি বডি লাভস্ মিউজিক' নামক চলচ্চিত্র। নেংটি-পরা মহাত্মাজি একটি ইংরেজ রমণীর সঙ্গে নৃত্য করছেন!—এ ছবিও ওরা তারিফ করে দেখে!

ভিয়েনাতে তখন দেখানো হচ্ছিল 'বেঙ্গলী'। নেতা ভিয়েনার আর্কবিশপ কার্ডিনাল ইনিট্জারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ছবি দেখানো বন্ধ হল। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে স্বল্পতম লেখাও তাঁর চোখ এড়াত না। প্রতিবাদ গর্জে উঠত।

জার্মেনীর হিটলার বক্তৃতা করছেন। সেদিনকার হিটলার—জার্মেনীর সর্বেসর্বা না হলেও আগামী দিন তাঁর হাতে ধরা দিয়েছে। বিশ্বের কালো জাতিকে শাসন করা শ্বেতকায়দের জন্মগত অধিকার, এই দম্ভোক্তি বেরিয়েছিল হিটলারের কণ্ঠ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নেতা

প্রতিবাদ জানালেন তীব্র ভাষায়। হিটলার পরদিনই কথাটা পাল্টে নিলেন। বললেন যে, কথাটা ভারতবর্ষ আর জাপানকে বাদ দিয়ে বলা হয়েছে। নেতার প্রতিবাদ তবু ক্ষান্ত হল না। কথাটা হিটলার প্রত্যাহার করলেন।

"দেশবন্ধুই বৈদেশিক প্রচার-কার্যে আমাকে সচেতন করেছেন সব চাইতে বেশি করে। স্বরাজ পার্টি গঠিত হলে বৈদেশিক প্রচার-দপ্তর আর 'প্যান এসিয়াটিক লীগ' প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল তীব্র।" সেই থেকে নেতার মনে এ-কথা দানা বেঁধেছিল। এ নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন, এবং এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, রাজনৈতিক ভারতবর্ষের কথা আর কেউ তাঁর মত ইওরোপে ছড়ায়নি। গোলটেব্‌ল্ বৈঠকে ব্যর্থকাম হয়ে যেদিন মহাত্মাজি দেশে ফিরে গেলেন, নেতা বলেছিলেন,—"গান্ধীজি এক অপূর্ব সুযোগ হারিয়েছেন। সে-দিন বেছে বেছে মাত্র ছুজন লোকের সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন; মুসোলিনী আর রোমা রঁলা। অথচ দেখা করবার মত কত লোকই-না সেদিন ইওরোপে ছিল।"

আত্মিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল আইন-অমান্য আন্দোলনের সব সাফল্যই নির্ভর করে প্রচারের ওপর। আন্তর্জাতিক ধিক্‌কার ও সমালোচনায় ভিন্‌দেশীয় শাসকের মত ও মতি পরিবর্তিত হবে, এটাকেই গান্ধীজি বলতে চান চেঞ্জ্ অব্ হার্ট্‌স্—হৃদয়ের পরিবর্তন। অথচ বিদেশে প্রচারের কোন ব্যবস্থাই সেদিনের কংগ্রেস করেনি। ইংলণ্ডে ভারতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা ছিল। তাও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে; এবং এর বিষময় ফলেই ইংরেজের সুকৌশলী প্রচার-ব্যবস্থা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যত্রতত্র বিষোদগার করবার সাহস ও সুযোগ পেয়েছে।

বিলেতে ভারতবাসীকে বলা হত 'ব্ল্যাকি', জার্মেনীতে 'নিগার'।

অসহ্য অপমান ও ধিক্কারে প্রতিটি ভারতবাসী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রতিকারের কোন পথ খুঁজে পায়নি। পায়নি, কেননা ভারতবর্ষের কোন প্রতিবাদ-প্রতিষ্ঠান ছিল না। ইংরেজ প্রচার-বিদ্যায় নিপুণ। বিপ্লবী রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই ইংরেজই সব চেয়ে বেশি করে প্রচার চালিয়েছিল। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া এমন প্রচার-বিদ্যায় সিদ্ধ হয়ে উঠল যে, ইংরেজের বুকেও কাঁপন ধরিয়ে ছাড়ল। ইংলণ্ড আর রাশিয়ার পরই ইটালী ও জার্মেনী। ছোট-বড় সব দেশই প্রচারে নেমে পড়েছে, নামেনি শুধু ভারতবর্ষ।

সম্প্রতি যে-সব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদের কথা উল্লেখ করে নেতা বলেছেন,—"আয়ার্লণ্ডের সিন্‌ফিন্ পার্টি সেদিন অমন করে আমেরিকায় প্রচার না চালালে অত টাকাও ওরা পেত না, আর এতটা তাড়াতাড়ি ওদের স্বাধীনতা সুগমও হয়ে উঠত না। ওদের সেরা সব নেতাদের ওরা পাঠিয়েছিল বিদেশে। সভাপতি ডি, ভ্যালেরা নিজেই গেলেন আমেরিকায়; আরও অনেকে ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে। চেকোশ্লোভাকিয়ার কথা আরও উল্লেখযোগ্য। ম্যাসারিক আর বেনিসের মত নেতারা দীর্ঘ কুড়ি বছর অবিরাম প্রচার চালিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়,—বাদ নেই কোথাও। আর এদেরই সাহায্যে চেকদের স্বাধীনতা সম্ভবপর হয়ে উঠল।"

প্রচারের আবশ্যকতা শুধু পরাধীন দেশের জন্যেই নয়। স্বাধীন দেশও তার যে-কোন সমস্যা নিয়ে প্রচার মারফত তুমুল করে তোলে রাজনীতির হাট। নেতা বলতেই থাকেন,—"এশিয়ার চীন জেনিভার মত স্থানে দপ্তর খুলে বসেছে। পাঠাগার গড়ে তুলেছে। গড়ে তুলেছে পাঠ-চক্র। ফরাসী আর ইংরেজী ভাষায় সে বলে বেড়াচ্ছে তার প্রাচীন সংস্কৃতির কথা। মাঝে মাঝে ওরা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। চীনের শিল্পীর চিত্র দেখানো হয়। দেশ-দেশান্তরে এমনি করে চীন নিজেকে বিস্তার করে চলেছে। জগতের দৃষ্টি চীনের দিকে ফিরে চাইবে, এতে আর যাই থাক্ আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া

চীনের প্রচারের ফলও কিছু কম ফলেনি। জাপানের বিরুদ্ধে লীগ অব্ নেশনসের বিরুদ্ধ-রায় একথার সাক্ষ্য দেবে।"

ইংরেজের প্রচার-ব্যবস্থা বেশ পাকা-পোক্ত। সংবাদ পরিবেশক রয়টারের মারফত সুকৌশলে তার প্রচার চলে অবিরাম কিন্তু অলক্ষ্যে। আন্তর্জাতিক কোন অনুষ্ঠান ইংরেজ উপেক্ষা করে না, প্রতিনিধি পাঠায়। নিজের যা বলবার থাকে, বলে। ইংরেজের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে প্রতিবাদ করে। বহু দেশে ইংরেজের প্রচারকেরা নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ওদের মাধ্যমে ইংরেজের প্রচার চলে নিপুণভাবে। এছাড়া আছে নানা ধরনের বিশেষজ্ঞ : শিক্ষাবিদ্, লেখক, সাংবাদিক, পর্যটক,—এমনি সব। এরা বক্তৃতা করে, ভিন্‌দেশের সমাজ, রাষ্ট্র ও নানা ধরনের সংস্থার ভেতর ঢুকে সংবাদ সংগ্রহ করে। যা দেবার দেয় ওরা। নেবার কিছু থাকলে ফেলে আসে না। নানা দেশের নানা ভাষার বই ইংরেজ অনুবাদ করে। নিজেদের বই অনুবাদ করে অন্যদেশে পাঠায়।

প্রচার হবে আপাত-নিরপেক্ষ। সেই প্রচারই বেশি ফলদ, লোকে যাকে প্রচার বলে ধরতে না পারে। নেতা বলেন,—"ইওরোপে গিয়ে ওদের দেশের ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দোষ দেখানো প্রচারের ধর্ম নয়। ভারতের কথা বেশ জোর দিয়ে, তীব্র করে, তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে বলতে হবে। ইংরেজের কোন কথা উল্লেখ না করেও ও-কথা বলা চলে। আর তাতেই ফল পাওয়া যায় আশাতিরিক্ত। এই ধরনের প্রচারই ইওরোপের লোক বেশি পছন্দ করে।"

ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশের প্রচার-কার্য সম্বন্ধে আরও বিশদ করে নেতা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,—

"(১) ভারত সম্পর্কে মিথ্যা কুৎসার প্রতিবাদ করতে হবে ;

(২) ভারতের যথাযথ অবস্থা আর তার সমস্যার কথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে জানাতে হবে ;

(৩) পরাধীন থেকেও মানবিক অধিকার ও ঐ-সম্পর্কীয় যে-সব

কাজ ভারতবাসী করেছে, যে-সব সংস্থা এ-কাজ করে থাকে, তাদের বিবরণ সব দেশে পৌঁছে দিতে হবে ;

(৪) ভারতবর্ষের দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-বিপুল সমৃদ্ধ সম্পদ রয়েছে, তার কথা বলতে হবে বিশ্ববাসীর কাছে, আর এর ফলে ভারতবর্ষ পাবে বিশ্বের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ;

(৫) যেখানে আন্তর্জাতিক কোন অনুষ্ঠান হবে, ভারত থেকে প্রতিনিধি যাবে ;

(৬) বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় ভারতের বিশেষজ্ঞেরা লিখবেন নানা ধরনের প্রবন্ধ ;

(৭) ভারতের নানা ধরনের বই—প্রাচীন ও আধুনিক, অনুবাদ করে পাঠাতে হবে নানা দেশে ;

(৮) ভারত সম্পর্কীয় নানা ধরনের বই ও পত্রিকা সংগ্রহ করে সব দেশে সম্ভবপর না হলেও ইওরোপের কোনও কেন্দ্রস্থলে একটি ভালো পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে ;

(৯) ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা বিদেশে যাবেন, বক্তৃতা করবেন, মিশবেন ওদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে আত্মীয়ের মত ;

(১০) বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করে ভারতে আনতে হবে, তাঁরা যাতে দেশের খ্যাতনামা লোকদের সংস্পর্শে এসে এদেশ সম্পর্কে উন্নত ধারণা নিয়ে যেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে ;

(১১) বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সহানুভূতিশীল লোকদের নিয়ে মিশ্র বা যুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, শুধু সংস্কৃতিমূলক নয়, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েও, এবং ঐ-প্রকার প্রতিষ্ঠান ভারতেও গড়ে তুলতে হবে ;

(১২) বিদেশে ভারত-স্বার্থের অনুপন্থী যে-সব প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে এক মিলন-সূত্র।”

প্রচার কার্যের এক পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কোন দিক বাদ যায়নি, নিখুঁত। শেষ করছেন নেতা,—

"বিশ্বের নানা ক্ষেত্রে বিপক্ষ দল ভারতের এক জঘন্য চিত্র নানাভাবে ছড়িয়ে চলেছে। ভারতবাসী অসভ্য, ভারতের নারী দাসী পদ-বাচ্যা, ভারতে জাতি বলে কিছু নেই, আছে কতকগুলি সম্প্রদায়, সমাজ শতধা-বিচ্ছিন্ন,—কান ঝালাপালা হয়ে গেল এই শ্রেণীর কথা শুনতে শুনতে। আর কত কাল বিনা প্রতিবাদে নীরবে আমরা শুনে যাব এসব কথা ? না। শুনব না। ওদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেব যে, আমরা জগৎ ছাড়া নই, বিশ্বের মহামানবের আমরাও অংশীদার।"(১)

শ্রীমতী কমলার শয্যা-পার্শ্বে এসেছেন জহরলাল, জার্মেনীতে। পত্রালাপ চলে নেতার সঙ্গে। পরে সাক্ষাৎকারও ঘটে। আলোচনা হয় সুদীর্ঘ। নবভারতের দুই কর্মযোগীর এই মিলনের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে আগামী কালের আশার নবারুণ। ধোঁয়া আর ধোকার মধ্যে জাতকে আর রাখা চলবে না। রাখা চলবে না জাতির মুখপাত্র কংগ্রেসকে। স্পষ্ট, সহজ, আর সাবলীল হবে তার কর্মধারা, যা সহজে বুঝবে জনসাধারণ। সমাজবাদের মূলসূত্র-অবলম্বন করে গড়ে তুলতে হবে কর্মিদল। অস্পষ্ট স্বরাজ, রামরাজ্য বা পূর্ণ স্বরাজের কুহেলিকা অপসারণ করে স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ আর সংগ্রামের ক্রমপরিণতি ও পর্যায় বুঝিয়ে দিতে হবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

(১) সুভাষচন্দ্রের 'কাল্‌চারাল্ কংকোয়েষ্ট' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে ১৯৩৫এর শেষের দিকে। বৈদেশিক প্রচার বিষয়ে নেতার প্রগাঢ় ও বিচক্ষণ অন্তর্দৃষ্টি ও আগামী দিনের স্বচ্ছ ধারণা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে লেখাটির ছত্রে ছত্রে। রাশিয়া, আমেরিকা বা অন্যান্য দেশের তরফ থেকে যে-যে ধরনের প্রচার-কার্য বর্তমান সময়ে চালু এবং এদেশে ও দেশান্তরে প্রবর্তিত হচ্ছে, তার প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখ আছে নেতার এই লেখায়। পাঠাগার, পাঠচক্র, সাময়িক পত্রিকা, অনুবাদ-সাহিত্য, সাংস্কৃতিক মিশন, আন্তর্জাতিক ক্রিয়া-কলাপ —কোনটাই বাদ নেই। মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে যে-সব কাজ উন্নততম রাষ্ট্র ও দেশগুলি করতে শুরু করেছে, ভারতবর্ষের পক্ষে সেই কাজ করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন নেতা ১৯৩৫এ।

অষ্ট্রিয়ার হফ্গাষ্টিন থেকে নেতা ১৯৩৫এর ৪ঠা অক্টোবর জহর-লালকে এক চিঠি লিখলেন। শ্রীমতী কমলার জন্যে তাঁর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। লিখলেন,—"তোমার এই বিপদের সময় সম্ভবপর সব রকমে তোমাকে সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত। প্রয়োজন হলেই আমাকে জানাবে। দ্বিধা কোরো না কিন্তু।"(১)

এই পত্রের উপসংহারে নেতা 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে' প্রকাশিত ১লা অক্টোবরের লেখা তাঁর চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন। এবং চিঠিখানার নকল জহরলালকে পাঠালেন, একথাও লিখেছেন।

এর কিছুদিন আগে নেতা গিয়েছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে রোমা রঁলার সঙ্গে দেখা করতে। ১৯৩৬এর ৩রা এপ্রিল।

"বুধবারের সকালবেলা। ঝলমলে রোদ চারদিকে। জেনিভা অপরূপ হয়ে উঠেছে। দূরে নির্মেঘ সুনীল আকাশ। ওরই পটভূমিতে সালিভের তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ শৃঙ্গ। সামনে জেনিভার অনির্বচনীয় সরোবর। ওর চারদিকে প্রাসাদোপম অট্টালিকার সার। ওদের ছায়া পড়েছে কাচ-স্বচ্ছ সরোবরের বুকে। জেনিভা সরোবর। এগিয়ে চলেছে তীর্থের পথে। তুবছর ধরে,—ইওরোপে আসবার পর থেকেই, এই দিনটির জন্যে কামনা করেছিলাম। দেখব। দেখব সেই মহান্ ব্যক্তিটিকে। রোমা রঁলা। বৃহৎ আর মহৎ। চিন্তানায়ক। ভারত-বর্ষের বিশিষ্ট বন্ধু। ভারতীয় সংস্কৃতির ভক্ত পূজারী। ১৯৩৩ গেল। গেল '৩৪ও। সুযোগ হল না। কাজের ভিড় এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। তিনবারের বার,—এবার, হয়তো আমার কামনা পূর্ণ হবে। প্রাণ সত্যিই আনন্দে নেচে উঠছিল। কিন্তু অস্বস্তিও কম ছিল না। একটা অজানা উদ্বিগ্নতা। আর ছিল সংশয়। এই অনন্যসাধারণ

(১) বাঞ্চ অব্ ওল্ড্ লেটার্স—১২১ পৃঃ।

ব্যক্তি,—সত্যিই কি এঁর সান্নিধ্য আমাকে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করতে পারবে? না, ফিরে যেতে হবে হতাশা বুকে নিয়ে? কল্পনা আর স্বপ্নের রাজা রঁলা। আদর্শবাদী রঁলা। জীবনের রূঢ় সত্য কি উনি করবেন অস্বীকার? বাস্তব বন্ধুরতা যুগে যুগে আর দেশে দেশে সৈনিকের প্রতি পদক্ষেপে রচনা করে সঙ্কট, তাকে করবেন উপেক্ষা? সবচেয়ে বড় কথা, ভারতবর্ষের অলিখিত ইতিহাসের মর্মরূপ উনি অনুধাবন করতে পারবেন তো?

"রঁলার সেই চিঠি। আশ্চর্য সেই চিঠি। রঁলা লিখেছেন,—

Ville neuve (vand)
ভিলা অল্‌গা,
২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

প্রিয় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু,

'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগ্‌ল্‌ ১৯২০ থেকে ১৯৩৪' আপনি অনুগ্রহ করে উপহার দিয়েছেন আমাকে। অশেষ ধন্যবাদ। আপনাকে অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বইখানা আমাদের মুগ্ধ করেছে। আরও একখানা কেনবার জন্যে তাগিদ দিয়েছি। শ্রীমতী রঁলা আর আমার বোন, ওঁরা দুজনেই চান এক-একখানা করে। ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস জানতে হলে এই বই অপরিহার্য। ঐতিহাসিকের মহত্তম গুণ আপনার লেখায় ফুটে উঠেছে। একাধারে প্রাঞ্জলতা আর মনের উর্ধ্বমুখী উদারতা। রাজনীতির সীমাহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও দলীয় মনোবৃত্তি আপনার বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেনি। এটা কদাচিৎই দেখতে পাওয়া যায়।

...চিন্তার রাজ্যে আমাদের বাস। ক্লান্তি আর অনিশ্চয়তা মাঝে মাঝে দেখা দেয় বইকি। আর তখুনি সংগ্রাম ক্ষেত্র ছেড়ে ঐ-যে ধোঁয়ার রাজ্য,—ভগবান, আর্ট, অথবা আত্মিক শক্তির স্বাতন্ত্র্য কিংবা দুর্জ্ঞেয় আত্মার নিঃসীম আবাসভূমি, ওদের পানে ছুটে যাবার প্রলোভনই কি কম দেখা দেয়! দেখা দেয় বলেই আরও তীব্রভাবে

আমরা সংগ্রাম করে যাব। এ-প্রলোভন জয় আমাদের করতেই হবে। চলবে আমাদের বিরামবিহীন সংগ্রাম। সংসার-সমুদ্রের সেই পারেই আমাদের স্থান হবে, যে-পারে মানুষ চলেছে অবিরাম সংগ্রামের ভেতর দিয়ে।...

আপনি রোগমুক্ত হয়ে উঠুন, এই হবে আমার অকুণ্ঠ কামনা। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্যে আপনাকে সুস্থ হয়ে উঠতেই হবে। আপনাকে সপ্রেম অনুরাগ জানাচ্ছে।

রোমা রঁলা

এই চিঠিই আমাকে আশ্বস্ত করেছে।"

জেনিভা লেকের ধারেই সড়ক। একেবারে তীর-ঘেঁষা। সেই পথে নেতা চলেছেন। ইচ্ছে করেই গাড়ী চালানো হল মন্থর গতিতে। চলল ঘন্টা-দুই। সুন্দর দিনটা। সুইস্ রিভিয়েরা অপরূপ দেখাচ্ছিল। কি ভালই লাগল নেতার। ধীরে ধীরে গাড়ী এসে ঢুকল গৃহের কাছাকাছি। থামল 'অল্গা ভিলার' সামনে। 'অল্গা ভিলা'। রঁলা নিকেতন। সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। সারি সারি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে গৃহের ও-পারে। ঘিরে রেখেছে সন্তর্পণে রঁলার গৃহ। লেকের জলে পড়েছে ঘরের ছায়া। নিস্তব্ধ পরিবেশ। শান্তি, সৌন্দর্য আর গাম্ভীর্যের আবরণ ও-গৃহের সর্বাঙ্গে। রঁলার ঘর—ঘর নয়, গৃহও নয়, তপোবন।

ডাকবার বোতাম টিপে দিলেন নেতা। দোর খুলে দেখা দিলেন একজন নারী। শ্রীমতী রঁলা। ছোট্ট পুতুল। মুখে স্নেহের প্রলেপ। কিন্তু জ্বলজ্বলে। এগিয়ে এলেন হাসি-ভরা মুখ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের দরজা খুলে গেল। নেতার সম্মুখে দাঁড়াল একটি মূর্তি। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন। মুখে করুণা আর বিষণ্ণতা। আশ্চর্য দুটি চোখ সেই মুখের ওপর বসানো—মর্মস্পর্শী।

"এই মুখই আমি দেখেছি অনেক স্থানে। দেখেছি ছবিতে। বিশ্বের লাঞ্ছিত মানবতার দুঃখের ভারে ক্লান্ত, অবনত। পাংশু-মুখে

বেদনার আভাস। কিন্তু পরাজয়ের বেদনা নয়। কথা শুরু করতে-না-করতে সেই পাণ্ডুর মুখের ওপর ভেসে উঠল রক্তের ছোপ। চোখে ফুটে উঠল এক অসাধারণ আলো। প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের ভেতর দিয়ে দেখা দিল প্রাণ ও আশার মূর্ত রূপ।"

রঁলা ইংরেজী জানেন না। হয়তো জানেন, কিন্তু বলেন না। সুভাষ ফরাসী জানেন না। শ্রীমতী রঁলা আর রঁলার বোন দোভাষী হলেন। শুরু হল আলোচনা। ভারতবর্ষের কথা থেকে শুরু হল। বিশ্ব-সমস্যাও বাদ গেল না। নেতা বলে চললেন ভারতবর্ষের কথা। প্রথম থেকে। সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর। উদ্দেশ্য। বিগত তের বছরের ইতিহাস। গান্ধীজির অবদান। অতুল্য বিপুল অবদান। সত্যাগ্রহ আর অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়। সীমাহীন আশায় বুক বেঁধে দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষের অগণ্য মানুষ। আসমুদ্র হিমাচল। সে আশার সমাধি হয়ে গেছে। ভারতের অনেকে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। কংগ্রেসের ভেতরে লেগেছে দোলা। সন্দেহের দোলা। সংশয়ের দোলা। চলেছে আত্মবিশ্লেষণ। কংগ্রেসের বিজ্ঞ যাঁরা, চলেছেন তাঁরা পুরানো পথে। নিয়মতান্ত্রিকতার পথে। কাউন্সিলে ঢোকবার জন্যে তাঁরা অস্থির হয়ে উঠেছেন। লালসা আর প্রলোভন তাঁদের অন্তরে মোহ বিস্তার করেছে। মন্ত্রিত্বের মোহ। ক্ষমতার মোহ। আয়াসের মোহ। কিন্তু এদের বাইরে রয়েছে আর একটা বড় অংশ, যারা আপোষে বিশ্বাসহীন, যারা সংগ্রামমুখী, যারা নতুনের পূজারী। তাদেরই বড় একটা অংশ সমাজবাদী দল (Socialist Party) গড়ে তুলেছে।

গান্ধী-বাদের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের সকল সম্প্রদায় আর স্বার্থের সমন্বয়ে এক সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ে তোলা। তাই ধনী ও শ্রমিকের পার্থক্য এবং তাদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের কথা এতদিনের কংগ্রেস বলেনি। পুঁজিবাদ আর সাম্যবাদের মত-পার্থক্য অস্বীকার করে চলা হয়েছে। জমিদার আর প্রজার স্বার্থ ভাবা হয়েছে অভিন্ন

মনে। (১) এই সম্মিলিত ফ্রন্ট যদি ভেঙ্গে যায়,—প্রকৃতপক্ষে গেছেই,—নেতা জিজ্ঞেস করলেন রঁলাকে,—"আপনার অভিমত জানতে ইচ্ছা করে। গান্ধী-বাদের পরিবর্তে অন্য পথে যদি সংগ্রামের মোড় ফেরেই, আপনি কি প্রীতির চক্ষে দেখবেন না?"

"আমি দুঃখিত হব।" উত্তর দিলেন রঁলা। "গান্ধীর সত্যাগ্রহ বিফল হলে খুবই দুঃখিত হব। হতাশও কম হব না। মহাযুদ্ধের পর সবাইএর মন রক্তক্ষরণ আর হিংসার প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছিল। আর ঠিক এই সময়েই গান্ধীর আবির্ভাব হল। রাজনৈতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে তিনি প্রবর্তন করলেন এক অভিনব অস্ত্র। নতুন আলো সবার চোখে ফুটে উঠল। নতুন আশা জাগল মনে।"

"কিন্তু সত্যাগ্রহের পরিণাম? ইংরেজের নিরঙ্কুশ চণ্ডনীতির এক-চুলও ব্যতিক্রম ঘটেনি। দুর্বলও সে হয়নি। হয়তো অসুবিধে একটু হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার শাসন চলছে অব্যাহত। জাতির আদর্শ আর আকাঙ্ক্ষা যদি ভিন্ন পথে মুক্তি-সংগ্রামের পথ দেখতে চায়, আপনার স্নেহ থেকে সে-সংগ্রাম কি বঞ্চিত হবে?"

নেতার প্রশ্ন শেষ হবারও সময় পেল না। গর্জে উঠল সবল কণ্ঠ। রঁলা বললেন,—"যে-পথেই হোক, সংগ্রাম চালাতে হবে অবিরাম—"। একটু ছেদ। ভাবছেন রঁলা। চিন্তার রেখা, স্পষ্ট রেখা ফুটে উঠেছে রঁলার চোখে আর কপালে। "কিন্তু—।" তবুও ভাবছেন। গভীর ধ্যানে ডুবে গেছেন। খানিকটা স্বগত। বললেন,—"ইওরোপের

(১) কংগ্রেস যে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তবুও কংগ্রেস যদি আর একটু সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকতো আমি খুশিই হতাম। আর এই কারণেই মালিকানা স্বত্বের প্রশ্ন তার কাছে গুরুতর বলে বিবেচিত হয়নি।

লর্ড লোথিয়ানের নিকট জহরলালের চিঠির অংশ।—বাঞ্চ অব্ ওল্ড্ লেটাস —১৪৮ পৃঃ

কয়েকজন ভারতবন্ধু আমাকে স্পষ্টই বলেছেন যে, একমাত্র গান্ধীবাদের জন্যেই তাঁরা ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।”

কিন্তু রঁলা তাঁদের সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে তিনি সায়ও দেবেন না। রঁলার কাছে মতবাদের চাইতে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা সত্য।

“এই উত্তরের জন্যেই আমার সমগ্র অন্তর উন্মুখ হয়ে ছিল। বড় ভালো লাগল রঁলার কথা। আর রঁলাকেও। রঁলা কবি, রঁলা ভাবুক, রঁলা সুরকার শিল্পী, কিন্তু আকাশে তাঁর পা নেই। আছে কঠিন আর বাস্তব পৃথিবীর মাটির ওপর।”

নেতা বললেন রঁলাকে,—“রাশিয়ায় দুটো বিপ্লব এসেছিল পর-পর। বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব প্রথমে, তারপর সমাজ-বিপ্লব। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে ও-ধারা না মানলেও চলবে। আমাদের কাজ হবে যুগপৎ, বহুমুখী। রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে চলবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি-সংগ্রাম। যারা আনবে রাজনৈতিক মুক্তি, দ্বিতীয় মুক্তিও তারাই সম্ভবপর করে তুলবে। আপনার মত জানতে ইচ্ছে করছে।”

রঁলা চুপ করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন,—“কথাটা ভাবিনি মোটে। ভেবে বলতে হবে। তবে—”

রঁলা থেমে গেলেন। সুভাষের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। পরে বললেন,—“অর্থনীতি সম্পর্কে ভারতীয় কংগ্রেসের সুস্পষ্ট হবার সময় এসেছে। গান্ধীকে এ-বিষয়ে আমি লিখেছি।”

আলোচনা চলতে থাকে। নেতার মনে আশঙ্কা দেখা দেয়। এই রোগা-দেহের মানুষটি ক্লান্তিতে বিরক্ত হবেন না তো? কিন্তু তাঁর যে আরও কত কথা রয়েছে বলবার। শোনবারও। চা-এর ডাক আসে। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে নেতার। তবুও একটু সময় পাওয়া যাবে। আর বিষয়ান্তরও হবে। সবাই পাশের ঘরে উঠে যান।

গান্ধীজির প্রসঙ্গ ওঠে। ভারতবর্ষের যুবশক্তি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

তাদের দোষই হোক আর গুণই হোক, গান্ধীর ন্যায় তাদের অত ধৈর্যও নেই, আর অত চুল-চেরা বিচার করবার সদিচ্ছারও তাদের অভাব। তবু তাদের চিন্তার রাজ্যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তাদের চোখে ফুটে উঠেছে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের রূপই শুধু নয়,—বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদের জিঘাংসু প্রকৃতি। আলোচনার মাঝখানেই সহসা রঁলা থেমে যান। একটুক্ষণের বিরতির পরই বলে ওঠেন,—"কোনও দলই আমার কাছে যথেষ্ট নয়। সে গান্ধীর দল হলেও না। আমি দেখতে চাই পার্টির অনুসৃত পথ। বিশ্বের শ্রমজীবী সমস্যাই বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা। আর এদের হয়ে লড়বার মহত্ত্বই পার্টিকে দেবে গুরুত্ব। আমি আরও খুলে বলতে চাই। গান্ধী অথবা আর-যে-কেউ হোক শ্রমজীবীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যে যাবে, সে-দলের সঙ্গে আমার কোন হৃদ্যতাই থাকবে না। নির্যাতিত শ্রমজীবীর দিকে চিরদিনই থাকবে আমার সমর্থন। কারণ তাদের দিকে রয়েছে শাশ্বত ন্যায়ের সমর্থন, মানব-সমাজের প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় উন্নতির বিধি ও বিধান।"

"বিস্ময়ে ও আনন্দে মন-বুক আমার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমি সত্যিই স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই যে, এই চিন্তা-নায়কের কাছ থেকে আমি এতটা আশা করিনি। শ্রমজীবীর কল্যাণ-কামনায় তিনি এত-খানি অকুণ্ঠ আর মুখর হবেন, একি কম কথা!"

আর নয়। নেতার মন পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে। সত্যিই তীর্থে তিনি এসেছিলেন, ঋষির সান্নিধ্যে যে-তীর্থ হয়েছে সমৃদ্ধ। শেষ একটা কথা জানতে হবে। রঁলার জীবন-বেদ। ওঁর নিজের মুখ থেকে। কিন্তু-কিন্তু করেও নেতা জিজ্ঞেস করে বসলেন,—"আপনার জীবনের প্রধান আদর্শ, যার জন্যে সারা জীবন লড়াই করলেন আপনি,—আমায় একটুখানি বলুন।"

রঁলা গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু থেমে বললেন,—"এক কথায় আন্তর্জাতীয়তাবাদ। ওটাকে ভেঙ্গে বলতে গেলে বলব যে, সমস্ত

জাতির জন্যে সমানাধিকারবাদ। এই প্রথম। দ্বিতীয়,—বিশ্বের শোষিত শ্রমজীবীর জন্যে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা; অর্থাৎ আমরা এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করব, যে সমাজে কেউ শোষক বা শোষিত থাকবে না। সবাই সেই বৃহৎ মানব-সমাজের জন্যে শ্রম দান করবে। তৃতীয়,—কোনও দেশ পরাধীন থাকবে না। চতুর্থ,—নর ও নারীর অধিকার হবে অভিন্ন।”

কানায় কানায় ভরে উঠল অন্তর। উবুছুবু। এ-যে তাঁর নিজের স্বপ্নই বাস্তব হয়ে উঠল রঁলার মুখে। বেরোল বাণী হয়ে। অধীর হয়ে নেতা বললেন,—“আপনার এই আদর্শের কথা স্পষ্ট করে জগৎকে জানাবেন না?”

“জানিয়েছি তো।” রঁলা বলে চললেন,—“আমার এই আদর্শের কথা লিখেছি দুখানা বইএতে। ‘ফিফ্‌টিন ইয়ারস্‌ অব্‌ কম্‌ব্যাট’, আর ‘বাই ওয়ে অব্‌ রেভল্যুশান্‌ টু পীস’ বই দুখানার নাম। পুরানো সমাজ-ব্যবস্থার ওপর যুদ্ধ, শান্তি আর অহিংসার প্রভাব কেমন করে আর কতখানি রেখাপাত করেছে, সেই কথাই বলেছি।”

বিদায়ের ক্ষণ এসে পড়ে। এই সংযত, শান্ত, জ্ঞান-তাপসের গৃহ ছেড়ে বাইরে আসবার পরও নেতার কানে বাজতে থাকে সেই থেমে-থেমে জোর দিয়ে বলা রঁলার বাণী। এই মহান্‌ শিল্পীর নিপুণ তুলিকায় দুর্গত মানব-সমাজের যে আর্ত বেদনার ছবি ফুটে ওঠে, তার মধ্যে ভারতবর্ষেরও স্থান আছে। গাড়ী চলতে থাকে। জেনিভা হ্রদের নীল জলে পড়েছে অস্তগামী সূর্যের রঙ্গীন ছটা। দূরে পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় তুষারের চূড়া। নেতার চোখে ভেসে ওঠে হৈমবতী ভারতবর্ষের অপরূপ রূপ।(১)

(১) নেতার লেখা “গান্ধী ও রোমা রঁলা” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

প্রায় তিন বছর পরে ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভা বসল পাটনায়। ১৯৩৪এর মে মাসে। তখনও কংগ্রেস বেআইনী প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ বাধা দিল না। অবশ্য দেবার প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। এটাকে ইংরেজ আমলই দেয়নি। ওটা কমিটির সভা নয়,—সৎকার-সমিতির ঘরোয়া বৈঠক। শেষকৃত্যের আয়োজন বসল পাটনায়। মহাত্মাজি স্বয়ং কাউন্সিলে ঢোকবার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। পারলিয়ামেন্টারী কমিটি গঠিত হল। গান্ধী-গোষ্ঠীর একান্ত নির্ভর-যোগ্য প্রধানরা হল সে কমিটির সভ্য। (১) আর এর পরই কংগ্রেসের ওপর থেকে সব বাধা-নিষেধ অপসারিত হল।

হয়তো একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। ১৯২২এ এই গান্ধী-গোষ্ঠীই ছিল পরিবর্তন-বিরোধী দল,—নো-চেঞ্জার। আর কাউন্সিল-প্রবেশকামীদের বলা হত প্রো-চেঞ্জার। সেই নো-চেঞ্জারদের অগ্রণী যারা—তারাই ১৯৩৪এ এগিয়ে এল সতৃষ্ণ আগ্রহে কাউন্সিলে ঢোকবার প্রস্তাব নিয়ে।

যে-তিনটি প্রধান স্তম্ভের ওপর গান্ধীজি তাঁর অসহযোগ-নীতি দাঁড় করিয়েছিলেন, মাত্র চোদ্দ বছরের মধ্যে তাঁর জীবদ্দশায় সব-কটা ধ্বসে গেল কোন চিহ্ন না রেখে। ১৯২৩এ দেশবন্ধু রীতিমত লড়াই করে স্বরাজ্য দল গড়ে তুলেছিলেন। অনুকম্পা আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই সেদিনকার গান্ধী-গোষ্ঠী দেশবন্ধুর প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করেছে, আর নিজেদের ভাবতে চেয়েছে শ্রেষ্ঠতর সংগ্রামী বলে। দেশবন্ধুর সেই

(১) মৌলানা আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও বল্লবভাই প্যাটেল ছিলেন এই কমিটির সভ্য।

নিন্দিত, তুচ্ছ আর অনগ্রসর প্রস্তাব গ্রহণ করে গান্ধী-বাদ কায়ক্লেশে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখবার শেষ চেষ্টায় ব্রতী হল।(১)

কংগ্রেসের প্রধানরা ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার এই নতুন পথে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলেও দেশের সবাই এ-প্রস্তাবে সায় দিতে পারল না। বাগড়া দিল যুবশক্তি। এই সময়েই সোশ্যালিষ্ট পার্টি গঠিত হল। ওরাও কাউন্সিলে ঢোকবার প্রস্তাবে সায় দিতে পারল না। দেশের সম্মুখে তুলে ধরল ওরা চিন্তা-রাজ্যের নতুন বাণী। নতুনের সন্ধানী আলো ছিটকে পড়ল কালি-ভরা ভারতবর্ষের বুকে। পুরানো, বাসি, পচা, আর একঘেয়ে কথায় ভুলে থাকবার মোহ কি কাটল ?

সমগ্র দেশ তাকিয়েছিল একটিমাত্র মানুষের দিকে। চারদিকে ঘন অন্ধকার। সীমাহীন অন্ধকার। নিরন্ধ্র অন্ধকার। আশার চিহ্ন নেই। আলোর আশা নেই। সুভাষ নির্বাসনে। কিন্তু জহর ? কারামুক্ত জহরও কি জাতির পুরোভাগে এসে দাঁড়াবেন না ? পিছিয়ে পড়বেন আর সকলের মতই ? কারামুক্তির পরই জহরলালের চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। আশা-নিরাশায় সবাই দুলতে থাকে।

(১) মহাত্মাজির সঙ্গে স্বরাজ্য-পার্টির আপোষ হবার প্রাক্কালে, ১৯২৪এর মাঝামাঝি গান্ধীজি একটি বিবৃতি প্রদান করেন। অনেক কথার মধ্যে নীচের কথা-কয়টিও ছিল : "আমার ও স্বরাজ্যদলের নেতাদের মধ্যে রয়েছে মৌলিক মত-পার্থক্য। এ-সিদ্ধান্ত আজও আমার অটুট যে, কাউন্সিলে প্রবেশ-নীতি অসহযোগিতার বিরুদ্ধ-নীতি।...অসহযোগ শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে এ-পার্থক্য নয়, এ-পার্থক্য জীবনের প্রধানতম সমস্যাগুলির বিচার-সাপেক্ষ মানসিক ভঙ্গীর। অসহযোগ-নীতির ত্রি-বর্জন-কর্মধারা ব্যর্থ কিংবা সফল হয়েছে, তা বিচার করতে হবে এই মানসিক ভঙ্গীর মাধ্যমে। স্থূল পরিণতির দ্বারা এর বিচার চলে না। এবং এইভাবে বিচার করেই আমি বলব যে, দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে কাউন্সিলের ভেতর না গিয়ে বাইরে থাকাই শ্রেয়।

—ডাঃ পট্টভির কংগ্রেসের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২০৯ পৃঃ।

গান্ধী-প্রভাব মুক্ত হয়ে নতুনের ডাকে এই শক্তিধর, চিন্তাশীল আর অকুতোভয় ব্যক্তিটি সাড়া দেবেন না ? গান্ধীজি জহরলালকে শুধু তোয়াজই করেন না, করেন খানিকটা ভয়ও। তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে জহরলালের স্থান সকলের ওপর নির্দেশ করে দিলেও পুরোপুরি তাঁকে কবলস্থ করতে পারেননি গান্ধী। ক্ষণে ক্ষণে ওঁর স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে নিজ সত্তা নিয়ে। কথায়, লেখায়, বক্তৃতায় জহরলাল গান্ধী-বাদ অতিক্রম করে বলে ফেলেন সত্যি করে সত্য কথা। কখনও সোশ্যালিজম্ আবার কখনও তারও ওপরে—নির্ভেজাল কম্যুনিজম্। দ্বন্দ্ব চলতে থাকে 'হৃদয় আর মস্তিষ্কের' মধ্যে। গান্ধীজির স্নেহ, উদার ব্যক্তিত্ব ওঁকে অভিভূত করে। গ্রাস করতে চায়। স্তিমিত করে বুদ্ধির বিচার। জহরলাল দেশ ছেড়ে সোজা চলে যান ইওরোপে। গান্ধী-গোষ্ঠী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।(১)

এই অবস্থায় জহরলালও তৃপ্তি পাননি। অস্বস্তি আর বিবেকের দংশন না হলেও তাঁর বিশ্লেষণপটু ধী তাঁকে শান্তি দেয়নি। কংগ্রেসের এই অধঃপতন তাঁকে পীড়া দিয়েছে। আর সে-বেদনার কথা তিনি প্রকাশও করেছেন নানাভাবে।

১৯৩৫এর ১৯শে ডিসেম্বর ওয়ার্ধা থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে পত্র লেখেন জহরলালকে, তার ছত্রে ছত্রে জহরলালের অদৃশ্য ধর্মবেদনা উঁকি দিয়েছে। ফুটে উঠেছে তাঁর নিজস্ব মতবাদ। দেখা দিয়েছে মানুষ জহরলালকে। গান্ধী-প্রভাব-মুক্ত জহরলালকে। পত্রের একস্থানে

(১) লোকপ্রিয়তার কষ্টিপাথরে বিচার করলে গান্ধীজির পরেই জহরলালের স্থান। দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তিনি। জ্ঞান আর ভাবালুতার ঐশ্বর্যে প্রদীপ্ত জহরলাল। বিশ্বের অতি-আধুনিক নানাপ্রকার আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয় থাকা সত্ত্বেও নেতৃত্বের অতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব রয়েছে ওঁর প্রকৃতিতে। প্রয়োজনে লোকমতের বিরুদ্ধাচারণ করে অপ্রিয় হবার সাহসেরও অভাব আছে।—ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল্, ১৯২০ থেকে ১৯৩৪, ৩৮৬ পৃঃ।

রাজেনবাবু লিখেছেন,—"স্বাধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। আত্ম-সমর্পণ অথবা বশ্যতা স্বীকার করবার মতও কিছু ঘটেনি। আমার মনে হয় না যে, আমরা অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ববর্তী মনোভাবে ফিরে গেছি। ১৯২৩ থেকে ১৯২৮এর অবস্থাও আমরা স্বীকার করে নিইনি।...নতুন শাসনবিধি চালু এবং কার্যকরী করবার কাজ ছাড়া বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটির আর কোন কাজ নেই, একথা বলা বা অনু-মান করা ভুল হবে, হবে একতরফা সমালোচনা।...সংস্কার প্রবর্তিত-হবেই। এ-অবস্থায় কি করব? চুপ করে বসে থাকব? সেটা কি সম্ভবপর...? বিদেশে প্রচার চালাবার কথার উত্তরে এই কথাই শুধু বলতে পারি যে, ও-সম্পর্কে আমাদের বেশি-কিছু করবার নেই। প্রথম, অর্থাভাব। দ্বিতীয়, ফলপ্রসূ কিছু করবার মত জানাও কিছু নেই।...(১)

চিঠিখানা পড়লেই বোঝা যায় যে, জহরলাল নিজেই সমস্যাগুলি উত্থাপন করেছিলেন; এবং এই পত্রের ভূমিকায় জহরলাল নিজেই লিখেছেন যে, ইওরোপ থেকে গান্ধীজিকে এই-সব বিষয় উল্লেখ করে যে-পত্র তিনি লিখেছিলেন, তারই উত্তর দিয়েছেন রাজেনবাবু। আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য : এই চিঠি রাজেনবাবু লিখেছেন ১৯৩৬-এর প্রাক্কালে, যে-১৯৩৬এর মার্চ মাসে জহরলাল সভাপতির পদে মনোনীত হন।

জহরলালকে পাওয়া গেল না। না যাক। দেশের মুক্তিই তো একমাত্র সমস্যা। মুক্তি-পথে কে এল, আর কে এল না, এ বিচার করবার প্রয়োজনীয়তা আর নেই। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে। ব্যক্তি-পূজোও হয়তো থাকবে। কিন্তু মুক্তির ডাক একবার যে শুনেছে, তার কাছে ওর মূল্য খুব বেশি বা বড় নয়। যুবশক্তি এগিয়ে চলে।

বস্তুত ১৯৩০ থেকেই এই নতুন ভাবধারা অনেকের মনে জাগতে

(১) বাঞ্চ অব্ ওল্ড্ লেটার্স—১৫৮ পৃঃ।

চেয়েছে। বেশি করে দিল্লী-চুক্তির পর থেকে। সেদিন পর্যন্ত চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার উর্ধ্বে ওরা বেশি কিছু দেখতে পায়নি। ১৯৩৫এ ওরা অনেকটা সচেতন। আত্মবিশ্বাস জাগতে শুরু করেছে। শুরু করেছে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে। ব্যক্তি-প্রভাবমুক্ত এক স্বতন্ত্র মানুষকে দেশের যুবশক্তি খুঁজে পেয়েছে নিজের ভেতর। দেশ-বিদেশের রাজনীতির নানা বিশ্লেষণ আর আন্তর্জাতিক ঘটনা-প্রবাহ তাকে সচেতন করে তুলেছে। ফাঁকা কথা বা গাল-ভরা আদর্শের কপ্‌চানি আর সে যথেষ্ট মনে করতে চায় না। পুরানো সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবী গল্প তাকে তৃপ্তি দেয় না। বাংলার বহু যুবক সেদিন কারাগারে। কারাগার আর আটক-আবাসের পাঁচিল ও বাধা-নিষেধ অতিক্রম করে এই নতুন আদর্শ যুবশক্তির অন্তরে জাগাল নবতম সাড়া। সে খুঁজে পেল পথের সন্ধান। খুঁজে পেল তার চলার পথের ইঙ্গিত।

সেদিনকার বাংলায় বিজ্ঞ আর প্রাজ্ঞ যে-সব বিপ্লবী নেতা ছিলেন, তাঁদের চোখের সম্মুখে দলে দলে ছেলেরা বেরিয়ে গেল নতুন পথে। বাধা তাঁরা দিতে চাইলেন, পারলেন না। ছেলের দল যাবার সময় ভক্তিভরে এইটুকুই দাদাদের জানিয়ে গেল যে, তারা কোনদিনই তাঁদের অবদান অস্বীকার করবে না। সবাই যখন ঘুমিয়েছিল, ওঁদের ডাকেই একদা দেশের সুপ্ত প্রাণ-দেবতা জেগে উঠেছিল। ওঁদের কাছ থেকে দেশকে চেনবার ও জানবার সুযোগ তারা পেয়েছে। এজন্যে তারা কৃতজ্ঞ। তাঁদের উদ্দেশে পুজো দেবে অনেকদিন ধরে—স্মৃতিপুজো। কিন্তু বর্তমানকে তাই বলে তারা অস্বীকার করবে কেমন করে?

স্কুল-কলেজের ছেলের দল আর মুষ্টিমেয় ভদ্রঘরের বাইরে রয়েছে যে বিরাট ও বিপুল আর একটা জগৎ, এ-বারতা তাদের তো অজ্ঞাতই ছিল। সে-জগৎ তারা জানত না। জানত না শ্রমের মূল্য, জানত না পুঁজিবাদ, জানত না শোষক আর শোষিতের ব্যবধান। জানত না আরও কত কি? স্বাধীনতা বলতে যে শুধু ইংরেজ-বিতাড়নই নয়, এ-কথাও তো কেউ তাদের বলেনি। সবটা না হোক, খানিকটা তারা

বুঝেছে। আর বুঝেছে বলেই গান্ধী বা দাদারা বলেছেন বলেই নির্বিবাদে আর নির্বিশেষে সব কথা মেনে নিতে পারে না ওরা।

ওরা জানে যে, এমনিই দেরি হয়ে গেছে। বিশ্বের সবাই যা শিখল, যা জানল অনেক আগে, তাদের তা জানা হয়নি। জানবার অবকাশও পায়নি। এই মুহূর্তের জানাও যে যথেষ্ট নয়, এ-কথাও তারা জানে। আরও জানে যে, চিরদিন তারাও নবীন থাকবে না। তারাও হবে পুরানো, বাসি। সেদিনকার নবীন আসবে এগিয়ে। যুগে যুগে এমনি করেই নতুন আসে। আবার পুরানোও হয়। এগিয়ে আসে নবতম নতুন। ভুল তারা করে। পথ তারা ভোলে। ভুল পথে চলে তারা মরেও। তবু সাবধানীর সাবধান-বাণী তারা শোনে না। তবু চলে। চলা তাদের ধর্ম।

নতুন ভাব নিয়ে গান্ধী এসেছিলেন। বাসি-পচারা ছিটকে পড়ে থাকল পেছনে। গান্ধীরও পথ আগলে বসে থাকলে চলবে না। নতুনের আসবার পথ ছেড়ে দিতে হবে। স্বীকার করে নিতে হবে ওর জয়যাত্রা।

১৯২৮এ যে-যাত্রা শুরু হয়েছিল সামান্য ক'টির, দেশ জুড়ে সেই ক'টি কোটীতে দাঁড়াল। সর্বপ্রথম গান্ধী দেখলেন, কংগ্রেসের ভেতর থেকে এমন একটি শক্তি এগিয়ে আসছে, যার কাছে তাঁর এতদিনের মতবাদ খুব বেশি মূল্যবান তো নয়ই, যুক্তিযুক্ত বলেও আর সে মনে করে না। চারপাশে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে তন্ন তন্ন করে দেখেন। তাঁর গোষ্ঠীর প্রত্যেককে বিশ্লেষণ করেন, বিচার করেন। বল্লভভাই, আজাদ আর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শঙ্কর রাও আর কৃপালনী,—আর না। এই ভাব-বন্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে কারও নেই। একটিমাত্র লোক তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে—জহরলাল। জহরলালকে তাই আবার কংগ্রেসের সভাপতি না করে গান্ধীর গত্যন্তর ছিল না।

এই কংগ্রেসের প্রাক্কালে বাংলা থেকে গান্ধীর কাছে গেল এক

সনির্বন্ধ অনুরোধ। এ অনুরোধ যাঁরা জানিয়েছিলেন তাঁদের পুরো-ভাগে ছিলেন গান্ধী-গুরু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর ছিলেন এ্যানড্রুজ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। বাংলার আশা ও ভরসা সুভাষ নির্বাসনে। চিরদিন তিনি কি নির্বাসনেই জীবন কাটাবেন? দেশের কোলে কোনদিনই ফিরে আসবেন না? তাঁকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাও কেউ করবে না?

ইংরেজ কংগ্রেসকে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সেই কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষকে মনোনীত করলে হয় তো ইংরেজ আর কোন কারণে না হোক নিছক চক্ষু-লজ্জা বা লোকমত রঞ্জনের জন্যেও সুভাষের নির্বাসন-দণ্ড বাতিল করে দেবে।(১)

কিন্তু গান্ধীকে অত সহজে ভোলানো যায় না। চালে তিনি ভুল করতে চান না। সুভাষের বিবৃতি তিনি ভোলেননি। ভোলা একটু কষ্টকরও বইকি। তা ছাড়া সামনে ক্ষমতার লড়াই এগিয়ে আসছে। নিছক গণ-আন্দোলন বা ভাবপ্রবণ দেশমাতৃকার বন্দনা নয় এ-লড়াই। এ-লড়াই বস্তুতান্ত্রিক। নিরেট, স্পষ্ট, কঠিন বস্তু-তান্ত্রিক। মন্ত্রিত্বের লড়াই। গদীর লড়াই। আংশিক হোক, তবু রাজকীয় শক্তি দখলের লড়াই। এরই প্রাক্কালে সুভাষকে সভাপতির তক্‌ত্‌-এ বসিয়ে নিজের পরিকল্পনা ও দলকে বিপন্ন করা তিনি পছন্দ করেন না। জহরকে দিয়েও ঝুঁকি আছে, কিন্তু গান্ধী চেনেন জহর-লালকে। আর জানেন আরও বেশি। কিন্তু সুভাষ?—না। যে-প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে থাকে, চলতি প্রথা ছিল, সেখানকার কোন লোককে সভাপতি না করা। সামান্য প্রথার চাইতে প্রয়ো-জনীয়তা বড়। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতির পদ জহরলালকে দেবার সময় গান্ধীজি এতকালের এ-প্রথার কথা বেমালুম ভুলে বসে থাকলেন।

(১) কংগ্রেস-সংগঠনে বাংলা—লেখক শ্রীচপলাকান্ত ভটাচার্য, ২২ পৃঃ।

জহরলাল সভাপতি মনোনীত হয়েছেন জেনে সুভাষের আনন্দের সীমা নেই। সম্পূর্ণ গান্ধী-প্রভাবমুক্ত নন জহরলাল, তবুও তিনি জহরলাল। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আর কর্মক্ষমতা নেতার অজানা নয়। সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে দুজনের মধ্যে। বর্তমানের কথা হয়েছে। হয়েছে অনেক ভবিষ্যৎ-সমস্যার আলোচনা। জহর-লালের স্বদেশ-যাত্রার পূর্বে নেতা এক চিঠি লিখলেন ওঁকে।

কুর হ্যানস্ হকল্যাণ্ড
বাদগাদস্টিন্
৪ঠা মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জহর,

দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর ভ্রমণের পর আমি এখানে পৌঁছেছি। জায়গাটা ভারি চমৎকার আর নির্জনও। তুমি তো দেশে ফিরে যাচ্ছ। আর সেখানে গিয়েই মেতে উঠবে কাজের ডামাডোলে। যাবার আগে এখানে কয়েকদিন থেকে গেলে পারতে তুমি। বিশ্রাম হতো।

তোমার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। ঐ আলোচনার মর্ম একটা বিবৃতির আকারে প্রকাশ করলে কেমন হয়? আবার আমাকে কারাগারে যেতেই হবে। তার আগে আমার বলবার কথা বলে যেতে চাই। বলে যেতে চাই যে, আমি তোমাকে পুরোপুরি সমর্থন করে যাব।

আজকের যাঁরা নেতৃত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার ওপরেই আমি ভরসা রাখি। তুমিই পারবে কংগ্রেসকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে। তা ছাড়া, তোমার স্থান আজ সত্যিই অদ্বিতীয়। আমার বিশ্বাস মহাত্মাজিও তোমাকে খানিকটা তোয়াজ করেই চলবেন। আমি একান্তভাবে এই আশাই করব যে, তোমার নিজস্ব আদর্শানুযায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তোমার ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করবে বিনা দ্বিধায়। নিজেকে তুমি ভুল বুঝো না। দুর্বল

ভেবো না। তোমাকে হারাতে হবে এমন কাজ গান্ধীজি করতে নিশ্চয়ই দ্বিধা করবেন।

আমাদের শেষবারের আলোচনার সময় তোমার আশু করণীয় কাজের মধ্যে দুটোর ওপর আমি জোর দিয়েছিলাম বেশি করে। এক,—(মন্ত্রিত্বের) গদি দখলের চেষ্টা যেমন করেই হোক ভণ্ডুল করতে হবে। দুই,—ওয়ার্কিং কমিটিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এ-দুটো কাজ যদি তুমি করতে পারো, অধঃপতনের পথ থেকে কংগ্রেসকে তুমি বাঁচাতে পারবে। পঙ্ক থেকে করতে পারবে উদ্ধার।

কংগ্রেসের একটি বৈদেশিক দপ্তর তুমি খোলবার সঙ্কল্প করেছ জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছি। তোমার এ সঙ্কল্পের সঙ্গে আমার মনোভাবের রয়েছে অঙ্গাঙ্গী মিল।

আর না। সামনে তোমার অনেক কাজ। দেশে ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। নিরাপদে দেশে ফিরে যাও, আমার অন্তরের কামনা। যে কঠোর কর্তব্য তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে তুমি নির্বিঘ্নে তা সমাধা করো। যদি আমি লক্ষ্ণৌ যাবার সুযোগ পাই, আমি দাঁড়াব তোমার পাশেই।

তোমার স্নেহসিক্ত

সুভাষ (১)

সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে। যেতে হবে দেশে, ভারতবর্ষে। ইংরেজের খেয়াল-খুশি পরিতৃপ্ত করবার জন্যে বিদেশে এই নির্বাসনের জীবন আর কতদিন বহা চলবে? তাঁর দেশ তাঁকে ডাকছে। ডাকছে আকুল হয়ে, হাত বাড়িয়ে। প্রাণের ভেতর থেকে গুমরে ওঠে একটা অব্যক্ত কাতরতা। চোখে ভেসে ওঠে জন্মভূমির স্নেহসিক্ত শ্যামল রূপ। সুভাষ তৈরী হন।

কিন্তু ডাক এসে পড়ে আয়র্লণ্ড থেকে। ডি, ভ্যালেরার ডাক।

(১) বাঞ্চ অব্ ওল্ড্ লেটার্স, ১৬৬ পৃঃ।

আয়র্লণ্ডের মুক্তি-প্রতিষ্ঠাতা ডি, ভ্যালেরা। ডাবলিনে নেতা পৌঁছেন ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৩৬এর ফেব্রুয়ারী। সে-এক রাজোচিত সংবর্ধনা। ডাবলিনের মেয়র আর রাজকর্মচারীরা ষ্টেশন থেকে নেতাকে নিয়ে যান রাজভবনে। দীর্ঘ আলোচনা চলে ডি, ভ্যালেরার সঙ্গে। সদ্য মুক্তি পেয়েছে আয়র্লণ্ড। মুক্তি পেয়েছে বৃটিশের কবল থেকে। ছ'টা শতাব্দী প্রাণপণে সংগ্রাম চালিয়েছে এই আয়র্লণ্ড। ক্ষুদ্র আয়র্লণ্ড। কত বিদ্রোহের ঝড় বয়ে গেছে ওর ছোট্ট বুকের ওপর দিয়ে। ইংরেজ তার ভারি বুটের তলায় নিষ্পেষিত করেছে ওর বুক-খানা। রক্তাক্ত করেছে ওকে। করেছে সর্বস্বান্ত। লেলিয়ে দিয়েছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। গোটা জাতটাকে নির্বাসন আর কারাদণ্ড দিয়েও পরিতৃপ্ত হয়নি। অবশেষে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ওকে দংশনে দংশনে পাংশু করে দিয়েছে ইংরেজ। তবু ও টলেনি। হার মানেনি। সংগ্রাম ছাড়েনি। সেই আয়র্লণ্ড।

ডি, ভ্যালেরা ছাড়াও কথা হয় সংস্কৃতি আর স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রীদের সঙ্গে। আর হয় সিন্‌ফিন্ সঙ্ঘের মন্ত্রীদের সঙ্গে। 'আইরিশ প্রেসের' সম্পাদক নেতাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানান। সর্বশেষে আপ্যায়িত করেন রিপাবলিকান পার্টির সভ্য-বা চির-বিদ্রোহী রিপাব্-লিকান পার্টি। যারা ভোলেনি খণ্ডিত আয়র্লণ্ডের শোনিতাপ্লুত ভগ্ন-দেহের কথা।

দেশে ফেরবার সময় জহরলাল সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন যে, লক্ষ্নৌ কংগ্রেসে সুভাষ যেন উপস্থিত হবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ হয়ত পথ আগলে দাঁড়াবে। যদি না দাঁড়ায়,—হোক না সে-সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত, তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি? নেতা তৈরী হতে থাকেন। যাত্রার দিন-কয়েক পুর্বে ভিয়েনার ইংরেজ রাষ্ট্রদূত নেতাকে পত্রযোগে জানালেন,—

"বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর থেকে আজই আমি আদেশ পেয়েছি আপনাকে জানাতে যে, আপনার অভিপ্রেত ভারতে প্রত্যা-

বর্তনের প্রস্তাব তাঁরা অনুমোদন করেন না। এ-বিষয়ে আপনাকে সতর্ক করে দেবার আদেশ আমি পেয়েছি। সরকার খুব স্পষ্ট করে এ-কথা আপনাকে জানাতে বলে বলেছেন যে, স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে।

(স্বাঃ) জে, ডবলিউ টেলার

কালবিলম্ব না করে নেতা জহরলালকে পত্র লেখেন। কারাগারে থাকতে তাঁর আপত্তি নেই। তবু তো ভারতবর্ষের কারাগার। দেখতে পাবেন ভারতের আকাশ। স্পর্শ পাবেন দেশের মাটির। কানে ওঁর বাজতে থাকে একটিমাত্র কথা : তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী। কিন্তু কারাজীবন বরণ করে নিলে সত্যিই কি দেশের উপকার হবে? আর এই সময়ে? এখানকার কাজের তো অবধি নেই। গণ্ডী-ঘেরা স্বাধীনতার মধ্যে যদিও এখানকার বাস, তবু এ-যে ইওরোপ। চারদিকে মুক্তি। অবাধ, অসঙ্কুচিত মুক্তি। ইংরেজের খেয়ালী আদেশ অমান্য করে কারাবরণের মধ্যেও সার্থকতা যে নেই, তা নয়। আছে। কিন্তু—। দোমনায় তুলতে থাকে নেতার মন। বন্ধু জহরলালকে লেখেন,—

"আমার ব্যক্তি-জীবন ও সম্পর্ক ভুলে যাও। আমি জানি দেশের স্বার্থে ও-কথা কেমন করে তুমি ভুলতে পারো। দেশের ও দশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বলো তো, এ-অবস্থায় আমি কি করব? দেশের এক বিশেষ ক্ষেত্রে তুমি আজ দাড়িয়ে আছ। আর সে-ক্ষেত্র সর্বোচ্চ। আমার এ ব্যাপারের বিচার-ভার তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। তা ছাড়া তোমার একটা দায়িত্বও আছে। এ এক অদ্ভুত আর অস্বস্তিকর অবস্থা।(১)

এ-চিঠি লেখেন নেতা ১৯৩৬এর ১৬ই মার্চ।

ইংরেজের গুপ্তচর বিমানক্ষেত্র ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভব হলে

(১) বাঞ্চ অব্ ওল্ড্ লেটার্স—১৬৯ পৃঃ।

তারা বাধা দিতেও পেছপা হবে না। সংবাদপত্রে আগেই বেরিয়েছিল যে, সুভাষচন্দ্র খুব সম্ভব বিমানে ভারতাভিমুখে রওনা হবেন। জহরলালকে যে-চিঠি নেতা লেখেন, তাতেও লিখেছিলেন যে, ২রা এপ্রিল কে, এল, এম বিমানে রওনা হলে ওঁর অনেকটা সুবিধা হবে। পাঁতি পাঁতি করে ইংরেজের গুপ্তচর রোমের বিমানক্ষেত্র খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সুভাষচন্দ্রের পাত্তা মেলে না। হতাশ হয়ে ওরা ঘরে ফিরে যায়। সুভাষ বোস ততক্ষণে জাহাজে। ইতালিয়ান জাহাজ। কন্টিভার্ড।

যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে নেতা 'মান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ানে' লিখে গেলেন এক চিঠি।

"১৯৩২এর ২রা জানুয়ারী ভারতবর্ষে আমাকে বন্দী করা হয়। ১৯৩৩এর ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমাকে ভারতবর্ষের কারাগারে আটকে রাখা হয় বিনা বিচারে। কোন্ অভিযোগে বন্দী করা হ'ল এবং বিনা বিচারেই-বা কেন আটকে রাখা হ'ল, বার বার এ-কথা জানতে চেয়েছি ভারত-সরকারের কাছ থেকে। কোন জবাবই পাইনি। এই বন্দিদশায় আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে সরকার কয়েকবার মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে এবং পরীক্ষার পর ঐ বোর্ডই মত প্রকাশ করে যে, হয় আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক অথবা চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক। তদনুযায়ী সরকার আমার ওপর থেকে আটক-আদেশ প্রত্যাহার করে। আমি ইওরোপে চলে আসি। গত তিন বৎসর আমি ইওরোপে আছি। এই সময়ের মধ্যে একবার মাত্র আমি দেশে গিয়েছিলাম, ১৯৩৪এর ডিসেম্বর মাসে মুমূর্ষু পিতাকে দেখবার জন্যে। ছয় সপ্তাহ সেখানে ছিলাম। আর এই ছয় সপ্তাহই আমি আমার নিজের গৃহে বন্দিরূপে কাটিয়েছি।

বর্তমানে আমি স্বদেশে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। আর তারই পূর্বক্ষণে এল এই সরকারী হুমকি। আমার সর্বশেষ কারাদণ্ড শুধু ন্যায়-বিগর্হিতই ছিল না, ছিল আইনের চোখে ও নীতির দিক থেকে একান্তই দুষ্ট ও দোষল। কিন্তু এবারকার এই হুমকি সব নজির ছাড়িয়ে গেছে।

একটা কথা শুধু আমার মনে জাগছে,—অতীতের নয়,—ভবিষ্যতেও কি এমনিধারা শাসন-পদ্ধতি ভারতবর্ষে ইংরেজ চালাবার মনস্থ করেছে? নতুন সংস্কারবিধি নাকি চালু হবে। তার ভবিষ্যৎ রূপের পূর্বাভাস কি এর ভেতর থেকে উঁকি দেয় না?"

১৯৩৬এর ১১ই এপ্রিল কন্টিভার্ডে বম্বের ঘাটে এসে ভিড়ল। কাতারে কাতারে জনতা জাহাজ-ঘাটে ছুটে গেল। জমল পথে ঘাটে প্রান্তরে। কিন্তু জেটিতে ঢোকবার অনুমতি পেল না কেউ। পুলিশের বিরাট বহর আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। কালো একখানা ঢাকা-গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ীর দরজা খুলে গেল। নেতাকে ঢোকানো হল সেই বদ্ধ গাড়ীর ভেতর। চারদিকের কাচ তুলে দেওয়া হল। দুপাশে বসল জবরদস্ত দুজন পুলিশ অফিসার। গাড়ী চলল আর্থার রোডের ফাঁড়ির দিকে।

ধিক্কার আর অভিশাপ হতাশ-ক্রুদ্ধ জনতার কণ্ঠ থেকে ছিটকে বেরোল। শত-সহস্র অসহায় দেশবাসীর প্রিয় নেতা সুদীর্ঘ নির্বাসনের পর তাদের কাছে ফিরে আসাছলেন। মাঝ পথে ইংরেজ ছোঁ মেরে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল আবার ওর পাষাণ-কারার অন্তরালে। বাধা কেউ দিতে পারল না।

কারাগৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে সুভাষ বলে গেলেন,—"বাইরের স্বাধীনতার চাইতে আমার দেশের কারাগারও আমার বেশি প্রিয়।"

তেরো

এবারও সেই ৩ (তিন) আইন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পচা ৩ (তিন) আইন। ফাঁড়ি থেকে যারবেদা জেল। তারিখটা ছিল ১৩ই এপ্রিল।

আসন্ন কংগ্রেসের সভাপতি জহরলাল এক বিবৃতি দিলেন সংবাদ-পত্রে। বললেন,—"সারা দেশ জুড়ে যে অবাধ আর তীব্র দমন

নীতির একাধিপত্য চলছে, সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার তার নবতম ও সর্বাপেক্ষা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।”

আসমুদ্র-হিমাচল গর্জে উঠল প্রতিবাদের ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে। সভায়, সম্মেলনে, মিছিলে, জনতার মুখে, সংবাদপত্রে সে-ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ইংরেজের হৃদয়হীন বর্বর আচরণের কঠোর সমালোচনা হল। ওয়ার্কিং কমিটি, সোস্যালিষ্ট পার্টি ও দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একবাক্যে ইংরেজের হিংস্রতার করল তীব্র নিন্দা। কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলী-তে বিরোধী পক্ষের নেতা ভুলাভাই দেশাই মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিলেতেও এ-আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে পৌঁছোতে বিলম্ব হল না। লেবার পার্টির ম্যাক্স্‌টন আর ক্যাম্বলষ্টিকেন্‌ তদানীন্তন আণ্ডার সেক্রেটারী বাটলারের সঙ্গে দেখা করে এই গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। পার্‌লিয়ামেন্টে প্রশ্নোত্তরে সরকার পক্ষের জবাব এল : “সুভাষ বোস সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে জড়িত।” ‘সুভাষ দিবস’ ঘোষিত হল ভারতবর্ষে। সারা দেশ জুড়ে একই দিনে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল একটিমাত্র দাবী : সুভাষচন্দ্রের মুক্তি চাই।

বন্দী দেশ-নায়কের নামের আগে দেশবাসী শ্রদ্ধার উপহার পরিয়ে দিল ‘দেশগৌরব।’

এতেও ইংরেজের টনক নড়ত না ; নড়ল অন্য কারণে। ইংরেজ ১৯৩৫এর সংস্কার আইন চালু করল কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। প্রথম অংশ চালু করতে বেশি বেগ পেতে হবে না, এটা সে আগে থেকেই জানত। আরও জানত যে দ্বিতীয়ার্ধ চালু করা তার পক্ষে সহজ হবে না। ফেডারেল অংশ। রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ কন্‌ফারেন্সে যোগ দেবার পর থেকেই ইংরেজ গান্ধী সম্পর্কে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েছিল। গান্ধীজি ব্যর্থ বিলাপ করেছেন, কঠোর হয়ে মাঝে মাঝে হুমকি দেখাতেও চেয়েছেন, এ-সব সত্ত্বেও ইংরেজ বুঝে নিয়েছিল যে, নতুন সংস্কার-বিধি গান্ধী অগ্রাহ্য করবেন না। সত্যাগ্রহ ও প্রায়োপবেশনের

ধাক্কাও গান্ধীর দিক থেকে আসছিল কখন-সখনও, সে-ধাক্কাও অবলীলা-ক্রমে ইংরেজ সামলে নিয়েছিল। নিতে পেরেছিল এইজন্যেই যে, ও-সবের পেছনে সত্যিকারের শক্তি ছিল না। চটক ছিল, চাতুর্যও খানিকটা ছিল, কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল না। জাতির কেন্দ্রীভূত প্রেরণা শক্তি যোগায়নি।

মুখে পূর্ণ স্বরাজ অহরহ বলেও যেদিন গান্ধী নতুন প্রস্তাবিত সংস্কারের বিশেষ একটি ধারার বিরুদ্ধে প্রায়োপবেশন শুরু করলেন,(১) সেইদিনই ইংরেজ গান্ধীর অন্তরের অনুচ্চারিত অভিপ্রায় ধরে ফেলে-ছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের উদ্ভট ও অসংলগ্ন কংগ্রেসী না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি ইংরেজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, কংগ্রেসের ও গান্ধীজির দুর্বলতা কোথায় এবং কতখানি। অবশ্য এ-সব ছাড়াও প্রত্যক্ষ প্রমাণও ছিল। চিরতরে আইন-অমান্য আন্দোলন নিষিদ্ধ হল, পার্লিয়ামেন্টারী কমিটি গঠিত হল,—এর পরও গান্ধীজি ও গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেস সম্পর্কে ইংরেজের যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল, তাও বিদূরিত হল যখন সে দেখল যে, জহরলালকে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে।(২)

(১) নতুন সংস্কার-বিধির প্রতিনিধিত্বের ধারায় হিন্দু-সমাজ থেকে অনুন্নতদের পৃথক একটা সম্প্রদায়ে পরিণত করে তাদের জন্যে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেবার প্রস্তাব ছিল। এরই প্রতিবাদে গান্ধীজি ১৯৩২এর ২০শে সেপ্টেম্বর পুনা জেলে প্রায়োপবেশন শুরু করেন।

(২) ১৯৩৬এর ৬ই ডিসেম্বর বন্ধু এডোয়ার্ড টম্‌সন জহরলালকে লেখেন,—
·········কংগ্রেসের অবস্থা ক্রমশ হয়ে পড়ছে ঘোরালো। কংগ্রেসের পথ জন-সাধারণের কাছে গোলক-ধাঁধার ন্যায় হয়ে উঠেছে। আর এর ফলে মানুষ স্বভাবতই সন্দিগ্ধ না হয়ে পারছে না। কংগ্রেসীরা যে-ভাষায় কথা বলে, তার অর্থ একটাই হওয়া উচিত, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় যে, তাদের কথা আর কাজের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটার্স—২০৭ পৃঃ।

ইংরেজের দুশ্চিন্তা গান্ধীকে নিয়ে ততটা ছিল না, যতটা ছিল সুভাষচন্দ্র আর জহরলালকে নিয়ে। কিন্তু সুভাষ নির্বাসিত। আইনত নয়, কার্যত। ইংরেজ তাঁকে দেশে আসতে দেবে না। যদি এসেও পড়েন, ওঁর স্থান হবে কারাগারে। সোস্যালিষ্ট পার্টিও এগিয়ে আসছে। ইংরেজ তখনও ওকে ভয় করতে চায়নি ; মাত্র অস্বস্তিকর। বাকি রইলেন জহরলাল। কিন্তু জহরলালের মনের কথা ইংরেজ জেনেছে : জহরলাল আর সুভাষের মতৈক্য। ইওরোপে বসে ওঁরা নতুন করে ভারত-সমস্যা বিচার করেছেন ; ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে এসেছেন। জহরলাল নিয়মতান্ত্রিক বা পার্‌লিয়ামেন্টারী আন্দোলনের বিরোধী। সুভাষের ত কথাই নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জহরলালকে নিয়ে ইংরেজ বিব্রত হয়ে উঠেছিল। আরও আছে।

ভারতবর্ষের বহু স্থানে নতুন ভাব ও চেতনা জেগেছে। গান্ধী-নেতৃত্বের ব্যর্থতার ওপর এদের জন্ম। জেগেছে, কিন্তু দানা বাঁধেনি। উপযুক্ত নায়কের অভাবে একটা কার্যকরী বলিষ্ঠ পার্টিতে ওরা পরিণত হতে পারেনি। ওরা যদি জহরলালের নেতৃত্ব পায়, গান্ধীর পক্ষে আর নেতৃত্ব করা সম্ভবপর হবে না। ভারতবর্ষের নব-জাগরণ ইংরেজ রোধ করতে পারবে না,—এ-কথা ইংরেজের অত্যন্ত জানা। নেতা গান্ধীর ওপর ইংরেজ ভরসা রাখে। তার এত সাধের ধাপ্পা—নতুন সংস্কার গান্ধী সফল করবার আশ্বাস না দিলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইংরেজ জানে সংস্কার-বিধি চালু না হলে আবার তাকে নামতে হবে রণাঙ্গনে। ইংরেজ তা চায় না। গান্ধীও না।

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছরের কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে একটুখানি স্বস্তির আশ্বাস সবে পাওয়া গেছে। স্বরাজ হয়নি, রামরাজ্য আসেনি,—পূর্ণ-স্বরাজ ত নয়ই। একেবারে শূন্য হাতে ব্যর্থতার এক সীমাহীন ধিক্কারের নীচে তলিয়ে যাবার চেয়ে, হয়ত অন্তঃসারহীন, অপদার্থ আর প্রতিক্রিয়া-শীলও,—তবু ইংরেজের দেওয়া ঐ সংস্কার গ্রহণ না করলে দেশকে কি দিয়ে বোঝাবেন গান্ধী তাঁর প্রবর্তিত পথের ও মতের সার্থকতা ?

বিশাল ভারতবর্ষের অন্তত গোটা-দশেক প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবে তাঁর একান্ত বংশবদ আর অনুগ্রহভোগী। তাঁর মুখের কথায় আর অঙ্গুলী-হেলনে চলবে প্রায় গোটা দেশ। সংস্কার স্বীকার করা ছাড়া গান্ধীর অন্য উপায় ছিল না।

কিন্তু গান্ধী ভাবছেন জহরলালের কথা। তিনি জানেন জহর-লালকে, আর চেনেনও। চিন্তার রাজ্যে এই লোকটি যে পরিমাণে স্বাধীন ও সাহসী, বাস্তবক্ষেত্রে আর তাঁর সম্বন্ধে সেই পরিমাণে অসহায় ও দুর্বল। ১৯২৮এর কথা গান্ধী ভোলেননি। ভোলেননি '২৯এর কথা। সেদিনও ঐ সুভাষ বোস জহরলালকে টেনে নিয়েছিলেন। টেনে নিয়েছিলেন তার আওতা থেকে প্রায় ছিনিয়ে। শেষ-রক্ষা করতে সুভাষ পারেননি।

১৯২৮এ স্বাধীনতার সংশোধনী প্রস্তাব সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উথাপন করবার পর জহরলাল সে-প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ভোটের বেলায় আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুজনে মিলে গড়ে তুলেছিলেন 'স্বাধীনতা সঙ্ঘ।' পরক্ষণেই, ১৯২৯এ, সর্বদলীয় নেতৃবর্গের ডোমিনিয়ম ষ্টেটাসের দাবী সমর্থন করে স্বাক্ষর দিয়ে বসলেন জহরলাল। এই সম্পর্কে পরে তিনি যে-চিঠি লিখেছিলেন গান্ধীকে, তা শুধু করুণ নয়, অসহায় জহরলালের এক মর্মন্তুদ চিত্র। পত্রখানির ভূমিকায় জহরলাল লিখেছেন,—"অনেক ইতস্তত করে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি নেতৃবর্গের বিবৃতিতে সই দিয়েছিলাম। সুভাষ বোস দিতে অস্বীকার করেছিলেন। সই দিয়ে আমি ভয়ানক অস্বস্তি অনুভব করতে থাকি, আর তারই ফলে এই চিঠিখানা লিখি গান্ধীজিকে।"

"নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি,"
৫২ হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ,
৪ঠা নভেম্বর, ১৯২৯

"প্রিয় বাপুজি,

গোটা দুদিন ধরে আমি ভেবেছি। দুদিন আগের চেয়ে আজ

আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বিষয়টা ভাবা ও গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু এখনও চিত্তের অস্থিরতা কমেনি। নিয়মানুবর্তিতার ওপর জোর দিয়ে আপনি ব্যাপারটা আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমিও তখন সেটা উপেক্ষা করতে পারিনি। আমি নিজেও ওটার সার্থকতায় বিশ্বাসী। কিন্তু ওটার বাড়াবাড়িও মাঝে মাঝে দেখা যায়। গত রাত্রের আগের রাত্রে কি যেন সহসা আমার অন্তরের ভেতরটা ভেঙ্গে দিয়েছে। কিছুতেই সেই ভগ্ন স্থান আর জোড়া লাগল না।··· আজ আমি বেশ বুঝতে পারছি, একজনের পক্ষে একই সময়ে নানা পথে আর বিভিন্ন মতের পেছনে ছোটার বিপদ কত। (It is not possible to ride a number of horses at the same time.)

"আগে এতটা বুঝিনি।··· কতটা যে ভুল করেছি গত পরশু, তা ভালো করেই বুঝতে পারছি আজ। প্রয়োজনীয়তা কিংবা নীতির দিক থেকে বিবৃতি সম্বন্ধে আমি আর কিছু না বললেও এ-কথা আজ বলবই যে, এ-বিষয়ে আপনার আর আমার মধ্যে রয়েছে একটা আদর্শগত পার্থক্য। আপনাকে স্বমতে আনবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু এই কথাই বলব যে, ঐ বিবৃতি শ্রমিক গভর্ণমেন্টের ঘোষণার প্রত্যুত্তরে শুধু ক্ষতিকরই হয়নি, হয়েছে আমাদের পক্ষে, অযোগ্য। আমার অন্তরের বিশ্বাস এটা।·········যে ভয়ানক ফাঁদে আমরা পা দিয়েছি, তা থেকে রেহাই পাওয়া সহজ হবে না। এবং এ-কথা আমরা বিশ্বের কাছে বেশ ভাল করেই স্পষ্ট করে তুলেছি যে, লম্বা লম্বা বুকুনি আমরা যতই কেননা ঝাড়ি, আসলে কিন্তু আমরা কৃপা-কণার ভিখিরী।·········আমি বেশ বুঝতে পারছি, দিন দিন কংগ্রেসের ভেতর আমার অবস্থা কতখানি অসহনীয় হয়ে দাঁড়াবে। সভাপতির পদ গ্রহণ করবার সময় অন্তরে আমার দ্বিধা ছিল। তবুও আশা করেছিলাম যে, হয়ত পরবর্তী বৎসর আমরা একটা অকপট আদর্শ নিয়ে সংগ্রামে নামতে পারব। সে-আদর্শের আর কিছু অবশিষ্ট

রইল না। সে-আদর্শ আজ মেঘাবৃত, সংশয়ে আচ্ছন্ন। আর তাই, যে-কারণে কংগ্রেসের সভাপতি হতে আমি রাজী হয়েছিলাম তারও সমাধি হয়ে গেছে।

"'নেতৃ-সম্মেলনের' সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতটুকু? ওখানে যে আমি যাই, তাই-বা কোন্ অধিকারে? আর গিয়েও ত সোয়াস্তি পাইনে। আমার মনের কথা বলতে ভরসা হয় না। চেপে রাখি। ভয় পাই, পাছে ওঁদের কোনও অসুবিধে ঘটিয়ে ফেলি। নিজেকে চাপতে গিয়ে আমি নিজের ওপরেই অবিচার করি। অনেক সময় মনের আর মুখের সঙ্গতিও থাকে না।

"এই অবস্থায় কংগ্রেসের সম্পাদক হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমি পদত্যাগ করলাম।"...(১)

পত্র-শেষে সভাপতির পদে থাকাও তাঁর পক্ষে যে কতখানি কষ্টকর হবে, জহরলাল সে-কথাটুকুও লিখেছিলেন, এবং ও-পদের শৃঙ্খল থেকে ওঁকে মুক্তি দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধও জানিয়েছিলেন গান্ধীজিকে।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মহান্ ব্যক্তিত্বের তড়িৎস্পর্শে অনতি-বিলম্বে জহরলালের ভগ্ন হৃদয়ই শুধু জোড়া লাগেনি,—সভাপতির অবাঞ্ছিত পদও বোধ হয়েছিল যেন মধুর ও লোভনীয়।—সেই জহরলাল। এ-জহরলালকে গান্ধী চেনেন। জানেন আরও ভাল করে।

১৯২৯এ যা হয়নি, ১৯৩৬এও তা হবে না। ১৯২৯এর চাইতে ১৯৩৬এর কাজ সহজ আর অর্থপূর্ণ। সেদিন ছিল একান্তই আদর্শের পূজো। আর ১৯৩৬ নিয়ে আসছে ক্ষমতার, স্পর্ধার, আর আংশিক হলেও সাফল্যের উপঢৌকন। ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে, আর সর্বোপরি তাঁর—মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে জহরলাল যাবেন না,—

(১) বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স—৭৪ পৃঃ।

যেতেও পারবেন না, এ বিশ্বাস ও ধারণা গান্ধীর না থাকবার কথা নয়।(১)

এই জহরলালকে সত্যিই যদি গান্ধী নিজের কুক্ষিগত করতে পারেন, যদি পারেন পূর্ণগ্রাস করতে,—ইংরেজ বাধা তো দেবেই না, বরং সাহায্য করতেও পেছপা হবে না। তার নব-বিধানের সবচেয়ে বড় কাঁটা অপসারিত করতে গিয়ে হয়ত খানিকটা ঝুঁকি নিতে হবে। কিন্তু এ-ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া সেদিন আর কোন পথ ইংরেজের কাছে

(১) লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হবার পর ২১শে এপ্রিল মশ্‌লিপত্তমের এক জনসভায় গান্ধী-গোষ্ঠীর অন্যতম বিশ্বস্ত সভ্য ডাঃ পট্টভি সীতারামায়া বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—

"পণ্ডিত জহরলাল যখন বিদেশে ছিলেন, তখন থেকেই পত্রালাপের মাধ্যমে এ-কথা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী। এ-সত্ত্বেও গান্ধীজি কংগ্রেস-সভাপতি-পদপ্রার্থী অন্যান্য সকলের নাম প্রত্যাহার করাবার জন্যে এবং জহরলালকে নির্বাচিত করতে পরোক্ষে চাপ দেন। এ-কথাও অনেকেরই জানা যে, গান্ধীজি প্রত্যক্ষভাবে জহরলালজির পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন।"

এই বক্তৃতার অন্যত্র ডাঃ পট্টভি প্রকারান্তরে বলেছিলেন যে, গান্ধীজি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী।

অমৃত বাজার পত্রিকা, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৬

এই সময়ে করাচীর বিশিষ্ট নেতা স্বামী গোবিন্দানন্দও বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত জহরলালের মস্তকে (কংগ্রেসের) সভাপতির মুকুট পরাইয়া কৌশলে তাঁর মুখ বন্ধ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। একবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে বাধ্য হইয়াই তাঁহার নিজস্ব মত কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের মতের নিকট তাঁহাকে বিসর্জন দিতে হইবে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য-প্রণীত 'কংগ্রেস-সংগঠনে বাংলা' গ্রন্থের ১৯-২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

খোলা ছিল না। তাছাড়া, জহরলাল ও সুভাষের মিলিত শক্তি অপেক্ষা একক সুভাষ বোস অনেকখানি কম আপদ।

অনেক ভেবে-চিন্তে সুভাষচন্দ্রকে ইংরেজ ঘারবেদা থেকে সরিয়ে আটকবন্দী করল কার্শিয়াং-এ। মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুর নিজের বাড়ী ছিল সেখানে। নেতার থাকবার ব্যবস্থা হল সেই গৃহেই।

দেশের প্রগতিপন্থিমাত্রেই আশা করেছিল যে, জহরলালের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের একটা পরিবর্তন দেখা দেবে। হয়ত কংগ্রেস আবার সংগ্রামমুখী হয়ে উঠবে। কিন্তু সত্যি সত্যি আশা করবার মত তেমন কোন কারণ ছিল না। মহাত্মাজির প্রভাবে দেশের অনেকের মনেই একটা মনোভাব বেশ পাকা ও পোক্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, মহাত্মাজি অভ্রান্ত। অহরহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মিক শক্তির সঙ্গে যাঁর নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ, তিনি ভুল করবেন কেমন করে? আর অতীন্দ্রিয় যোগাযোগের ঐ গোপন সূত্রটি ভুল পথে চলতেই কি দেবে? তা ছাড়া দুই-একটি প্রদেশ ছাড়া অধিকাংশ প্রদেশের কংগ্রেস-কর্মীদের বেশির ভাগই সেদিন ছিল মহাত্মাজিরই সৃষ্টি। ১৯২০এর পর হয় ওদের রাজনৈতিক জন্ম। গান্ধীপূর্ব রাজনীতির সঙ্গে এদের না ছিল কোন সম্পর্ক, না ছিল পরিচয়। আর তাই গান্ধীবাদ ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ তো দূরের কথা, সে-সম্বন্ধে কোন ধারণাও ছিল না। এর ফলে যেদিন গান্ধীজি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ পরিত্যাগ করে নিয়মতান্ত্রিক (পার্লিয়ামেন্টারী) পথে চলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, বিনা প্রতিবাদে গোটা কংগ্রেসের কাঠামো ঝুঁকে পড়ল এ-দিকে। আরও বেশি ঝুঁকে পড়ল এ-পথ সহজ বলে, অনায়াসলব্ধ বলে, অবন্ধুর বলে, আর বিশেষ করে লাভজনক বলে। যে-শক্তি ইংরেজকে চরম আঘাত হানবার কল্পনায় গড়ে উঠতে চেয়েছিল, সেই শক্তি প্রযুক্ত হল ইংরেজের কূটবুদ্ধি-প্রসূত এক তুচ্ছ ও প্রতিক্রিয়া-

শীল শাসন-সংস্কারকে সার্থক করবার জন্যে। আর এই পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল ও সর্বাঙ্গসুন্দর করবার উদ্দেশ্যে সেদিন গান্ধী-গোষ্ঠী-বিরোধী মতের দুই-একজন ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটিতে আর কাউকে স্থান দিল না।(১)

শুধু তাই নয়, নিজ দলভুক্ত এমন লোককেও কমিটিতে নেওয়া চলে না, যে বিন্দুমাত্রও উদ্বেগের কারণ হতে পারে। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হল ১৬ই এপ্রিল, ২০শে এপ্রিল যুক্ত-প্রদেশের রফি আহমদ কিদোয়াই যে চিঠি লিখেছিলেন জহরলালকে, তার ভেতর থেকে জহরলালের আর তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক বিশদ, পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ চিত্র ফুটে উঠেছে। কিদোয়াই লিখছেন,—

"প্রিয় জহরলালজি,

বিগত কয়েকটা দিন বড় অশান্তিতে আমার কেটেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার ওপরেই ছিল আমাদের একান্ত ভরসা। কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনিও আমাদের কাছে মিথ্যা হয়েই দাঁড়ালেন। অবশ্য এ সংশয় অনেকেরই ছিল যে, গান্ধীপন্থীদের সমবেত বিরুদ্ধাচরণ আর গান্ধীবাদের প্রভাব আপনি শেষ পর্যন্ত অতিক্রম নাও করতে পারেন।

আপনার সম্মুখে সত্যিই একটা সুযোগ দেখা দিয়েছিল। ইচ্ছা থাকলে এই সুযোগে আপনার ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটি গড়ে তুলতে পারতেন। ট্যান্ডন, নরীম্যান, পট্টভি ও শার্দুল সিংকে আপনি বাদ দিয়েছেন। গোবিন্দদাস ও শরৎ বোসের স্থলে বেছে নিয়েছেন ভুলা-ভাই আর রাজাগোপালাচারীকে। আপনি তাদেরই সরিয়েছেন যারা আপনাকে শক্তি যোগাতে পারত। গান্ধী-গোষ্ঠী চালাকি করে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। রাষ্ট্রিয় সমিতি ও মূল কংগ্রেসে আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। পূর্বের ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ে এবারকার কমিটি

(১) জহরলালের একান্ত ইচ্ছায় নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অচ্যুৎ পটবর্ধনকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হয়েছিল।

অনেকাংশে প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য।……এ-সম্বন্ধে আমার শেষ কথা আপনাকে জানালাম। আর বলব না।(১)

রফি

ভাবপ্রবণ জহরলাল হয়ত ভেতরের অনেক কথাই জানতেন না। হয়ত দেশ ও জাতির কর্ণধারদের এই কূট কলাকৌশল আর দলীয় পরিচালনা-রহস্য সম্যক আয়ত্ত করতে না পেরে ওদের কথায় সায় দিয়ে থাকবেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে এই প্রতিক্রিয়ার পথে সেদিন জাতিকে পরিচালিত করবার দায়িত্ব পরিহার করা কোনদিনই তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

কিন্তু জহরলাল কিছুই জানতেন না, এ-কথা ভাবা ও মেনে নেওয়া একটু কষ্টকর বৈকি। ৩০শে এপ্রিল গান্ধী চিঠি লিখছেন তাঁর আদরের ভক্ত ও শিষ্যা আগাথা হ্যারিসনকে। এই চিঠিতে গান্ধীজির ইচ্ছা, কল্পনা এবং তাঁর স্বরূপ আর রহস্যে ঢাকা নয়। পরিস্ফুট হয়ে উঠেছেন গান্ধীজি।

"আমার প্রিয় আগাথা,

তোমার ১৭ তারিখের পত্র পেয়েছি।…জহরের ওয়ার্কিং কমিটি (গান্ধী বলেছেন 'ক্যাবিনেট') গঠিত হয়েছে বেশির ভাগ তাদের নিয়ে যারা ১৯২০ থেকে বরাবর রয়েছে। বলা বাহুল্য এই সংখ্যা-গরিষ্ঠদের মতামত আমার মতামতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। ক্ষমতায় কুলোলে নতুন শাসনতন্ত্র আমি এই দণ্ডে ধ্বংস করতে চাইতাম। ওতে এমন কিছু নেই যা আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু জহরলাল আর আমার কর্মপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকি। ভূমি-সংক্রান্ত বা ঐ-প্রকার বিষয়ে ওর আদর্শগত মতামতে আমার আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু কাজের বেলা আমি ওর একটা কথাও শুনব না।…তবে আশার কথা, জহরলাল যখন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে, ও হয়ে ওঠে পুরো-

(১) বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স—১৭৪ পৃঃ।

পুরি চরমপন্থী। কাজের বেলা কিন্তু তা নয়। তখন ও খুব সতর্ক আর সংযতও।…আমার মনে হয়, জহরলাল তার অধিকাংশ সহকর্মীর সিদ্ধান্ত মেনেই চলবে।"

ভালবাসার বাপু (১)

জহরলালের অতি-বড় বিরুদ্ধ সমালোচকও এ-ভাষায় ওঁর সম্বন্ধে কোন কথা বলতে শতবার দ্বিধা করত। এ-চিঠির কথা জহরলালের অজানা ছিল না। একটু ক্ষোভও তিনি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। তবুও তিনি তাঁর সহকর্মীদের মতামত মেনেই চলতে চাইলেন। চাইলেন কিন্তু পারলেন না। বিরোধ দেখা দিল। আর তা দেখা দিল ছ'মাস যেতে-না-যেতে।

জহরলালের চরিত্র চিরদিনই দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা। মাঝে মাঝে এই মানুষটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক আদর্শবাদী, উদার, নির্ভিক সত্তা—স্বপ্ন আর বাস্তবতার সংমিশ্রণে যার রূপ হয়ে উঠেছে অপরূপ। পরক্ষণেই দেখা দিয়েছে ওঁর ভেতর দ্বিধা আর সংশয়, অনিশ্চয়তা আর দুর্বলতা, অসামঞ্জস্য আর সঙ্কল্প-পরাঙ্মুখতা। অসাধারণ লোকপ্রিয়তা সত্ত্বেও কাউকে কোনদিন অনুবর্তী করবার সুযোগ পাননি জীবনে। প্রতিপদে নির্ভর করতে হয়েছে পরের ওপর—ভিন্ন মতাবলম্বী দলের খেয়াল ও মর্জির ওপর।

ভিন্নধর্মী ওয়ার্কিং কমিটির মতামতের ওপর নিজেকে সঁপে দিয়ে জহরলাল কংগ্রেসের সংহতি রক্ষা করতে চাইলেন, চাইলেন মহাত্মাজির সিদ্ধান্তের পথে বাধা সৃষ্টি না করতে। অন্যদিকে নিজের ভাবপ্রবণ 'থিয়োরী' প্রচার করতে লাগলেন অবাধে। 'থিয়োরী' আর 'প্র্যাক্‌-টিসে' লাগল দ্বন্দ্ব। বাস্তবধর্মী রাজেন্দ্রবাবু, বল্লভভাই আর বাজাজ-রা প্রমাদ গণলেন। দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনের আশ্বাসই না তাঁদের ভবিষ্যতের যাত্রাপথ ও পরিকল্পনা করে তুলবে নিরাপদ আর সার্থক।

(১) বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স—১৭৫ পৃঃ।

জহরলালের সাম্যবাদ বা সোস্যালিজম, ওঁর অর্থনীতির মার্কসীয় ব্যাখ্যা সত্যিই যদি দেশবাসীর মনে ক্ষণিকের তরেও ভ্রান্ত আশা জাগিয়ে তোলে, তখন তারা কি এই নতুন শাসন-সংস্কারকে প্রীতির চক্ষে দেখবে, না, তার সমর্থনেই দাঁড়াবে? লোক-মত পেছনে না থাকলে মন্ত্রিত্বই-বা চলবে কেমন করে?

সহসা বাজ ভেঙ্গে পড়ল জহরলালের মাথায়। ২৯শে জুন, ১৯৩৬। স্থান ওয়ার্ধা। মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম-গ্রাম ওয়ার্ধা। চরম পত্র পৌঁছল জহরলালের হাতে।(১)

"প্রিয় জহরলালজি,

লক্ষৌ কংগ্রেসের পর আমাদের সুস্পষ্ট মতানৈক্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সত্ত্বেও যখন আপনি আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য মনোনীত করলেন, আমরা এই কথাই মনে করেছিলাম যে, বিভেদের ব্যাপারগুলি পরিহার করে আমরা উভয় পক্ষের মতগ্রাহ্য বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে চলব। আর তার ভেতর দিয়েই হয়ত সহযাত্রার সহজ পথ দেখা দেবে। আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন কোনও মীমাংসায় আসা সম্ভবপর হল না যাতে করে দুটি পরস্পরবিরোধী সত্তার পক্ষে একযোগে কাজ করা বা একইভাবে কথা বলা সম্ভবপর হতে পারে। কংগ্রেস আজও সোস্যালিজম্‌এর নীতি গ্রহণ করেনি। এই অবস্থায় কংগ্রেসের প্রেসি-ডেন্ট এবং ওয়ার্কিং কমিটি, আর আর সমাজতন্ত্রী সদস্যরা যদি সোস্যা-লিজম্‌এর নীতি ব্যাখ্যায় ও প্রচারে মুখর হয়ে ওঠেন, আমরা মনে করি, এর ফলে দেশের অমঙ্গল ঘটবে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে এ-কাজ অনর্থ সৃষ্টি করবে। দেশের সম্মুখে মুক্তি-সংগ্রামের চেয়ে আর কোন বৃহত্তর আদর্শ নেই। সম্ভবত আপনি মনে করেন,—অনেকক্ষেত্রে আপনার মনের ভাব প্রকাশও করে

(১) বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স—১৮২ পৃঃ।

বলেছেন যে, বর্তমান বৎসরের ওয়ার্কিং কমিটি আপনার পছন্দ-মাফিক গঠিত হয়নি। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওটাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনার ওপরে। আর ওকে স্বীকার করে নিয়েছেন অগত্যা। আমাদের ধারণা কিন্তু ঠিক উল্টো। আপনার ওপর জবরদস্তি করা হয়েছে কোথায় এবং কোনক্রমে এ-কথা আমাদের জানা নেই। যেমন করেই হোক, নতুন কমিটি আপনার মনঃপূত হয়নি। যে কমিটিকে আপনি একটা নিরেট ভার মনে করেন, তাকে বয়ে বেড়াতে হবে আপনার অনিচ্ছায়, এটা আমাদের অভিপ্রেত নয়। অন্যদিকে আমরা মনে করি, ওই পরিস্থিতির সম্মুখে আসন্ন নির্বাচনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংগঠন ও সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ অপারগ।

একান্ত অনিচ্ছাক্রমে আমরা ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, অনেক চিন্তার পর যে কাজ আমরা করতে যাচ্ছি, তাতে আপনার ওপর, আমাদের নিজেদের ওপর এবং দেশের বৃহত্তম স্বার্থের ওপর সুবিচারই করা হয়েছে।

আপনার অকৃত্রিম—

স্বাঃ—রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সি, রাজাগোপালাচারী, জয়রামদাস
দৌলৎরাম, যমুনালাল বাজাজ, বল্লভভাই প্যাটেল,
জে, বি, কৃপালনী ও এস, বি, দেব।

বেদে চেনে সাপের হাঁচি। মহাত্মাজিও চিনতেন জহরলালকে। মহাত্মাজির জ্ঞাতসারে, হয়ত তাঁরই অনুমোদনে পদত্যাগপত্র পাঠান হয়েছিল। পাঠাবার প্রয়োজনীয়তাও ছিল। অত্যুৎসাহী জহরলালকে সহজে ধাতস্থ করা যাবে না, এ-কথা মহাত্মাজি জানতেন। আরও জানতেন যে, জহরলাল অভিমানী, জহরলাল অর্বাচীন, জহরলাল কল্পনাবিলাসী। সাপও মরে, অথচ লাঠিও না ভাঙ্গে; গান্ধীবাদের আর একটা রূপ।

পরদিনই সবাই এলেন ওয়ার্ধায়। মায় জহরলাল। এলেন গান্ধী-সকাশে। উনি সাপ হয়ে কেটেছিলেন। এবার ওঝা হয়ে

ঝাড়লেন। বিষ নেমে গেল। মিটে গেল ঝামেলা, ব্যথা হল দূর। পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহৃত হল।

প্রত্যাহৃত হল, কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতিকে তাঁদের মত থেকে একবিন্দুও নড়তে হল না। জহরলালও তাঁর বিলাস ছাড়লেন না। তবে দু'পক্ষই সংযত হলেন, আর হলেন সতর্ক। দু'পক্ষই পেলেন ভবিষ্যতের এক পরম ইঙ্গিত। গান্ধী-গোষ্ঠী ছাড়া যে ভবিষ্যতের কোন বাস্তব ভিত্তিই নেই, তার ইঙ্গিত পেলেন জহরলাল। গান্ধী-গোষ্ঠীকে মর্যাদা, সম্ভ্রম আর গুরুত্ব দিতে জহরলাল অপরিহার্য,—রাজেন্দ্রবাবুরাও বুঝে নিলেন এই পরম ও বিচক্ষণ ইঙ্গিত।

১৪ই জুলাই যে-চিঠি গান্ধীজি লেখেন জহরলালকে, বিবদমান উভয়পক্ষকে কি অপূর্ব কৌশলে গান্ধীজি শান্ত করেছিলেন, তার পূর্ণ ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। রাজেন্দ্রপ্রসাদের দ্বিতীয় পত্র মহাত্মাজিকে দেখান হয়েছিল, এ-কথা তিনি স্বীকার করেছেন ৮ই জুলাইএর পত্রে। "আমাকে দেখিয়েই চিঠিখানা তোমার কাছে পাঠান হয়েছিল।" (The sending of such letter in the place of resignation was my suggestion.) দ্বিতীয় পত্রে অনেক কথার মধ্যে মহাত্মাজি লিখেছেন,—"তোমার সহকর্মীদের তোমার মত না আছে সাহস, না আছে সরলতা।...আর সাহসের অভাব থাকায় যখনই ওরা তোমাকে কিছু বলতে গেছে, বলেছে ঘোলাটে করে। এতে করে তোমাকে আরও ক্রুদ্ধই করেছে।...তুমি জেনে রাখ, ওরা তোমাকে ভয় করে। ...তোমার প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য আর জনসাধারণ ও যুবকদের ওপর তোমার প্রভাব সম্পর্কে ওরা খুবই সচেতন। ওরা আরও জানে যে, তোমার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ-কথা জেনেই ওরা হার মেনেছে।..." জহরলালকে লিখে গেছেন গান্ধী একটানা এবং অনেক কথা। পত্রের উপসংহারে জহরলালকে সব ঝেড়ে ফেলে দু'হাত তুলে নাচতেও বলেছেন গান্ধীজি (to have a dance)।

অপর পক্ষকে কি বলে গান্ধীজি প্রবোধ দিয়েছিলেন ও প্রবুদ্ধ

খাপ খাইয়ে নবরূপে রাশিয়া ফুটে উঠেছে। এদেশেও তাই হবে। গান্ধীজির চারপাশের ওরা আঁতকে ওঠে। সংস্কৃতির প্রশ্ন নয়—প্রভুত্বের। বাজাজ আর বিড়লারা অস্থির হয়ে ওঠে। কেঁপে ওঠে জমিদার। কেঁপে ওঠে মালিক আর মুনাফাখোর। সন্ত্রাস-বাদীর হাত থেকে বাঁচবার চাহিদায় ইংরেজ চেয়ে থাকে গান্ধীজির দিকে। নবতম ভাববন্যার হাত থেকে বাঁচতে শোষকের গোষ্ঠী চেয়ে থাকে জহরলালের দিকে। জহরলাল সোস্যালিজ্‌ম্‌এর কথা বলেন, কিন্তু সোস্যালিজ্‌ম্‌ চান না। জহরলাল কম্যুনিষ্ট বলে নিজেকে পরিচয় দেন,—ভয় নেই, কোনদিনও উনি কম্যুনিষ্ট হবেন না।(১) নির্ভয়ে গান্ধী এগিয়ে চলেন। নির্বাচন শেষ হয়। চারদিক থেকে ওঠে কংগ্রেসের জয়-জয়কার। জহরলাল আবার সভাপতি মনোনীত হন। কানপুরের পর ফৈজপুর। মার্চের পর ডিসেম্বর। ১৯৩৬।

মহাত্মা গান্ধীর জীবন একটানা বৈচিত্র্যের জীবন। তাঁর পথ, তাঁর মত, তাঁর আচার-ব্যবহার, তাঁর চালচলন—এক কথায় তাঁর সবই বৈচিত্র্যে ভরা। আর সে বৈচিত্র্য সামান্য নয়, সাধারণ নয়, সচরাচর নয়। তা অসাধারণ, অসামান্য, অনন্য। কিন্তু সব বৈচিত্র্য তাঁর ম্লান হয়ে গেছে একটির কাছে। মানুষ মানুষকে অভিভূত করে, বৃহত্ত্বের উত্তাপে আর প্রভাবে বশ্যতা স্বীকার করায়, জয়ও করে; কিন্তু গান্ধী জহরলালকে এর কোনটাই করেননি। নিজের অলক্ষ্যে, নিজের অজানিত অনিচ্ছাকৃত ভাবাবেগে জহরলাল গান্ধীভক্ত, গান্ধীর অনুগত, গান্ধী প্রভাবে অভিভূত। জহরলাল মনে করেন—চিরদিন মনে করে এসেছেন যে, তাঁর একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, মত-

(১) কম্যুনিজ্‌ম্‌ ও ফ্যাসিজিম্‌এর মাঝখানে আর কোনও পথ নেই। দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতেই হবে। আমি কম্যুনিষ্ট আদর্শ বেছে নিয়েছি।

—১৯৩৩এর ৮ই ডিসেম্বর জহরলাল-প্রদত্ত বিবৃতি থেকে।

বাদে স্বকীয়তা আছে। কিন্তু নেই যে, এই কথাটাই তাঁর অজানা ছিল। জহরলাল শুধু গান্ধীর অনুগামী নন, অনুব্রতীও। হ্যারো ও কেম্ব্রিজের শিক্ষা-দীক্ষা য়গড়ে-ওঠা জহরলাল, সোস্যালিষ্ট অথবা কম্যুনিষ্ট জহরলাল, রামধুনের কীর্তনিয়া গান্ধী, ভগবদ্‌গীতা, বাইবেল ও কোরানের ভক্ত গান্ধী এবং রামরাজ্যের উপাসক গান্ধীকে গ্রহণ করতে বার বার দ্বিধা করেছেন, সংশয় জেগেছে মুহুর্মুহু,—গান্ধী হতাশ হননি। ১৯২১ থেকে ১৯৩৭, সুদীর্ঘ সতের বৎসর লেগেছে জহরলালের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে, নিজেকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে, তুলে ধরতে মহৎ আর বৃহৎ করে।

১৯৩৬এর সভাপতিত্ব করতে গিয়ে জহরলালের চিরন্তন হৃদয় আর মস্তিষ্কের দ্বন্দ্ব মাথা তুলে দাঁড়ায় বার বার। গান্ধীর আকর্ষণ সত্ত্বেও সেদিন গান্ধী-চক্রের আর সবাই জহরলালকে চক্রের ভেতরে আসন দিতে রাজী হয়নি। গান্ধীর অসাধারণ ধৈর্য আর লোক-চরিত্রের অভিজ্ঞতা অনেক পূর্বেই বুঝে নিয়েছিল জহরলালের বৈশিষ্ট্য, জহরলালের দুর্বলতা। দুর্জ্ঞেয় আত্মাভিমানী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী জহরলালের চাওয়া সেদিন গান্ধী ছাড়া আর কেউ বোঝেনি।(১) এই বোঝাবুঝি সাঙ্গ হল ১৯৩৭এ। অন্তরের সকল দ্বিধা, সংশয় ও দ্বন্দ্বের অবসান করে প্রসন্নচিত্তে এই সর্বপ্রথম জহরলাল স্বীকার করে নিলেন পরিপূর্ণ গান্ধী-নেতৃত্ব। বাধাহীন একনায়কত্বের প্রিয় ও প্রয়াসী গান্ধী অতি-দীর্ঘদিন পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।(২)

কিন্তু। নাল্পে সুখমস্তি। গান্ধী অল্পে তুষ্ট নন। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক

(১) আমার মনে হয়, আমার মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের একটু বাড়াবাড়ি রয়েছে······জহরলাল—জন্ গাম্বারের ইন্‌সাইড্ এসিয়া, ৪৬৩ পৃঃ।

(২) সভাপতি জহরলালও বহুলাংশে নিজেকে সংযত ও শান্ত করেছেন ·· ডাঃ পট্টভি—কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ।

সন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগল ভারতবর্ষের চারদিকে। দূরের—অনেক দূরের একটি উন্নত মাথা ছাড়া আর সব মাথা অবনত হয়ে গেছে; নুয়ে পড়েছে আভূমি, সমান হয়ে গেছে তৃণ আর ভূমির সাথে। গান্ধী অপলকে তাকিয়ে থাকলেন ঐ সমুন্নত মাথাটির দিকে। গৌরবে, গর্বে, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বে, ভীতিহীনতা আর নির্লোভের অপরূপ সমন্বয়ে যে-মাথা দীপ্তোন্নত, যে-মাথা সকলের কণ্ঠ ছাপিয়ে বলে ওঠে, চির উন্নত মম শির, শির নেহারি নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির। গান্ধী সাগ্রহে চেয়ে থাকেন। চেয়ে থাকেন নবযুগের প্রতাপ সিংহের মাথার দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতে গান্ধীর চোখে ভেসে ওঠে একটা গোটা অবয়ব—সুভাষ। গান্ধী পাঠান প্রিয়তমা শিষ্যা কুমারী শ্লেড্‌কে সুভাষের কাছে। সুভাষ তখন ডালহৌসীতে।

চৌদ্দ

১৯৩৭এর মার্চ। নতুন শাসনতন্ত্রের আমল শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচন-পর্ব শেষ—সব প্রদেশেই, বাংলাতেও। ১৯৩৪এ ইংরেজ-সরকার আমাকে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পাঠিয়ে দেয় বীরভূম জেলার এক দূর প্রান্তে সাঁওতাল পরগনার কাছাকাছি। সেখান থেকে ১৯৩৫এর শেষের দিকে বাড়ী। আটকে রাখে আমার নিজের গৃহে। ১৯৩৬এ পাই আংশিক মুক্তি; নির্বাচনের কাজ চালাবার মত মুক্তি। পাবনা ও বগুড়া দুটো জেলা নিয়ে ছিল আমার এলাকা। স্বাধীনতা ছিল যদৃচ্ছ ঘোরবার, কিন্তু থানায় এত্তেলা দিয়ে যেতে হত।

নির্বাচনের পুর্বে নেতা কার্শিয়াং থেকে চিঠি লিখলেন আমার এক আত্মীয়াকে :

কার্শিয়াং
C/o. সুপারিনৃটেন্‌ডেন্ট্‌ অব্‌ পুলিশ
দার্জিলিং, ২১শে অক্টোবর,
১৯৩৬

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

আপনার চিঠি পেলাম। নরেন নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন জেনে সত্যিই আনন্দ হয়েছে আমার। চারদিকে প্রতিক্রিয়াশীল লোকের মধ্যে ওঁরাই হবেন দেশের আশা ও ভরসা। ওঁর যোগ্যতা আমার চেয়ে দেশবাসীই বেশি জানে।······আমার প্রশংসাপত্র ছাড়াই উনি নিজের যোগ্যতায় নির্বাচিত হবেন, এটা আমার কামনা নয়—বিশ্বাস।

আমার দেহ ভাঙ্গতে শুরু করেছে। কবে আপনাদের কাছে যাব, যাব কি না, জানা নেই······

আমার প্রাণ-ভরা ভালবাসা রইল সকলের প্রতি। ইতি—

আপনাদের সুভাষ

এই একমাত্র চিঠি ছিল আমার নির্বাচনের সম্বল। হাজার হাজার কাগজ ছাপিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম জনতার ঘরে ঘরে। নির্বাচনে জয়ী হলাম। ফিরে এলাম কলকাতায়।

বাজেট সেশন শুরু হয়ে গেছে। এ্যাসেম্ব্লীর কাগজ পড়ছিলাম নিবিষ্ট হয়ে। অনেক রাত; দশটার কাছাকাছি। দরজায় ঘা পড়ল। ঘরে ঢুকল গণেশ। সুভাষচন্দ্রের বড়দা সতীশবাবুর বড় ছেলে।(১) চেঁচিয়ে উঠল গণেশ,—"রাংকুকে ছেড়ে দিয়েছে।" অর্থাৎ নেতার বন্ধন-দশা কাটল।

(১) অকালে গণেশ দেহত্যাগ করেছে

কার্শিয়াং থেকে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে নেতাকে আনা হয়েছিল কয়েকদিন আগে রোগ পরীক্ষার জন্যে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল তখুনি ছুটে যাই। কিন্তু গেলাম না। সংবাদটা শুনে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। নিঃসঙ্গ পরিচালকহীন জীবনের অসহায়তার বুকের ওপর ফুটে উঠল সহসা একটা প্রবল অনুভূতি, অনেকখানি আশ্বাস। গণেশকে বিদায় দিয়ে বসে থাকলাম। বসে থাকলাম একা নিঃশব্দে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭।(১) দীর্ঘ ব্যবধান। কালের ব্যবধানে অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। গেছে কি ?

পরদিন সকালবেলা। রাত কাটতে-না-কাটতে গেলাম এলগিন রোডের বাড়ীতে। হুজ্জোৎ মিটতে রাত হবেই, এটা জানা ছিল। আরও জানা ছিল নেতার ঘুম থেকে ওঠবার সময়। খুব সকালে কদাচিৎই উঠতেন। ইচ্ছে করেই পথে খানিকটা সময় কাটিয়ে বাড়ী ঢুকলাম। সোজা ওপরে চলে গেলাম। বারান্দার দিকে মুখটা বাড়িয়ে দেখতে গিয়েছিলাম ওঁর ঘরখানা। হয়ে গেল চোখোচোখী। স্মিত হাসি ভেঙ্গে পড়ল সারা মুখখানায়। ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

মা-জননী এগিয়ে এলেন। মা-জননী শুধু নেতারই জননী নন, সবাইএর মা-জননী—সম্পর্ক-নির্বিশেষে। চাকর-বাকর থেকে ছেলে-বুড়ো সবাইএর মা-জননী। এগিয়ে এলেন হাসিমুখে, বললেন—"এ্যাদ্দিন যে বড় আসোনি ?"

প্রণাম করে বললাম—"আসবার ডাক ছিল কোথায় ?"

"তা বটে।" বলেই পাশের ঘরে ঢুকলেন। পরক্ষণেই একখানা রেকাবি-ভরা সন্দেশ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কড়া-পাকের সন্দেশ। আমার সামনের ছোট টেব্‌ল্‌টার ওপর নামিয়ে দিয়ে আবার বললেন, —"আবার কবে সবাই ঢুকবে ?"

---

(১) ১৭ই মার্চ।

হাসতে হাসতে নেতা বললেন,—"আর ঢোকা নয়। এবার বেরোবার পালা।"

একটা সন্দেশ হাতে নিয়ে বললাম—"এ-সন্দেশ বুঝি সিমলের?"

"হবে না? বাপের দেশের জিনিস না হলে যে বাবাদের মন ওঠে না।" হাটখোলার দত্তবাড়ীর মেয়ে ছিলেন মা-জননী। উচ্ছল আনন্দের ঢেউ লাগল সকলের মনে, আর গায়েও।

চা-এর পর তু'জনে নীচে নেমে এলাম। সিঁড়ির পাশের ঘরখানায় বসবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সস্ত্রীক শৈলেন ঘোষ বসে ছিলেন ঘরে। দীর্ঘদিন আমেরিকায় কাটিয়েছিলেন শৈলেনবাবু। সুভাষের বাল্যবন্ধু। বিপ্লবী-সংস্পর্শের অভিযোগে শৈলেনবাবু অনেকদিন দেশে ফিরে আসতে ভরসা পাননি। কিন্তু বিদেশে থেকেও দেশকে ভোলেননি ভোলেননি মুক্তিব্রত। আমেরিকায় গড়ে তুলেছিলেন ভারতীয় কংগ্রেস। ভারতের পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন অনেকদিন। ওখানেই বিয়ে করেছিলেন এক ইয়াংকি-কন্যা। দেশে ফেরবার সময় তিনিও এসেছেন ভারতবর্ষে।

একটু বাদেই ঢুকলেন নেলী সেনগুপ্তা; লোকান্তরিত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্ত্রী। তাকিয়ে থাকলেন নেতা শ্রীমতী নেলীর মুখের দিকে। সহসা সারা মুখখানিতে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। ঝর্ ঝর্ করে গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর ধারা। শব্দহীন ঘর। সকলের চোখেই অশ্রু। মায় ইয়াংকি মেয়ের। দেশপ্রিয় নেই। সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন শুভ্র বস্ত্র-পরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনী নেলী। মানুষের বেশে মূর্তিমতী কান্না। শ্রীমতী নেলী নেতার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মুখে কথা নেই। শুধু নেতার একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

এর পরই দলের পর দল। অবকাশ নেই, শেষ নেই। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যায়, তবুও না। বলতে অবকাশ পেলাম না, যাই। বসেই থাকলাম। ভিড় মিটল শেষে। একটা বেজে গেছে। হাত-

ঘড়িটা দেখে নিয়ে নেতা বললেন—"আর অতদূর যেতে হবে না। কি বলো ?"

"অগত্যা"। হেসে বললাম।

সারা সহর মেতে উঠল অভ্যর্থনায় আর সমাদরে। সমারোহ সব-চেয়ে বেশি হল শ্রদ্ধানন্দ পার্কের অভ্যর্থনায়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হলেন সভাপতি। মানপত্র হাতে দিয়ে তিনি বললেন,—"কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল যে-মাথায় ইংরেজ, তাতে আমরা ফুলের মুকুট পরিয়ে দিলাম।"

মেজদাদা শরৎচন্দ্র বাংলা এ্যাসেম্ব্লীর নেতা নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেসী দলের। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি আগে থেকেই ছিলেন সুভাষচন্দ্র। বে-আইনী কংগ্রেস আইনসম্মত হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের আফিস বসেছে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড়ের মাথায়। সবই চলছে নিয়মিতরূপে। ওরই ভেতর কোথায় যেন বেসুরো বাজে সঙ্গীতের সুর। দলের শৃঙ্খলা শিথিল হতে শুরু করেছে। দোলা লেগেছে অনেকের মনে। দূর থেকে ভেসে আসে নবতর আর একটা ইঙ্গিত—অনাস্বাদিত, নতুন আশা, নতুন তার রূপ, নতুন সম্ভাবনা। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের কথা আর জল্পনা নয়; দিন দিন এগিয়ে আসছে বাস্তব রূপ নিয়ে। বাংলার কংগ্রেসীদের ভাগ্যে ও-শিকে ছিঁড়বে না। কিন্তু মন্ত্রিত্বের ভেতর দিয়ে,—কে জানে,—একদিন যদি ইংরেজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়েই যায়! গান্ধীর অসাধ্য কাজ নেই।

কিন্তু ওটা সমস্যা নয়। সমস্যা এইক্ষণের—এই মানুষটি; এক-রোখা আর বেহিসেবী। স্ত্রী-পুত্র-সংসারশূন্য ঐ-যে চরমপন্থী মানুষটি বেরিয়ে এল কারাগার থেকে, নির্বাসন থেকে সদ্য সদ্য, চিরকাল ও কি সংগ্রামই করে যাবে ? পরিশ্রান্ত হবে না কোনদিন কোন কারণে ? ওর না হয় কিছু নেই, কেউ নেই,—কিন্তু আর সকলের ? দোদুল্যমান হয়ে ওঠে অনেকের মন; আর হয়ে ওঠে লোভাতুর। চক্ষুলজ্জার

একটা বাধা ছিল। দীর্ঘ অদর্শন আর পরিস্থিতির পরিবর্তনে তারও ঘনত্ব কমে গেছে। অনেকদিনের সঙ্গীরাও দো-মনা হয়ে পড়েছে। নেতা লক্ষ্য করেন। লক্ষ্য করেন যে, গত-জীবনের স্থায় এ-জীবনের সঙ্গীরাও অনেকেই থাকে পেছনে পড়ে। থাকলও তাই। বাংলার সুভাষ-গোষ্ঠীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরল।

ধরুক। বাংলা বন্ধ্যা নয়। বাসি-পচারা ছিটকে পড়বেই। ওদের স্থানে দাঁড়াবে আনকোরা নতুন। কারাগার থেকে অনেকে বাইরে এসেছে। আরও অনেকে রয়েছে ভেতরে। তাদের, আর ঐ-যে আন্দামানের ওরা, ওদের বা'র করে আনতে হবে। ওরা হয়তো এসে দাঁড়াবে ওঁর পাশে। হয়তো দাঁড়াবে না—চলতে হবে একা নিঃসঙ্গ। কিন্তু চলতে তো হবেই।

সোস্যালিষ্ট পার্টির কণ্ঠ বুজে গেছে। সবটা নয়,—তবে বাকীও নেই। কাউন্সিলের কথা ওরা শুনতে চায়নি প্রথমটায়। না-চাওয়া আর নেই। ওরাও ঢুকেছে। কিন্তু তখনও মন্ত্রিত্বের বিরোধী ওরা। এ-বিরোধও থাকবে না।

এই দলটির অধিকাংশ ছিল পুরোপুরি গান্ধীর ভক্ত। অনেকে আবার আশ্রম ফেরতা। গান্ধী-বাদের নতুন ব্যাখ্যায় ওরা মেতে উঠেছে, কার্ল মার্কস্ আর গান্ধী-দর্শন মিশিয়ে গড়ে তুলেছে এক অভিনব বিচিত্র সোস্যালিজম্। সে-সোস্যালিজ্‌ম্‌এর সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক নেই। সে-সোস্যালিজম্ অহিংসার পুটপাকে তৈরী।

ওদেরই পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে নতুন আর এক দল। সংখ্যায় ওরা অল্প হলেও দমে ভারী। কম্যুনিষ্ট ওরা। ১৯৩০এর আগে নেহাতই ছিল নগন্য। গান্ধীবাদের শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে ওদের দল পুষ্ট করেছে সংগ্রামমুখী ছেলের দল। বাংলার বিপ্লবীদলভুক্ত বহু যুবক ক্ষুব্ধ হয়ে, অন্য পথ না দেখে, আর উপযুক্ত নায়কের নির্দেশ না পেয়ে ঝুঁকে পড়েছে ওদের দলে। অহিংসার বাড়াবাড়ি বাঙালী সহ্য করতে পারেনি। বাঙালীর মুক্তি-চেতনার মূলে ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ। পথ

নয়, মতও নয়—লক্ষ্য। বাঙালীর রক্তে রয়েছে এই ইসারা। বাঙালী তন্ত্র আর বেদের সমন্বয়ে ধর্ম গড়েছে। প্রতিমা-পূজক বাঙালী প্রতিমা শুধু পুজোই করে না, পুজো শেষে গঙ্গায় বিসর্জনও দেয়। বিসর্জনের ভেতর এমন করে উল্লাস আর কেউ সম্ভোগ করতে পারে না। বাঙালীর ধর্মাচার্য এই সেদিনও বলে গেছেন—যত মত, তত পথ। পথের আর মতের অত চুল-চেরা বিচার বাঙালী তাই করতে চায় না। পরবশতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াতে হবে সর্বস্ব পণ রেখে। শূন্যতার বুকে ফুটে উঠবে পূর্ণতার ইঙ্গিত।

ইংরেজ গোড়া থেকেই কম্যুনিষ্টদের প্রতি বাম হয়েছিল। ওদের ধরে পুরে দিয়েছিল জেলে। দলকে করে দিয়েছিল বেআইনী। বাংলার সন্ত্রাসবাদের ভয়ে সেই ইংরেজ ওদের প্রতি খানিকটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। ওরা শুধু ইংরেজ তাড়াতেই চায় না ; সেইসঙ্গে তাড়াতে চায় ধনী, মহাজন, মুনাফাখোর আর জমিদারদের। কথায় কথায় কলে আর কারখানায় শুরু করে দেয় ওরা ধর্মঘট, মজুর আর মালিকের মধ্যে বাধিয়ে দেয় বিরোধ। ওদের মারফত বিরোধী পক্ষের ভেতর যদি বেধে ওঠে সংঘর্ষ, ইংরেজ খানিকটা খুশি হবে বৈকি। পরিণাম? বর্তমানের সমস্যা যে প্রবলতায় আর পরিমাণে আতঙ্ক ধরাতে চায়। এ বিপদ কাটুক। তারপর সত্যিই যদি কম্যুনিজম্ বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয়ই, ততক্ষণে ধাক্কা সে সামলে নেবে।

মন্ত্রিত্বের মোহ এর মধ্যেই মাথা-চাড়া দিয়ে দেখা দিয়েছে। বৈরাগীর জেগেছে ঘর বাঁধবার মোহ। হোক না বোষ্টমী, তবু তো নারী। ঘর হয়তো স্থায়ী হবে না। স্থায়ী হবে না বসবাসও। তবু তো ঘর। চির অস্থায়ী জীবন না? আর এরই বুকে মানুষ চিরদিন আকাঙ্ক্ষা করে স্থায়ী হয়ে বাঁচবার।

নেতা চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। কাউন্সিলের দিকে তাকান। কোন আশার আলো নেই ওখানে। ওখানকার অধিকাংশই ছিটকে পড়বে।

পড়বে হয় এদিকে, না-হয় ওদিকে। শেষ-সংগ্রামের দিনে ওদের কজন দাঁড়াবে ঘুরে? কেউ কি দাঁড়াবে?

বাংলায় মন্ত্রিত্ব সম্ভবপর নয়। কিন্তু বিপ্লবই কি সম্ভবপর? দেশের বুকে যদি বিপ্লবের দোলা না লাগে, কি হবে এই মিথ্যে অভিনয়ের কলাকৌশল আর চাকচিক্য দেখে? সঙ্কল্প জেগে ওঠে মনের কন্দরে। পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বাধা দেয় রুগ্ন দেহ, অপটু দেহ। চিকিৎসকের আদেশ শিরোধার্য করতে বাধ্য হন নেতা। দুমাস কলকাতায় কাটিয়ে নেতা চলে যান ডালহৌসী।

ডাঃ ধরমবীর-পরিবারের আনন্দের আর সীমা নেই। অনেকদিন বাদে সুভাষকে ওঁরা পেয়েছেন নিজেদের মধ্যে, ঘরের আত্মীয়ের মত। চেনা ছিল, ছিল জানাও। কিন্তু এই অসামান্য মানুষটির নিকট-সান্নিধ্য এমন করে তাঁদের ভাগ্যে সম্ভবপর হয়ে উঠবে, এ-কথা তাঁদের জানা ছিল না। ইওরোপের স্বল্পপরিসর পরিচয় হয়ে উঠল নিবিড় আর অতি নিকট। বয়োজ্যেষ্ঠ ডাক্তার সুভাষকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। ওঁর ভেতরকার সেই অনির্বাণ বহ্নির ছোঁয়াচ লাগে নিজেদের প্রাণেও। ওঁর পরিচর্যায় সারা পরিবার তাই হয়ে ওঠে উদ্‌গ্রীব। সুভাষ ওঁর কাছে বিশেষ একটি ব্যক্তি শুধু নন। সমগ্র দেশের নতুন সম্ভাবনার কল্পরূপ সুভাষ। আগামী কাল—অনাগত ভবিষ্যতের নাম-না-জানা ভবিতব্য ধরমবীর-পরিবার লালন করতে থাকেন, করে তোলেন রোগমুক্ত।

মিস্‌ শ্লেড্‌কে দেখেই নেতা আঁচ করে নিয়েছিলেন তাঁর আগমন-রহস্য। নিছক কুশল-প্রশ্নের ব্যাপার নয় মোটেই। কুশল-প্রশ্নের পেছন থেকে উঁকি দেয় রাজনীতি। কূট, কৌশলী, আসন্ন রাজনীতি। ১৯৩৮ এগিয়ে আসছে। নতুন সভাপতি করতে হবে। গান্ধী-গোষ্ঠীর ওপর তলার প্রায় সবাই একে একে ও-পদ অলঙ্কৃত করেছেন—ভারত-

বর্ষের চোখ-ঝলসানো অগাধ আকাঙ্ক্ষার পদ—যে-পদের মহিমা পৌঁছে গেছে সাগরপারে, বিশ্বের দিকে দিকে—বেসরকারী ভারত-বর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের পদ।

সোজাসুজি মিস্ শ্লেড জিজ্ঞেস করে বসলেন নেতাকে যে, তিনি অহিংসার পথে কতটা এগিয়েছেন। বিপ্লবীদের সংস্রব ত্যাগ করতে পারবেন কিনা। সোস্যালিজম বা কম্যুনিজম্ নিয়ে বেশি মাতামাতি না করে দেশের যে-সব সমস্যা কংগ্রেসের কাছে বড় হয়ে উঠেছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন কিনা। এমনি আরও কত কথা।

এই সেবাপরায়ণা ইংরেজ মহিলার সহজ আত্ম-অবলুপ্তি নেতাকে আগে থেকেই পীড়িত করত। ওঁর ব্যক্তিত্বের আর কিছু যেন অবশিষ্ট নেই,—নিঃশেষে উদরস্থ হয়ে গেছে। আরশোলা হয়ে উঠেছে কাঁচ-পোকা সম্মোহন কি একেই বলে ?

মিস্ শ্লেডকে দেখে নেতার মনে পড়ে আর একজনকে—এমনি অনাড়ম্বর, এমনি ভারত-প্রেমে সর্বস্বান্ত। কিন্তু অবলুপ্ত নয়। ভগিনী নিবেদিতার কথা। ভারতবর্ষের ধূলিকণাও তাঁর কাছে ছিল প্রিয়, পবিত্র। ভারতবর্ষেরই-বা কজন অমন করে ভারতবর্ষকে ভাল-বাসতে পেরেছিল ? তাঁর প্রেমে ভীরুতা ছিল না, ছিল না নেতি। একটা সবল ও বলিষ্ঠ প্রেমের প্রদীপ্ত শিখা শুধু নিজের বুকে বহন করে তিনি তৃপ্তি পেতেন না, সন্তুষ্টও হননি। তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন চারদিকে। যে-কেউ আসত তাঁর সংস্পর্শে—তার বুকে। আসত সান্নিধ্যে—তার মনে।

বিদায়ের কালে নেতা মিস্ শ্লেডকে বলেছিলেন যে, সামনে আসছে এ, আই, সি, সি-র অধিবেশন কলকাতায়। মহাত্মাজির সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে। তাঁকেই সব খুলে বলবেন।

৭ই অক্টোবর নেতা নেমে এলেন ডালহৌসী থেকে। ডাঃ ধরম-বীর ওঁকে ছাড়তে চাননি। আসবার সময় বার বার বলে দিলেন আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিতে। দুদিন কলকাতায় থেকে নেতা চলে

গেলেন কার্শিয়াং। দিন-পনের কাটল সেখানে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পূর্বাহ্ণে ফিরে এলেন কলকাতায়।

দুরন্ত টাইফয়েডে তখন আমি শয্যাগত আমার সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে। সভার আগের দিন বিকেলবেলা অকস্মাৎ নেতা এসে দাঁড়ালেন আমার শয্যাপার্শ্বে। আমার দ্বিতীয় কন্যা খুকু তখন বছর-তিনেকের; ওকে তুলে নিয়েছেন বুকের ওপর।

কয়েকদিন পূর্বে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেহের না ছিল সাড়, না ছিল সম্বিৎ। চব্বিশ ঘন্টা একটা মোহের ভেতর দিয়ে কাটছিল। মেলিন্‌স্ ফুড্ কথাটা খট করে কানে ঢুকল। ঐ শব্দটা পর্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল সেদিন। মুখের কাছে যে ফিডিং কাপ ধরত, তাকেও সইতে পারতাম না। ক্রমাগত খেয়ে খেয়ে মেলিন্‌স্ ফুড আমার দুচক্ষের বিষ হয়ে উঠেছিল। সেই মেলিন্‌স্ ফুড। ভাবলাম আবার বুঝি কেউ গেলাতে আসছে। ফিরে তাকালাম। দেখি এক পরম বিস্ময় আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন আর খুকুটার গাল টিপে বলে চলেছেন—মেলিন্‌স্ ফুড বেবী…মেলিন্‌স্ ফুড…

১৮ই নভেম্বর নেতা চলে গেলেন ইওরোপে। যাবার আগের দিন রাত্রে আবার এসেছিলেন। তখন আমি অনেকটা ভালো। সেইদিনই নেতার মুখে শুনলাম গান্ধীজির সঙ্গে ওঁর আলোচনার কথা।

গান্ধীজি সেবার এসে ছিলেন শরৎবাবুর গৃহে উড্‌বার্ন পার্কের বাড়ীতে। গান্ধীজি নেতাকে স্পষ্ট করে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। নেতাও উত্তরে জানিয়েছিলেন ওঁর মনের কথা স্পষ্ট করেই। গান্ধীজি খুশি হয়েছিলেন।

গান্ধীজি প্রথমে বলেন—"বিপ্লবীদের সংস্রব তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।"

প্রত্যুত্তরে নেতা বলেছিলেন—"না।"

গান্ধী এটা আশা করেননি। বিস্ময় জেগেছিল ওঁর কণ্ঠে, আর চোখেও। জিজ্ঞেস করেছিলেন—"কেন?"

"তা হলে সকলের আগে আপনার সংশ্রব আমায় ছাড়তে হবে বলে।"

উচ্চ-হাসিতে ঘর ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। হাসি স্তিমিত করে বলেছিলেন গান্ধী—"আমি কি বিপ্লবী?"

"সবচেয়ে বড় আর বিপজ্জনক।"

আবার হাসি। খুশি উপচে পড়ছিল গান্ধীজির মুখ-চোখ থেকে। আর কেউ এ-কথা বলেনি। বলেছে সুভাষ—বিপ্লবীর রাজা সুভাষ। মন খুশিতে ভরে উঠবে না?

"কিন্তু আমি তো হিংসায় বিশ্বাস করিনে।"

"কেউই আজ আর করে না।" নেতা বলে চলেন বিপ্লব ও বিপ্লবীদের কথা।

বিপ্লবীরা শ্রান্ত, ক্লান্তও, এবং অনেকে আজ বৃদ্ধ। দল বলতে ওদের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আছে জনকতক মানুষ, তাও বিচ্ছিন্ন। সবাই প্রধান—স্ব স্ব প্রধান। দলের নবীন যারা, বেশির ভাগই দল ছেড়ে চলে গেছে, চলে যাচ্ছে। দলপতিরা বিপ্লবের ইতিহাস লিখতে শুরু করেছে, শুরু করেছে আত্মজীবনী লিখতে। এদের অধ্যায় সমাপ্ত। কিন্তু বিপ্লব? কোনদিন বিপ্লব ব্যক্তি-বিশেষের অপেক্ষা রাখে না—কোনও বিশেষ দলেরও না। বিপ্লব আসে নিজের প্রয়োজনে। বিপ্লব স্বয়ংসিদ্ধ। সমাজ-জীবনের কতকগুলি সমস্যা আর অবস্থার অপেক্ষা মাত্র। ওগুলো দেখা দিলে বিপ্লবও দেখা দেয়। কেউ চাক আর না চাক, কেউ খুশি হোক আর না হোক। ও আসবে।

তাই ওর আদর্শ কোনদিন মরে না; নিঃশেষও হয় না। বিপ্লব চিরজীবী, আর চির-যুবাও—মরে না কোনদিনও। ওর জরা নেই, নেই ওর বার্ধক্য। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। স্থান কাল আর রূপের পরিবর্তন হয় মাত্র। এ-দেশেও তাই হবে। অনাগত বিপ্লব শক্তি সংগ্রহ করে চলেছে। চলেছে

তার প্রস্তুতি। ব্যক্তি-বিশেষ চাক, আর না চাক, সে দেখা দেবেই। দেখা দেবে তার স্বরূপে তার ধ্বংস আর নবসৃষ্টির অপরূপ মূর্তি নিয়ে।

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজি। অনেকক্ষণ কথা বলেননি। স্থির দুটি চোখের মণি থেকে ঝরে পড়ছিল স্নেহ, মমতা আর তৃপ্তি।

এরপর মন্ত্রিত্বের প্রশ্ন। এ-সম্বন্ধেও নেতার উত্তরে গান্ধী খুশি হয়েছিলেন। শুধু যুক্তিযুক্তই ছিল না নেতার বিশ্লেষণ, ছিল দূরপ্রসারী। মন্ত্রিত্ব যখন স্বীকার করা হয়েছেই, চেষ্টা করতে হবে যাতে বাকি প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় হয়তো হবে না। কিন্তু আসামে? ওখানে তো কঠিন নয়। আর তা যদি না করা হয়, নেতা বলেছিলেন বেশ জোর দিয়ে, পাশাপাশি বাংলা ও আসামের প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিত্ব এই দুই প্রদেশে জাতীয়তার মূলে কুঠার হানবে।

এই দুই শক্তিধর পুরুষের সেদিনকার আলোচনার ভেতর ছিল উভয়ের শক্তি-পরীক্ষা আর মত-সাফল্যের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। জহর-লালের পর সুভাষ: বিনা দ্বিধায় সুভাষ যদি নিঃসংশয়ে অঙ্গীকার করে নেয় গান্ধী-নেতৃত্ব,—মহাত্মাজির মনে জেগেছিল গান্ধী-বাদের বিশ্বজয়ী অলৌকিক অবিস্মরণীয় ইতিহাস-ইঙ্গিত। বর্তমান তাঁকে ধিক্কার দিক, ব্যর্থতার যত বড় চিত্র ফুটে ওঠে উঠুক, কিন্তু আগামীকাল বিনা প্রতিবাদে আর কিছু না হোক, এই কথাই ঘোষণা করবে যে, ভারত-বর্ষের একটা টানা যুগ পরিচালিত হয়েছিল একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির প্রভাবে, আর সে ব্যক্তি ছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

আর সুভাষ? তিনি জানতেন এই মানুষটিকে। অনেকের চেয়ে ভালো করে জানতেন। যত জোরে আর কঠোর হয়ে এই মানুষটিকে অস্বীকার করা যাক, সমালোচনার নেশায় অন্ধ হয়ে এঁর অসংখ্য ত্রুটি আর অসঙ্গতি হয়তো বলা কঠিন নাও হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা? সত্য? আর তার নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত? সেও কি চুপ করে থাকবে? গান্ধীর জীবন্ত দেশপ্রেম আর জ্বলন্ত আত্মত্যাগ ম্লান

করে দেবে কিসে, কি দিয়ে? তা যে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত। অস্বীকার করলেই কি তা মিথ্যে হয়ে যাবে? গান্ধীকে তাই সুভাষ ছোট করে দেখতে পারেন না। ওঁকে হতমান করে যদি কেউ আত্মপ্রসাদ পেতে চায়, পাক। ও-পথ তাঁর নয়।

গান্ধী-বিরোধিতা তাঁর জীবনে নতুন নয়। প্রয়োজন হলে বার বার তা করতে তিনি দ্বিধা করবেন না। তাই বলে নীচতা ও ক্ষুদ্রতার পঙ্ক মেখে তিনি তা কোনদিনই করতে যাবেন না। কোনদিন অস্বীকারও করবেন না গান্ধীজির বিরাট অবদান।

কিন্তু এইক্ষণের সমস্যাকেও নেতা ছোট করে দেখতে চান না। বুদ্ধি আর কৌশলের যথাযত প্রয়োগ তাঁর আশা আর কল্পনাকে করবে সফল, সুভাষ এ-সুযোগ ত্যাগ করতে রাজী নন। দেশের সম্মুখে দ্রুত এগিয়ে আসছে এক বাস্তব পরিস্থিতি। গান্ধীও এ-পরিস্থিতি উপেক্ষা করতে পারবেন না। সেদিনের জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন। অপেক্ষা করবেন শক্তি সংগ্রহ করতে হবে বলে। সমগ্র দেশের বাম-পন্থী সংহতি যদি একবার সত্যিকার হয়ে ওঠে, ওদের কণ্ঠেই যদি ধ্বনিত হয়ে ওঠে কংগ্রেসের আদর্শ আর সুর, সব ক্ষয় আর ক্ষতি সেদিন সাফল্যের স্পর্শে হয়ে উঠবে উজ্জ্বল ও সার্থক। এই কাজই তিনি চেয়েছিলেন জহরলালের কাছ থেকে। জহরলাল হেরে গেছেন।

এই আলোচনার মাধ্যমে নেতা সেইদিনই বুঝে নিয়েছিলেন যে, সভাপতির পদ আর তাঁর পক্ষে দুর্লভ নয়। পরদিন নেতা চড়ে বসলেন ইওরোপগামী বিমানে। তারও পরদিন নেতার ছোট মামা এসে দাঁড়ালেন মস্ত একটা ঝুড়ি নিয়ে। ঝুড়ি বোঝাই ফল, নানা রকমের—রোগীর পথ্য। দিনটা ছিল বিজয়া-দশমী।

১৯৩৮-এর ১৮ই জানুয়ারী কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী ঘোষণা করলেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি হয়েছেন। নেতা

তখন লণ্ডনে। বাদ্‌গাস্তিনে ছিলেন প্রায় ছ সপ্তাহ। তাঁর প্রিয় বাদ্‌গাস্তিন। দেখা হল এমেলীর সঙ্গে। দেহ অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লাবণ্য ফিরে আসছে। ফিরে আসছে মনের অফুরন্ত কর্মসন্ধানী পরিকল্পনা।

১৯৩৩এ ইংরেজ সুভাষচন্দ্রকে বিলেত যাবার অনুমতি দেয়নি। বাধা এবার ছিল না। নেতা ওখানকার বন্ধুদের সাগ্রহ আমন্ত্রণে লণ্ডনে পৌঁছোলেন জানুয়ারী মাসে। বিপুল অভ্যর্থনা হল বিলেতে। জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করা হল ডরচেষ্টারের এক বিরাট সভায়।

বিলেতের বুদ্ধিজীবী আর রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে নেতার নাম অজ্ঞাত ছিল না। গান্ধীকে ওরা দেখেছে। কথাও তার শুনেছে। জহরলালকে ওরা জানে। কিন্তু এই রহস্যময় লোকটির নামের পেছনে শুধু রাজদ্রোহীর পরিচয়-পত্রই ওরা দেখেনি, দেখেছিল আরও অনেক কিছু। স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইংরেজদের অজানা নয়। নিজের দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আর যাদের পদানত করে রেখেছে, তাদের ইতিহাস ইংরেজ জানে। জানে কেমন করে স্বাধীনতা অর্জনের আর রক্ষার জন্যে সর্বস্ব পণ করতে হয়। জানে বলেই এই মুক্তিব্রতীর কাজ ও চরিত্র নিজ-স্বার্থে বাইরে কঠোর সমালোচনা করলেও ইংরেজ ভেতরে ভেতরে করে তাঁকে শ্রদ্ধা। ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান ১১ জানুয়ারীর সংখ্যায় লিখল,—"ইংরেজ এই প্রথম মিঃ বোসকে দেখল। ওঁর মধুর ও সংযত আচরণ এবং ভারতীয় সমস্যা আলোচনার নিঃসংশয় ও নিশ্চিন্ত ধরনে সবাই মুগ্ধ হয়েছে।"

দেখা হল অনেকের সঙ্গে। শ্রমিকদলের অনেকেই ছিলেন নেতার গুণমুগ্ধ ও অনুরাগী। এ্যাট্‌লী, গ্রীনউড, বেভিন, ক্রীপ্‌স্ ও হ্যারল্ড্ লাস্‌কির সঙ্গে হল দীর্ঘ আলোচনা। লর্ড এ্যালেন, হ্যালিফ্যাক্স, আর জেটল্যাণ্ডও বাদ গেলেন না। এই জেটল্যাণ্ড ছিলেন তখনকার ভারতীয় দপ্তরের সেক্রেটারী অর্থাৎ মন্ত্রী। 'টাইম্‌সে' ইনিই ১৯৩৬এর

২রা ডিসেম্বর লিখেছিলেন,—"মিঃ বোসের সত্যিই অসাধারণ যোগ্যতা আর কর্মক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ক্ষমতা সর্বদাই তিনি ধ্বংসাত্মক কাজেই নিয়োজিত করেছেন।"

ইংরেজ সবে নতুন শাসনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায় চালু করেছে ভারতবর্ষে। ওটার নাম দিয়েছে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। নির্বাচনে কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশে জয়ী হয়েছে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছে ৭টা প্রদেশে। কেন্দ্রে এই নববিধান চালু হয়নি। ওটার নাম দিয়েছে ইংরেজ ফেডারেশন, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র। এর ভেতরেই ছিল ইংরেজের চরম ধাপ্পা আর ভারতের ওপর পরিপূর্ণ অবিচারের পরিকল্পনা। দেশীয় রাজন্য, ইংরেজ, মুসলমান আর অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের জন্যে পৃথক পৃথক সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সাধারণ অর্থাৎ হিন্দু সদস্য সংখ্যার চাইতে বেশি। সাধারণের দলেই জাতিয়তাবাদীরা। সাধারণ আসনগুলির সব-কটা দখল করতে পারলেও কোনদিনই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় শাসন-ক্ষমতা দখল করতে পারবে না। এমনিই ছিল এর গঠন-চাতুর্য।

কংগ্রেস প্রথম অংশ মেনে নিয়েছে। নেবে না বাকীটা? ইংরেজ জাল ফেলে চলেছে ক্রমাগত। ধোকার জাল, ধাপ্পার জাল, সদাশয়তার জাল। আর কেউ এ-জালের খবর না রাখলেও নব-নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্রের এটা অজানা ছিল না। তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ওর নিজের ঘরে বসে বার বার বললেন যে, ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ ইংরেজের এ-জালে জড়িয়ে পড়তে চায় পড়ুক, কিন্তু ভারতবর্ষ ও-জাল ছিঁড়ে ফেলতে যে জানে, এ-কথাটা ভুলে গেলে ইংরেজ খুব বেশি লাভবান হবে না। জোর করে আর ফন্দি খাটিয়েই হোক, ইংরেজ যদি ওটা চালু করতে চেষ্টা করে, যুক্তরাষ্ট্র তাতে সচল হবে না, হবে নতুন করে সংগ্রাম। আরও বলেছেন যে, সঙ্গী যদি নাই থাকে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন একা।

স্বদেশের পথে পা বাড়ান নেতা। প্রথম দেশের মাটির স্পর্শ পান

করাচীর বিমান-ক্ষেত্রে। ওখানে অভ্যর্থনা হল রাজোচিত। ফুলের মালায় সুভাষ ডুবে গেলেন। পাগলের মত সেদিন জনতা ছুটেছিল তাদের প্রিয় নেতাকে দেখতে, স্বাগত জানাতে। তাদের বীর নেতা। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র।

পনেরো

এই সর্বপ্রথম জহরলালের মনের পর্দায় লাগল একটু ক্ষীণ চিড়ের চিহ্ন। ফাটল নয়, ছিদ্রও নয়, সামান্য একটুখানি দাগ। কিন্তু এই সামান্য দাগ অসামান্য হতে সময়ও লাগল না।

জহরলাল জন্মেছিলেন রূপোর চামচ মুখে নিয়ে। যৌবনের প্রথমার্ধ তাঁর কেটেছে প্রভূত ঐশ্বর্য আর বিলাসের আওতায়। ইংরেজের প্রখর আর প্রচণ্ড সৌভাগ্যের দিনে ইংরেজ-ঘেঁষা মতিলাল একমাত্র পুত্রকে মনের সাধে সাহেব সাজাতে যা-কিছু প্রয়োজন সবই যুগিয়েছিলেন অকৃপণ হয়ে। শিক্ষায় দীক্ষায় আদব-কায়দায়, সবদিক দিয়ে পুত্র জহরলাল যেদিন তাঁর মনের গোপনতম কামনা পূর্ণ করে সম্মুখে ফুটে উঠল অপরিমেয় সম্ভাবনা নিয়ে, মতিলাল খুশি হয়েছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেদিন মতিলালের এই কথাটিই জানতে বাকি ছিল যে, তাঁর ঐশ্চর্যের অপচয় না ঘটিয়েও পুত্র জহরলাল মনের সবখানি দিয়ে এই ঐশ্বর্য গ্রহণও করতে পারেননি। সকল বিলাসিতার পেছন থেকে সেই সময়েই জহরলালের মনের এক অজ্ঞাত কোণে মাঝে মাঝে দেখা দিত একটা অজানা বিষাদ, নিঃশব্দ নির্জনতার প্রলোভন, আর বোধ হয়, না-বুঝতে-পারা খেয়ালী বৈরাগ্য। তাঁর এই দুর্বোধ্য মানসভঙ্গী জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে পরিচালিত করেছে সাধারণ চাওয়া ও পাওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে। দলীয় রাজনীতির পঙ্ক-পাকে তিনি যদি জড়িয়ে না পড়তেন, মানুষ জহরলাল হয়ত ভারতবর্ষে রাজর্ষি জনকের

মতই নিস্পৃহ, অনাসক্ত আর কর্মযোগযুক্ত হয়ে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে পারতেন। কিন্তু তা হল না।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ এর পূর্ব পর্যন্ত গান্ধীবাদ ও গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুধু মুখর নয়, পরন্তু সুচিন্তিত ও অকুণ্ঠ। ভিয়েনা থেকে প্রচারিত বোস প্যাটেল বিবৃতি ভুলে-যাওয়া বা ভিন্ন অর্থ আরোপ করে তার গুরুত্ব লঘু করে দেখবার পেছনে আর যে কোনও মনোভাবই থাক,—বালসুলভ চপলতা ভেবে ওটা উড়িয়ে দেওয়া গান্ধীর পক্ষে সম্ভবপর হত না যদি-না আরও গভীর ও ব্যাপক অভিপ্রায় গান্ধীর মনোমুকুরে ভেসে উঠত। তা উঠেছিল, এবং উঠেছিল বৃহৎ আকার নিয়েই। বার বার কংগ্রেসের সভাপতিত্বের ফাঁদ পেতে গান্ধী জহরলালকে অনুগামী করে তুলেছিলেন। আর করেছিলেন আপন গোষ্ঠীভুক্ত। ১৯৩৮এও কংগ্রেসের এই অসামান্যের গৌরব ও গর্বের প্রলোভনে গান্ধী সুভাষকে জয় করতেই চেয়েছিলেন। নইলে বোস-প্যাটেল বিবৃতি গান্ধী ভুললেন কেমন করে? আর কেনই-বা?

হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করে আর আর সভাপতির মত সুভাষচন্দ্র যদি বৎসরান্তে বিদায় নিতেন চোখের জল ফেলে ও বিয়োগবিধুর জনতার চোখে জল এনে, সকল সমস্যার ওখানেই পড়ত যবনিকা; কিন্তু সুভাষ সভাপতি হয়ে এ-সবের ধারে-কাছেও গেলেন না। অতর্কিতে গান্ধীবাদের এমন মর্মস্থলে আঘাত হেনে বসলেন যে, সেই আঘাতের প্রচণ্ডতায় অনেকের চোখের নিদ্রা গেল টুটে। আঠারোটা বৎসর গান্ধীজি যে দৃষ্টিভঙ্গী, মতবাদ ও বিশেষ এক দর্শনের পত্তন ও প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, সুভাষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তে তা শুধু খণ্ডনই করেননি, পরন্তু সেদিন হয়ত তিনিও জানতেন না যে, গান্ধী-উত্তর ভারতীয় কংগ্রেস এবং বিশেষ করে গান্ধী-অনুবর্তী জহরলালের গোটা জীবন কাটবে তারই অনুধ্যানে, সুভাষ-সিদ্ধান্তের সাফল্যের সাধনায়।

আমেরিকার থোরো, ইংলণ্ডের রাস্‌কিন, রাশিয়ার টলষ্টয় আর

খৃষ্টান পাদ্রীদের উচ্চাঙ্গ দর্শন গান্ধীজির জীবনে যে অপার প্রভাব বিস্তার করেছিল, ভারতবর্ষের গীতা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি তার অনুবর্তী হয়েছে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। ওর সঙ্গে প্রাচীন ভারতের কোন কোন আদর্শ ও দর্শনের পারম্পর্যহীন যৌগিক রসায়নে গড়ে উঠেছিল তাঁর অভিনব দর্শন ও বাদ। এর ভিত্তি তিনি রচনা করেছিলেন প্রাচীন ভারতের সংযম, নিয়মনিষ্ঠা, অহিংসা ও সত্যের প্রতি অনুরাগ ও অবিচলতার ওপর। ব্যবহারিক সত্য গ্রহণ করে-ছিল নির্বিকল্প ও নির্বিশেষ সত্যের স্থান। পরম সত্য নয়—সত্য-বাদিতা তাঁর কাছে ছিল বড়। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মতই তিনি ব্যবহারিক সত্যের কষ্টিপাথরে শুধু নিজেকেই গড়েননি, অন্যকেও বিচার করতেন এরই মাধ্যমে। যুধিষ্ঠিরের মতই তাই তাঁর কথায় ও কাজে লাগত অবিরত দ্বন্দ্ব। সর্ববাদিসম্মত ধর্মরাজ হয়েও শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র যুধিষ্ঠির না পেয়ে যেমন পেলেন অর্জুন,(১) ঠিক তেমনি অষ্টাদশ বৎসর ধরে তপস্যারত গান্ধী-চরিত্রের জয়ধ্বনি আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও, দেশবাসী সামান্য একটা বছরের কর্মক্ষমতা রাজনৈতিক অভিজ্ঞান দেখে শুধু মুগ্ধই হল না, পরন্তু সুভাষচন্দ্রকে গ্রহণ করে বসল একান্ত সহজভাবে।

কুটির-শিল্প প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে গান্ধীবাদের মূল তত্ত্ব—অভাব-বোধ বর্জন অথবা অভাব-বোধ সঙ্কোচনের আদর্শ পাশ্চাত্যের জীবন-যাত্রার মান-বৃদ্ধি মনোভাবের বিপরীত তো বটেই, উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদও। গান্ধীজি মনে করতেন,—এবং হয়ত খানিকটা সত্যও যে, এই দৃষ্টিভঙ্গীই গান্ধীবাদের একটা মৌলিক সিদ্ধান্ত। সভাপতি সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও অগ্রগমনের জন্যে পরিকল্পনা পরিষৎ (Planning Commission) গঠন করে মুহূর্তের মধ্যে দেশের

(১)···পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ। গীতা, দশম অধ্যায়, ৩৭ শ্লোক।

শুধু পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীর অন্তরেই এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলেননি, পরন্তু এই পরিষদ গঠন করে সুদীর্ঘ দিনের গান্ধী-প্রভাব করেছেন অস্বীকার। তিনি পরিষদের সভাপতি করলেন জহরলালকে, আর পরিপূর্ণ সমর্থন ও সম্মতি পেলেন রবীন্দ্রনাথের। একজন গান্ধীর উত্তরাধিকারী, আর একজন গান্ধী-গুরু। এঁদের কেউই, বা অন্যেও একথা কল্পনা করতে পারেননি যে, সভাপতি ও সমর্থক নির্বাচনের ভেতরেও সুভাষচন্দ্রের কেবল দূরদর্শিতাই ছিল না, ছিল গান্ধী-প্রভাবের ওপর পরোক্ষে তীব্র আক্রমণ। এ আক্রমণ যে কতটা তীব্র ও মারাত্মক, তার পরিচয় গান্ধী ও গান্ধী-গোষ্ঠী পেলেন অদূর-ভবিষ্যতে। গান্ধী কি চালে ভুল করলেন ?(১)

একটার পর একটা। প্রথমটায় জহরলালের চোখে হয়ত এর গুরুত্ব তেমন করে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু জহরলালের যুক্তিবাদী, অতি আধুনিক সন্ধানী দৃষ্টি বেশিদিন অন্ধ হয়েও রইল না। আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে হাজার রকমের কথা তিনি অহরহ বলেছেন, পরিস্থিতির বিশ্লেষণের পটুতাও দেখিয়েছেন, কিন্তু কথা কাজের ভেতর দিয়ে সার্থক করে তোলবার অবকাশ তাঁর হয়নি। ক্ষমতারও হয়ত অভাব ছিল। গণতান্ত্রিক স্পেনের মহাদুর্দিনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ১৯৩৮এ স্পেনে গিয়েছিলেন, তার প্রতি সহানুভূতিও দেখিয়েছিলেন, কিন্তু জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মাধ্যমে তার হয়ে কিছু করবার ইচ্ছা, সুযোগের সদ্ব্যবহার ও ব্যবস্থা করা সেদিন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। একান্ত

(১) ১৯৩৯-এর কংগ্রেস সভাপতির পদে পুনরায় সুভাষচন্দ্রকে মনোনীত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅনিল চন্দকে দিয়ে জহরলালের নিকট অনুরোধ-পত্র পাঠিয়েছিলেন। জহরলালকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এই কথা বলতে। বলেও-ছিলেন—এবং বলেছিলেন খুব জোর দিয়ে যে, পরিকল্পনা-পরিষদের মত একটা নতুন ও গুরুতর বিষয় সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সুভাষের দ্বিতীয়বার সভাপতি হওয়া খুবই প্রয়োজনীয়।—বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটার্স, ৩০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সহজভাবে। তাই যেদিন সুভাষচন্দ্র মুক্তিকামী চীনের সাহায্যে 'মেডি-ক্যাল মিশন' গঠন করবার প্রস্তাব করলেন এবং প্রস্তাবানুযায়ী 'মিশন' প্রেরিতও হল, জহরলাল বিস্মিত কম হননি, কিন্তু তার চেয়ে সম্ভবত অনেক বেশি হয়েছিলেন ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তারতম্য দেখে, শক্তি ও সামর্থ্যের তারতম্য বুঝতে পেরে।

সর্বশেষে, যেদিন সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক সমস্যা বিশ্লেষণ করে ইওরোপের আসন্ন দুর্যোগের ইঙ্গিত দিলেন এবং ইংরেজের জন্যে বিশেষ করে অদূর-ভবিষ্যতে যে দুর্গতি অপেক্ষা করছিল তার সুযোগ নেবার জন্যে বার বার আহ্বান জানালেন কংগ্রেসকে তথা সমগ্র দেশবাসীকে, —সুভাষের স্বচ্ছ দৃষ্টি, তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব জহরলালের মনে যে পরিমাণে আর যত বেশি রেখাপাত করতে লাগল, শুধু অসূয়াই সেদিন সেই পরিমাণে মনে জাগেনি, জেগেছিল ভবি-ষ্যতের এক বিশেষ প্রশ্ন—গান্ধী-পরবর্তী ভারতবর্ষের নেতৃত্বের প্রশ্ন।

লক্ষ্মৌ কংগ্রেসের প্রাক্কালে নেতা বার বার জহরলালকে তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস জানিয়েছেন। তাঁরই ডাকে নেতা কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বাহ্ণে আইন অমান্য করে ভারতে প্রবেশ করেন। বন্দিত্ব তিনি স্বীকার করে নেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার আসন দিয়ে-ছিলেন জহরলালকে, আর নেতার আসনও। কিন্তু জহরলালের মনের ঔদার্য ও ধৈর্য না ছিল গভীর, না ছিল অভিজাত। তিনি এর মর্যাদা রক্ষা করতে পারেননি। মনের চিরন্তন নিরাসক্তি ও নিস্পৃহতা একজন বৃহত্তর প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয়ে কুণ্ঠিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হতে সময় লাগল না। মানুষ জহরলালের ওপর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করল রাজনৈতিক ও রাজনীতিজ্ঞ জহরলাল, যাঁর সঙ্গী, সমর্থক ও উপদেষ্টা ছিল গান্ধী-গোষ্ঠী আর তাদেরই উদ্ভাবিত মত ও মতি। মানুষ জহরলাল, আদর্শ-বাদী জহরলাল ঘুমিয়ে পড়ে থাকল অনেক পেছনে।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, বিশেষ কোন-কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও সমস্যা তার ভেতরেও উঁকি দিতে চেয়েছে,

কিন্তু মোটের ওপর তা ছিল বেশির ভাগই আদর্শগত। জহরলালের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে-আভাষ দেখা দিল এই সময়ে, তার পেছনে ছিল নিছক ব্যক্তি-প্রাধান্যের প্রশ্ন—বিশেষ করে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সমস্যা। হরিপুরের পর ত্রিপুরী এই জ্বলন্ত সত্যই শুধু উদ্ঘাটিত করেনি, নেতার জীবনের অপরিমেয় উপাদানেরও তা সন্ধান দিয়েছিল।

এছাড়া ছিল দেশের আভ্যন্তরিক ঘটনা ও সমস্যা ; এবং তার সমাধানের তারতম্যও জহরলালকে কম উদ্বিগ্ন করেনি। আসাম-সমস্যার বিচক্ষণ সমাধানের জন্যে নেতা পেয়েছিলেন সকলের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা। যুক্তপ্রদেশে জহরলালের হটকারিতায় কংগ্রেসের শক্তি বহুলাংশে হয়েছিল খর্ব। জহরলাল ১৯৩৬এর সভাপতিত্বকালে গোড়াতেই গান্ধী-চক্রের সঙ্গে মনান্তর করে তারপর পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের মাধ্যমে গান্ধী-গোষ্ঠীর প্রিয় হয়েছিলেন, কিন্তু হারিয়েছিলেন সংগ্রামী ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা। কিন্তু সুভাষচন্দ্র অকারণে বা স্বল্পকারণে গান্ধী-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণও করেননি, আর পরে অনুশোচনা করবারও তাঁর কোন কারণ ঘটেনি। ডাঃ পট্টভি ঐ সময়কার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—"ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে তাঁর মত-পার্থক্য ছিল, কিন্তু তা নিয়ে তিনি কখনও নিজেকে জাহির করতেন না। বিতণ্ডায়ও কোনদিন প্রবৃত্ত হননি। পক্ষপাতিত্ব তাঁর আদবে ছিল না। অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মতান্তর হত, কিন্তু তার জন্যে কোন সমস্যাও জাগেনি, অথবা কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়নি। গোটা বছরটা কেটেছে শান্তির মধ্য দিয়ে।"(১)

সুভাষচন্দ্রের এই গম্ভীর ও চাঞ্চল্যহীন মনোভাব ও পরিচালনা উল্লেখ করে জহরলাল তাঁকে বিদ্রূপ করতেও প্রয়াস পেয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে নেতা যা বলেছিলেন জীবনে জহরলাল তা ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু এ-সব পরের কথা।

(১) কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৪ পৃঃ।

নতুন শাসন-সংস্কার স্বীকার করে নেওয়ায় ও চালু হওয়ায় একটা সুফল দেখা গেল। সত্যি সত্যি দেশের কত অংশ ইংরেজ-বিরোধী এটা জানা গেল। সভা-সমিতির জনসংখ্যা আর শোভাযাত্রার বিপুল জৌলুশ সত্ত্বেও ইংরেজ স্বীকার করতে চায়নি, কংগ্রেসের দলে দেশের বেশির ভাগ লোক। আরও একটা কথা প্রমাণিত হল : ভারতবর্ষের সব মুসলমান মুসলিম লীগের দলে, এই কথাটা নির্বাচনের পূর্বে মুসলিম লীগের পাণ্ডারা বলত অহরহ। নির্বাচনের পর দেখা গেল, ওটা একেবারেই বাজে কথা। বঙ্গে আর যুক্তপ্রদেশ ছাড়া আর কোথাও যে মুসলিম লীগের প্রভাব তেমন জোরাল নয়, এটাও প্রমাণিত হল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস, পাঞ্জাবে সেকেন্দার হায়াৎ খাঁয়ের ইউনিয়নিষ্ট পার্টি এবং সিন্ধুর আল্লা বক্স জিতে গেল।

যুক্তপ্রদেশেও মুসলিম লীগ পার্টি জিতত না; জিতল উলেমার সাহায্যে। উলেমা দল গোড়া থেকেই কংগ্রেসের অনুগামী ছিল। নির্বাচনের পূর্বে যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটুখানি 'বন্দোবস্ত' হয়েছিল এবং নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করবে, এমন একটা কথাও চালু হয়ে গিয়েছিল। বাংলা ছাড়া যুক্তপ্রদেশের মুসলমানেরা সেদিন অন্যান্য প্রবেশের চেয়ে রাজনৈতিক বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর ছিল। ওদের নেতা ছিলেন চৌধুরী খালেকুজ্জমান। একদা ইনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন।

বাংলাতেও মুসলিম লীগের অবস্থা সন্তোষজনক হল না। বাংলায় মুসলিম লীগকে মন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে ওর সাহায্যে জাতীয় দলকে শায়েস্তা করবে, এটা অনেক আগে থেকেই ছিল ইংরেজের পরিকল্পনা। কিন্তু পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ফজলুল হকের কৃষক-প্রজাদল অনেক সংখ্যায় নির্বাচিত হল। কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করবার ইচ্ছা ছিল ফজলুল হকের পুরোপুরি। কিন্তু কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে পরাঙ্মুখতা আর প্রাথমিক না-গ্রহণ-না-বর্জন নীতি তা হতে দেয়নি। অন্যান্য প্রদেশের আর বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে এক নয়,

পার্থক্য রয়েছে আকাশ-পাতাল, এই সহজ তথ্যটা কংগ্রেস-নেতাদের মাথায় ঢুকতে সময় লাগল প্রচুর।

কৃষক-প্রজাদলের অধিকাংশ সভ্য ছিল পূর্বাপর কংগ্রেসের সভ্য। সাম্প্রদায়িক জিগির লঘু করবার জন্যে ওরা গড়ে তোলে কৃষক-প্রজা-দল। কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠান, এ-কথা বেশ ফলাও করে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল মুসলিম লীগ।

দীর্ঘকাল জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় বাংলার মুসলমান সমাজেও জাতীয় ভাবের বিলক্ষণ উন্মেষ হয়েছিল। বাংলার স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনও খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। অন্যান্য প্রদেশে এটা হয়নি। অনেক প্রদেশের মুসলমান সমাজে মুসলিম লীগই সৃষ্টি করেছিল চেতনা।

কংগ্রেস-সভাপতি জহরলাল গোড়ায় ছিলেন মন্ত্রিত্ব-বিরোধী। তাঁকে বুঝিয়ে ও নানাভাবে তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে মন্ত্রিত্বের সমর্থক করা গেল,—কিন্তু তখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে বিলক্ষণ। ফজলুল হক মিতালি করলেন মুসলিম লীগের সঙ্গে।

যুক্তপ্রদেশেও ঘটল প্রায় অনুরূপ ঘটনা। কথা ছিল ওখানকার মন্ত্রি-সভায় দুজন মুসলমান স্থান পাবে। জহরলাল হিসেবী লোক। কাগজে ছক কেটে আর আর অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিলেন যে, ওটা হয় না—লোকসংখ্যার অনুপাতে একজন। মুসলিম লীগ মুখ ঘুরিয়ে নিল। নির্বাচনে পরাজিত দলপতি জিন্নার পক্ষে নতুন করে শক্ত বনেদের ওপর মুসলিম লীগ গড়ে তোলবার ভিত্তি স্থাপিত হল এই যুক্ত-প্রদেশেই। এই প্রসঙ্গে মৌলানা আজাদ বলেছেন—"জহরলাল আমার প্রিয়তম বন্ধু,...তবুও বলব যে, নিছক ভাবাবেগেই তিনি বেশি পরিচালিত হন। শুধু তাই নয়, সময় সময় থিয়োরী নিয়ে অত্যধিক কসরৎ করতে গিয়ে বাস্তব পরিবেশকে লঘু করে দেখেন।"(১)

(১) ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম্—আজাদ, ১৬০ পৃঃ।

আর এই থিয়োরীর প্রসাদেই দীর্ঘকালের জন্যে বাংলায় এক উগ্র সাম্প্রদায়িক শাসন প্রতিষ্ঠিত হল, যার পরিণতি দেখা দিল এক হিংস্র শোণিতাক্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

আসামেও তাই হত। হতে দিলেন না নেতা ; সভাপতি হবার পরই ছুটে গেলেন আসামে। সাদুল্লা মন্ত্রি-মণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক কার্য-কলাপ তখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সংখ্যায় কম হয়েও সাদুল্লার দল মন্ত্রি-সভা গঠন করে ফেলল অন্যান্য দলের সাহায্য নিয়ে। আর একক দল হিসাবে সংখ্যায় বেশি থেকেও কংগ্রেস দল অসহায় সাক্ষী-গোপালের মত তাই দেখে চলছিল নির্বাক্ হয়ে। এখানেও সেই থিয়োরীর খেলা। সংখ্যায় দলভারী না হয়ে কোন দলের পক্ষে মন্ত্রিত্ব নেওয়া সঙ্গত নয়, কেতাবে লেখা রয়েছে এই ধরনের কথা।(১)

নেতা এ-কথা মানলেন না। সাদুল্লা মন্ত্রি-সভার পতন ঘটিয়ে এবং কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গঠন করে নেতা আসাম পরিত্যাগ করলেন। নতুন ওয়ার্কিং কমিটি নিয়ে নেতা মাথা ঘামাননি মোটে। তিনি জানতেন ভাল করেই যে, মাথা ঘামাতে গেলে গোড়াতেই মতান্তর মনান্তরে গিয়ে পৌঁছতে বেশি সময় লাগবে না। কংগ্রেসের পাণ্ডাদের এ-সুযোগ দিতে তিনি চাননি। মনান্তর যদি কোনদিন অনিবার্য হয়ই, তিনি পেছিয়ে যাবেন না, মুখোমুখী দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু খুঁচিয়ে ওটা সৃষ্টি করবার আবশ্যকতাও তেমন নেই। আসামের ব্যাপারে প্রথমটায় পাণ্ডারা একটু মুখ বেঁকিয়েছিল—কোয়ালিশন ভেঙে যাবে আর কংগ্রেসের মুখে পড়বে চুণ-কালি। কিন্তু মাস-ছয়েক যেতে-না-যেতে ওরা সুভাষ বোসের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। নেতা শুনলেন, জানলেন, মুখ-টিপে হেসে নিজের কাজে

(১) সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়ে কোন গভর্নমেণ্ট গঠনের দায়িত্ব নেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে সঙ্গত হবে না···আদর্শের এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই জহরলাল এ-কথা বলতেন। ইণ্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রীডম্—আজাদ, ১২৯ পৃঃ।

ডুবে গেলেন। কৃপালনী ছিলেন তখন কংগ্রেস কমিটির মুখ্য সম্পাদক। ওদিকে ফিরেও তাকালেন না, একটানা প্রচারে মেতে গেলেন। সময় খুবই সঙ্কীর্ণ। সামনে কাজের অন্ত নেই। ইওরোপের রণাঙ্গণে কুচকাওয়াজ শুরু হয়ে গেছে। পাঁয়তারা চলছে উভয় পক্ষের। হিটলারের দাপাদাপি, ইংরেজের মিউ মিউ শোনা যায় দূর থেকেও। মিউনিক পর্ব শেষ হয়ে গেছে; গেছে চেকোশ্লভাকিয়ার পাঁজরার খানিক অংশ। অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যের সমাধি দেখেছে সবাই নির্বাক্ হয়ে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ সবাইএর চোখ খুলে দিয়েছে। আদর্শ আর উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের চেয়ে বাস্তব স্বার্থ যে দামী ও গুরু, এ-কথা মুখে কেউ বলেনি, কাজে দেখিয়েছে। ফ্রান্স ভরসা পায় না ইংলণ্ডের মিষ্টি কথায়। তাই ও দূরের পানে চায়, করে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট প্যাক্ট। কিন্তু কাছেও যে বুনো বাঘের গোঙানির অন্ত নেই; করে ফেলে লাভাল-মুসোলিনী প্যাক্ট। ইংলণ্ডের চেম্বারলেন চান জার্মেনীকে তুষ্ট করতে, আর চার্চিল চান ফ্রান্সের মিতালি বজায় রাখতে।

বড়লোক ইংরেজ আর বড় বড় লর্ড হিটলারকে পছন্দ করে। কম্যুনিষ্ট-বিরোধী হিটলার তার শক্তি বাড়িয়েছে অনেকখানি সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐ শক্তি যদি কম্যুনিজম ধ্বংসের কাজে লেগে যায়, আপত্তি কোথায়? ওরা খুলেই বলেছে যে, ওদের লক্ষ্য পূবে, পশ্চিমে নয়। Draug natch osten—Drive to the east,—এ কথা না, ওদের গোড়ার কথা।(১)

ফ্রান্সের লাভাল-মুসোলিনী প্যাক্টে ইংরেজ সন্তুষ্ট নয়। তাই ইংলণ্ড আর ইতালীর মধ্যে রফা হয় রাতারাতি। গড়ে ওঠে এ্যাংলো-

(১) ইংরেজ রাজনীতিবিৎদের কথার পেছনে হিটলারের প্রতি ভয় ত ছিলই, বেশ খানিকটা ইতর ভঁাড়ামিও দেখা যেত।—দি ডিস্কভারী অব ইণ্ডিয়া—জহরলাল, ১৯ পৃঃ।

ইতালিয়ান চুক্তি। আবিসিনিয়ার হত্যাকারী মুসোলিনীকে ইংরেজ মাতব্বর স্বীকার করে নিয়েছে,(১) আর স্বীকৃতি জানিয়েছে বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোকে। গণতন্ত্রের পূজারী ওরা। সনাতন পূজারী ইংলণ্ড আর ফ্রান্স। গণতন্ত্রের কবরের ওপর ফ্রাঙ্কো স্থাপন করেছে ওর ফ্যাসিষ্ট সিংহাসন। আর সেই সিংহাসন রক্ষার ভার নিয়েছে ইংলণ্ড আর ফ্রান্স। গণতন্ত্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখেও ইংলণ্ড আর ফ্রান্স ফ্রাঙ্কোর জয় গাইতে দ্বিধা করেনি।

যুদ্ধ অনিবার্য। ইংলণ্ড চেষ্টা করছে প্রাণপণে যুদ্ধ পরিহার করতে। কিন্তু জড়িয়ে ওকে পড়তে হবেই। ভূমধ্যসাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে মুসোলিনী স্বপ্ন দেখবে ওটাকে 'রোমান লেকে' পরিণত করতে—জিব্রালটারের দিকে শ্যেন দৃষ্টি ফেলতে চাইবে। ইংরেজের মাল্টা আর সাইপ্রাস, আলেকজান্দ্রিয়া আর সুয়েজ,—দম বন্ধ হতে চায় ইংরেজের।

হিটলারকে তুষ্ট করতে ইংরেজ কম করেনি। কিন্তু পুবদিকে সে যে-ভাবে একের পর এক গিলতে আরম্ভ করেছে, তার ভরসা কোথায়? ইংরেজ নিজেকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারবে না—যুদ্ধে তাকে নামতে হবে।

নেতার মুখে একটিমাত্র কথা : মহা-সুযোগ জাতির সামনে এগিয়ে আসছে। এর সদ্ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসের বড়কর্তারা নেতার এ-কথায় সায় দিতে চান না, সায় দিতে পারেনও না। এ-কথায় সায় দেওয়ার অর্থ আবার সংগ্রাম শুরু করা। ওখানেই আপত্তি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মন্ত্রিত্ব পাওয়া গেছে। শাসন-কর্তৃত্বের ওপর বসেছে মায়া—প্রভুত্বের মায়া, আয়াসের মায়া, ব্যাজ-স্তুতির মায়া। পুলিশ এতকাল ধরে-বেঁধে নিয়ে গেছে হিড় হিড় করে

(১) বৃটেনের অনেক নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ্ মুসোলিনী সম্পর্কে বেশ মোলায়েম আর প্রশংসার সুরে তাঁর রাজ্যের আর নীতির কথা বলতেন।—দি ডিস্কভারী অব ইণ্ডিয়া, জহরলাল, ১৮ পৃঃ।

টেনে ; লাঠি মেরেছে, মেরেছে লাথি। চাকা ঘুরে গেছে। সেই তারাই আজ সেলাম দেয়, দেয় ভরসা, দেহ রক্ষা করে। শ্বেতাঙ্গ গভর্নর হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে, যারা করতে চাইত এবং করত কর্ণমর্দন। মন খুশিতে ভরে উঠবে না ?

পাঁচশ টাকা মাইনে বটে, কিন্তু এ বাহ্য। ক্ষতি পুষিয়ে গেছে অন্য দিকে ; গেছে গাড়ীতে, বাড়ীতে, বাড়তি হরেক-রকমের পাওনায়।(১) তা-ছাড়া চাকুরি। শ্যালাঃসম্বন্ধিনস্তথা,—হিল্লে হয়ে গেছে। মাসতুতো ভাইদের আর কেউ বাকি নেই। হিল্লে হয়ে গেছে সকলের।

এক বছরের মধ্যেই গান্ধীজি বুঝে নিয়েছেন যে, জহরলাল আর সুভাষ এক ধাতুতে গড়া নয়। জহরলাল বেগ দিয়েছেন, কিন্তু বশও মেনেছেন। সুভাষ বোস বশ না মানলেও ক্ষতি ছিল না, উনি চান উল্টে বশ মানাতে। এক বছরেই সুভাষ অনেক ক্ষতি করেছেন ; দাগাও কম দেননি। আর না।

(১) জহরলালের পরম বন্ধু এডওয়ার্ড টম্‌সন এক চিঠিতে লিখছেন—"যখন শুনলাম যে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মাসে পাঁচশ টাকা মাইনে নিচ্ছেন, মন খুশীতে আর উৎসাহে ভরে উঠেছিল। জীবনটা যে ভেঙ্গে-যাওয়া স্বপ্নের নিছক জের, এ-তথ্য আমার জানা। তবুও যখন শুনলাম যে, কংগ্রেস-মন্ত্রীদের এই তথা-কথিত ত্যাগের সবটাই ধোকা, অন্তর আমার গ্লানিতে ভরে উঠল। তাঁরা তাঁদের ক্ষতিটা পুষিয়ে নিচ্ছেন নানা ধরনের এ্যালাউন্স দিয়ে।...

—বাঞ্চ অব্‌ ওলড় লেটারস্‌, ২৮৯ পৃঃ।

১৯৩৭ এর ২২শে জুলাই গান্ধীজি জহরলালকে লিখছেন—"বিরাট বাড়ী, গাড়ি, ভাতা-সহ পাঁচশ টাকা মাইনের জন্যে চারিদিকে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। গোড়াতেই এই বেহিসেবী বাড়াবাড়ি। এ-বিষয়ে যতই আমি ভাবছি, ততই বিরক্ত হয়ে উঠছি।

—বাঞ্চ অব ওল্ড লেটারস, ২৩৯ পৃঃ।

গুরুদেব স্বয়ং চিঠি দিয়েছেন গান্ধীজিকে। জহরলালকে ডেকেছেন শান্তিনিকেতনে। সুভাষের হয়ে অনেককে অনুরোধও করেছেন। কিন্তু কেন? তিনি কি সুভাষের বিপ্লবী মতি-গতি সমর্থন করেন? দুর্ভাবনা জাগে গান্ধীজির মনে। কবি-মানুষ। ওঁর রাজনীতির ভেতর আসা কেন? ও-সবে থাকবার দরকার কি? সার্থকতাই বা কোথায়? কিন্তু উনিও কম যান না। রাশিয়ার চিঠি লিখে যা কাণ্ড করেছেন ঐ মানুষটি! গান্ধী সে-কথা ভোলেননি। বিশ্বের কোন ভদ্রলোকই অমন করে রাশিয়ার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেনি। রাশিয়ায় না গেলে নাকি কবির তীর্থ-পরিক্রমাই বাকি থেকে যেত। গুরুদেব মাথায় থাকুন; প্রণাম চলবে, চলবে স্তুতিগানও। কিন্তু তাঁর গোষ্ঠী বা দল ভাঙবার মত কোন কাজেই তিনি সায় দিতে পারেন না। তা রবীন্দ্রনাথের কথা হলেও না। সুভাষচন্দ্রকে আবার আগামী কংগ্রেসের সভাপতি করে আর তিনি ভুল করতে পারেন না। কিন্তু কেন পারেন না, এই কথাটি খুলে বলতেও বাধে।(১) রবীন্দ্রনাথকে যে-পত্র গান্ধী লিখেছিলেন, তার ভেতর আর যাই থাক, সরলতা ছিল না। সততাও ছিল কি-না সে-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে।

১৯৩৮-এর ২৪শে নভেম্বর গান্ধীজি জহরলালকে এক চিঠি লেখেন

(১) গান্ধীজি কেন সেদিন মরিয়া হয়ে সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, এ-কথার উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। ডাঃ পট্টভি লিখেছেন—"সুভাষের দ্বিতীয়বার সভাপতি হবার প্রশ্নকে গান্ধী অতখানি দোষের মনে করলেন কেন? নির্বাচনের পরও গান্ধীর মনোভাবের যে কোনও পরিবর্তন হয়নি, এ-কথাটা খোলাখুলিই স্বীকার করা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলে সুভাষ ভিয়েনায় থাকা কালে যে-মনোভাবের আভাষ প্রকাশ করেছিলেন, কংগ্রেসকে সেই পথে গড়ে তোলবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন,—আর কোন কারণ না থাকলেও এই কারণেই গান্ধী তাঁর বিরোধী হয়ে থাকবেন। সুভাষ-সম্পর্কে গান্ধী আচরণের আর কোন কথা ছিল কি-না, তা বলতে পারেন এক গান্ধীই।

—কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৬৭৯ পৃঃ।

সেবাগ্রাম থেকে ।(১) পত্রে গান্ধীজি লিখছেন—"গুরুদেব যে চিঠি পাঠিয়েছেন লোক-মারফত, তা তোমাকে পাঠালেম। আমি উত্তর দিয়েছি। বাংলায় বড্ড বেশি দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। এর হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে হলে ওঁর মুক্ত থাকা প্রয়োজন। সভাপতির কাজের বাইরে না থাকলে এ-কাজ হবে না। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত বলেই গুরুদেবকে আমি জানিয়েছি। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে লিখবেন, অথবা এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবেন। তখন তোমার মতও তুমি জানিয়ো।"(২)

প্ল্যানিং কমিশনের কথা রবীন্দ্রনাথকে বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানিং কমিশনের শুধু সমর্থক নন, অতি উৎসাহী পরিপোষকও। কবির কাব্যলোকের বাইরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এক বিশেষ ও একাগ্র চিন্তা সারাজীবন কবিকে ব্যাকুল করেছে। তিনি সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও উপকরণ সম্বল করে এ নিয়ে পরীক্ষাও চালিয়েছেন নানা ধরনের। জহরলাল ইওরোপ থেকে ফিরে আসতে-না-আসতে কবি চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে—"ভারতের শিল্পোন্নয়নে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সেদিন ডাঃ মেঘনাথ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হল। আলোচনা খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। আমি এর প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। কংগ্রেসের দৃষ্টি এর দিকে ফেরাবার জন্যে সুভাষ যে কমিশন গঠন করেছেন, জানলাম, তার সভাপতি হতে তুমি

(১) বাঞ্চ অব ওল্ড লেটারস, ২৯৮ পৃঃ।

(২) 'ওঁর' অর্থ সুভাষ। এই প্রসঙ্গে ডাঃ পট্টভি লিখছেন—"গান্ধী অন্তরের প্রেরণায় বুঝেছিলেন যে, মৌলানা আজাদ সভাপতি হলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা সুরাহা হওয়া সম্ভব। এই কারণেই সুভাষবাবুকে সভাপতি হতে তিনি উৎসাহ দিতে পারেননি।

—কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃঃ।

কংগ্রেসের ইতিহাসের (২য় খণ্ড) ৬৭৯ পৃষ্ঠায় ডাঃ পট্টভির মন্তব্য আর এই মন্তব্যের পার্থক্য লক্ষণীয়।

সম্মতি জানিয়েছ। তাই এ-সম্বন্ধে তোমার মত জানতে ইচ্ছে করছে। ১৯শে নবেম্বর, ১৯৩৮।"(১)

তাঁকে পত্র লিখেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হলেন না, এটা পূর্বাহ্নেই আঁচ করেছিলেন গান্ধী। তাঁর দূরদর্শিতা ছিল অভ্রান্ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জহরলালকে আগে-ভাগে সতর্কও করেছেন। তাঁর নিজের কথা ও অভিমত আগে থেকে জহরলালকে না জানালে ঐ ভাবপ্রবণ উচ্ছ্বাসী লোকটি যদি দৈবাৎ রবীন্দ্রনাথের কথায় সায় দিয়ে বসেন,—অতি সাবধানী গান্ধী এ-ঝুঁকি নিতে চান না। গান্ধী-অভিমত জানবার পরও অন্তত ১৯৩৮এর শেষভাগে জহরলাল গান্ধী-বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করতে শতবার চিন্তা করবেন, সতর্ক হবেন, হবেন দ্বিধাগ্রস্ত। গান্ধী এ-কথা জানতেন। আরও জানতেন ভাল করে আর একটি কথা : নিজের ব্যক্তিগত অভিমত বলে গান্ধী যে-কথাটা রবীন্দ্রনাথকে বলতে চেয়েছিলেন, সেটা আদৌ ব্যক্তিগত কথা নয়,— হয়ত আদিতে তাই ছিল, কিন্তু কথাটা শেষে হয়ে উঠেছিল গোটা গান্ধীদলের অভিমত বলেই।

প্রথমে উত্থাপন করা হল বাংলার দুর্নীতির কথা। দ্বিতীয় ওজর, সাম্প্রদায়িক সমস্যা। তৃতীয়, সুভাষের বৈপ্লবিক পরিকল্পনা, যা রূপ নিয়েছিল ইওরোপে থাকাকালীন। কিন্তু প্রকৃত কথা গান্ধী একটি-বারও প্রকাশ বা উল্লেখ করেননি, চেপে গেছেন। ও-কথা বলবার তাঁর উপায় ছিল না। সুভাষের আক্রমণে সমগ্র গান্ধীবাদ ও দর্শন কুপো-কাৎ হতে বসেছে, এ-কথা বলা চলে না। কিন্তু সহ্যও কি করা যায়?

প্ল্যানিং কমিশন ছাড়াও অন্য কথা ছিল। তা নেতার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। দিনের পর দিন নেতা স্পষ্ট সোস্যালিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। লেখায়, কথায়, ভাষণে এবং তাঁর পরিকল্পনায় এ-কথা জলজ্যান্ত হয়ে পড়েছে। বম্বে কর্পোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে

(১) বাঞ্চ অব ওল্ড লেটারস, ২৯৫ পৃঃ।

(জানুয়ারী, ১৯৩৮) নেতা সোজাসুজি এবং খোলাখুলি সাম্যবাদের জয়গান গেয়েছেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ২৩শে নভেম্বর যে-চিঠি জহরলালকে লেখেন, তাতে ছিল—"…আমাদের পরিকল্পনার পথে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। সুভাষবাবুর সাহায্যে কলকাতায় আমরা তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করেছি।…আপনি আমাদের ক্লাবের প্রাতিষ্ঠাতা-সভ্য হতে রাজী হননি।…কোন বিশেষ দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া আপনার অভিপ্রেত নয়, এ-কথাও আপনি লিখেছেন। কিন্তু আমাদের ক্লাব তো কোন দলীয় প্রতিষ্ঠান নয়। সোস্যালিষ্ট-সাহিত্য সংগ্রহ ও প্রচার ছাড়া আর কোন দলীয় কাজে ও বিষয়ে ক্লাবের কোন আনুগত্য নেই।…সুভাষবাবু পূর্বেই প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য হয়েছেন।(১)

কথাটা সহজ তো নয়ই, মনঃপূতও নয়। কিছুদিন পূর্বেও এরা—দেশের ভবিষ্যতের কথা যারা ভাবতে চায় একটু স্বতন্ত্র আর ভিন্ন ধরনে, তারা জহরলালকেই ভাবত তাদের মুরুব্বি বলে। জহরলাল স্পষ্ট দেখতে পান পটপরিবর্তনের গতি দ্রুত সরে যাচ্ছে। তাঁর প্রতি আকর্ষণ, আনুগত্য, ও তাঁর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস যদি শুধু সরে যেত নিঃশব্দে, বেদনা তিনি পেতেন, কিন্তু দুশ্চিন্তা তাঁর হত না। তাঁরই একান্ত বর্তমান আর নিকট-ভবিষ্যৎ আর-একজনকে দেবে জয়মাল্য, বরণ করে নেবে অধিনায়ক বলে,—নির্বিকার চিত্তে এ-দৃশ্য উপভোগ করা সহজ তো নয়ই, এ তিনি সঙ্গত হলেই-বা সহ্য করবেন কি করে? গান্ধী-চক্র পরিত্যাগ করবার উপায় আর তাঁর নেই। কায়মনোবাক্যে জহরলাল হয়ে গেছেন গান্ধী-গোষ্ঠীর ভাগীদার। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে সারাজীবনের স্বপ্ন আর কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, আর সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় তাঁকে চেয়ে দেখতে হবে তাই নীরবে নির্বিকার হয়ে। মনের উপরে নৈরাশ্য জমতে থাকে। আর তার সঙ্গে ঘনিয়ে

(১) বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটারস্, ২৯৫ পৃঃ।

আসে অন্ধকার—কালো অন্ধকার। কালোর বুকে জন্ম নেয় অসূয়া। মন ছুটে চলে নীচের দিকে গড়িয়ে।

রবীন্দ্রনাথের একটা কথা জহরলাল কিছুতেই ভুলতে পারেন না। কবি লিখেছেন—"কাজ করবার যন্ত্র যদি বিকল হয়ে ওঠে, ওকে চালাতে পারে সেই, যার চালাবার শক্তি আছে। চালকের পথে যদি বাধা এসে দাঁড়ায়, বাধা সরিয়ে দেওয়াও ঐ চালকের কাজ। যন্ত্রের চালক মানুষ-হিসেবে বড় নাও হতে পারে, কিন্তু সে-যে যন্ত্রবিদ্ এ-বিষয়ে তো সন্দেহ নেই।..."(১)

মারাত্মক কথা। সুভাষের দেশাত্মবোধ, তাঁর ত্যাগ, তাঁর দুঃখ-বরণ নিয়ে যত খুশি লোকে গুণগান করে করুক, বিন্দুমাত্রও তিনি ক্ষুব্ধ হবেন না। কিন্তু কবির কথা নিছক কাব্যলোকের কথা নয়। তিনি বলেছেন সুভাষের কর্মতৎপরতার কথা ; বাস্তব উক্তি, কঠিন আর স্থূলও। রবীন্দ্রনাথ থেকে জয়প্রকাশ। জহরলালও মানুষ, দেবতা নন। ওঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে আগামী কাল।

জহরলাল সেদিন কতখানি ঈর্ষা-কাতর হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁরই লেখা 'দি ডিস্‌কভারী অব্ ইণ্ডিয়ার' বহু পাতায়। প্ল্যানিং কমিশনের ফিরিস্তি, ইতিহাস ও গুরুত্ব বোঝাতে ও বর্ণনা করতে গিয়ে বইখানার লেগেছে পনেরটি মূল্যবান্ পৃষ্ঠা। কমিশনের সভাপতি যে তিনিই ছিলেন এ-কথাও গোড়াতেই বলে নিয়েছেন। কিন্তু কার সভাপতিত্ব-কালে এর সৃষ্টি হল, কার মাথায় স্থান পেল সর্বপ্রথম এর সৃষ্টি কল্পনা, এই সামান্য কথাটি বলবার তাঁর অবকাশ হয়নি। এই প্রসঙ্গে তিনি সুভাষচন্দ্রের নামটা পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। কেন? ভুলে? না, স্বেচ্ছায়?

কিন্তু ইতিহাস ত ভুল করবে না। ডাঃ পট্টভি লিখছেন—"১৯৩৮এর মে মাসে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু সারা ভারতবর্ষের

(১) বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটার্স, ২৯৯ পৃঃ।

প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে দেশের শিল্প গঠন, বৈদ্যুতিক শক্তির উৎসের অনুসন্ধান, সম্প্রসারণ, সরবরাহ এবং বিশেষ করে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এ-বিষয়ে সহ-যোগিতার আবশ্যকতা বিবেচিত হয়। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কংগ্রেস-মন্ত্রীদের পরামর্শ দেবার একটি পরিকল্পনাও এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। শিল্প-মন্ত্রীদের সভার উদ্বোধন উপলক্ষে সুভাষবাবু গভীর শিক্ষণীয় ভাষণ প্রদান করেন এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় পুনর্গঠনের নিখুঁত ও বিশদ চিত্র বর্ণনা করে তাঁর দূরদৃষ্টির প্রগাঢ় পরিচয় প্রদান করেন।

"সুভাষবাবু খুব স্পষ্ট করে বলেন,—যতই বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি-কার্যের উন্নতি করা যাক-না-কেন, কৃষিকার্যের ক্রমবর্ধমান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধিক ও সুলভ খাদ্য-দাবী উঠতে বাধ্য। স্বভাবতঃই এর সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যাও বেড়ে যাবে। দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সুরাহা করতে, উন্নততর জীবনধারণের মান, বাসগৃহ, শিক্ষা এবং অধিক বিশ্রাম পেতে হলে শিল্পের পুনর্গঠনই যথেষ্ট নয়, সমগ্র দেশে শ্রম-শিল্পের অবাধ ও ব্যাপক প্রবর্তন অবশ্য করণীয়। শিল্পবিপ্লব হয়ত দুর্নীতি ও নানা দুষ্ট উপসর্গ সৃষ্টি করবেই, কিন্তু একে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তরও নেই। এর ত্রুটির দিকটা শুধরে নেবার দায়িত্ব আমাদের। এই বিপ্লবের গতি করে তুলতে হবে রাশিয়ার মতই তীব্র—ইংলণ্ডের মত ক্রমিক নয়।(১)...

এরপরও আছে সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ আলোচনা ও সুচিন্তিত বিশ্লে-ষণ। ডাঃ পট্টভি এ-কথা উল্লেখ করতেও ভোলেননি যে, জহরলালকে কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল তাঁর অনুপস্থিতিতে। তিনি তখন ছিলেন ইওরোপে।(২)

(১) কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৯৬ পৃঃ।

(২) প্রকৃতপক্ষে সুভাষ স্বয়ং জহরলালকে অনুরোধ করেছিলেন কমিশনের সভাপতি হতে। সুভাষ লিখছেন (১৯শে অক্টোবর ১৯৩৮)—"প্ল্যানিং কমি-শনের সভাপতি তোমাকে হতেই হবে।"—বাঞ্চ অব্ ওল্ড্ লেটার্স, ২৯২ পৃঃ।

জহরলালের পুঁথি পড়ে মনে হবে যে, প্ল্যানিং কমিশনের সবটা কৃতিত্ব তাঁরই। শুধু তাই নয়, জহরলালের ভঙ্গী ও পরবর্তীকালের প্রচার-কৌশল বলতে চায় যে, বর্তমান ভারতবর্ষের স্রষ্টা তিনিই। কিন্তু, এ-কথার আলোচনা হবে আরও পরে। তবে বর্তমানে এই কথা বলাই যথেষ্ট হবে যে, সুভাষচন্দ্রের এই অভিনব পরিকল্পনার অক্ষম রূপায়ণে কাটছে ও কাটবে তাঁর অবশিষ্ট জীবন। তিনি এই পরম সত্য স্বীকার করবেন না, করতে পারেনও না। কেন পারেন না, তাও আলোচনা করবার ইচ্ছা থাকল স্থানান্তরে।

ষোল

ভোরবেলাতেই ছুটে আসি এলগিন রোডের বাড়ীতে। কোনদিন দেখি তাঁকে স্নানের ঘরে, কোনদিন শোবার ঘরে। হয়ত প্রত্যূষের কাজ শেষ করে অপেক্ষা করছেন, বা সবে চা-এর কাপ হাতে তুলে নিয়েছেন। সামনের চেয়ারে বসে পড়ি। চা খেতে খেতে তৈরী হয় দৈনন্দিন কাজের তালিকা। লোকের পর লোক এসে পড়বে বেলা আটটা বাজতে-না-বাজতে। তারপর বাইরের ডাক।

মাসের মধ্যে কুড়ি দিন কাটে কলকাতার বাইরে। দেশের চারদিক থেকে আসে ডাক—ডাকের পর ডাক, বিশ্রাম নেই। দেহের কথা ওঠে। নেতা বলেন,—"চমৎকার লাগছে আজকাল। মনেও হয় না যে আমার অসুখ করেছিল।"

"পেটের ব্যথাটা নেই?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"একেবারে না।"

"কিন্তু বড্ড বেলা হয়ে যাচ্ছে দুপুরবেলা খেতে।"

"তা হচ্ছে একটু। কিন্তু কিচ্ছু হবে না ওতে। হত যদি জেলে থাকতাম।"

হেসে উঠলাম দুজনে একসঙ্গে। ও-কথাটার অর্থ ছিল। বাইরের সবাই জানত, যতবার নেতা জেলে গেছেন, প্রতিবারই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আর সে রোগ মারাত্মক হয়ে ওঠে দিনের পর দিন। বাইরে থাকতে কিন্তু রোগ ধারে-কাছেও ঘেঁষে না।

ফলে কেউ কেউ সে সময় বলতে চেয়েছে যে, দণ্ড ফাঁকি দেবার কৌশল ওটা। সত্যি কিন্তু তা নয়। কর্মব্যস্ত জীবনের গতি ওঁর রুদ্ধ করবার ফলেই রোগ চেপে ধরবার সুযোগ পেত। কারাগারের নিরবচ্ছিন্ন কর্মহীনতা উনি সইতে পারতেন না।

চা খাওয়া শেষ হবার পর শুরু হয় একটানা কাজ বেলা দুটো অবধি। ক্লান্তি নেই। বিরক্তিই কি ছিল? মাঝে মাঝে চা। আর চলত মশলার শ্রাদ্ধ।

আমাদের হাসি শুনে মা-জননী এসে দাঁড়ান। আর আসে ইলা, সেজদাদা সুরেশবাবুর মেয়ে। অপূর্ব লাবণ্যময়ী ইলা। ওকে দেখলেই আমার মনে পড়ত দেবী সরস্বতীর কথা। দুজনেই হাসির কারণ জানতে চান।

আগের দিন ফিরেছেন নেতা বম্বে থেকে। ভৃত্য করুণা পথের জামা-কাপড় জমা করছে ধোপার বাড়ী পাঠাতে। সহসা মা-জননী ফিরে তাকালেন সেইদিকে; করুণাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বিছানার চাদর দুখানা কেন রে?

"আজ্ঞে, দুখানাই তো নিয়ে এলাম।" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ভৃত্য।

"তাই বটে! আমি গুণে তোমাকে চারখানা দিইনি?"

কথা নেই ভৃত্যের মুখে। চোখে ওর শঙ্কা জাগে। নেতা হাসতে থাকেন ঠোঁট চেপে। ইলা বলে ওঠে—"রাংকুর যত কাণ্ড! বেছে বেছে যত সব—" কথা শেষ হয় না। জামা-কাপড়ের স্তূপ থেকে বেছে বার করে নেয় ইলা গোটা-দুই জামা। কোনটার গলা ফাঁসা, কোনটার কনুই ফুটো। সে রিপু করতে চলে যায়।

হাসতে হাসতেই মা-জননীকে বললাম—"এর পরে এ-সবের হিসেব কে রাখবে ?"

সহসা তাঁর সারা মুখখানা থমথমে হয়ে গেল। চোখ-দুটো ওপরের দিকে তুলে মুখখানা উঁচু করে ধরলেন। বিচিত্র এক ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল সে-মুখে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে বললেন—"আমি ত আর দেখতে থাকব না।" অর্থাৎ ভগবান তখন দেখবেন। তাই ঊর্ধ্বের প্রতি চোখের ইঙ্গিত। কথা আমার ফুটল না। চেয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে।

বাইরের ঘর তখন লোকে গিস্‌গিস্ করছে। সিঁড়ির ডান দিকে নেতার ঘর ; বাঁদিকে আর সকলের। তারপর টাইপিষ্টের ঘর। ওরই লাগোয়া বারান্দার মুখোমুখি নেতার শোবার ঘর গাড়িবারান্দার ঠিক ওপরে। নেতার বসবার ঘর চমৎকার রং করা। জাতীয় পতাকার তিন রং-এ রাঙান। মাথার কাছে বই-বোঝাই আলমারি। উত্তরের দেয়াল-ঘেঁষা আর একটা আলমারি, রাষ্ট্রপতির উপহারে সাজানো—হরিপুরের মালা, বম্বের আর অন্যান্য প্রদেশের মানপত্র, আরও হরেক রকম সামগ্রীতে ভরা। ওরই সামনে কয়েকখানা কৌচ। মাঝখানে বেশ বড় আর গোল পেগ্ টেব্‌ল। নেতার বসবার চেয়ার দক্ষিণের দেয়াল-ঘেঁষা আলমারির সামনে। মস্ত বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বাঁদিকে টেলিফোন। তারও বাঁ ধারে ফাইলের র‍্যাক্।

মাঝে মাঝে কার্ড আসে ; আসে নানা ধরনের চিরকুট। দর্শনার্থীর নাম লেখা কোনটায়, আবার কোনটায় থাকে সাক্ষাতের আবেদন। চলতে থাকে দেখা করা আর কথা বলা, পর পর শিকলের মত ছেদহীন। নানা ধরনের লোক—নানা কাজের,—কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, এ্যাসেমব্লির সদস্য, কংগ্রেসকর্মী, এদের ত কথাই নেই। আসে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, আসে গ্রন্থকার, আসে সমিতি আর সম্মেলনের কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তারা, আসে সাধারণ মানুষ—অনামী, অজানা। ছেলের চাকরী, প্রমোশন, প্রশংসা-পত্র এ তো নিত্যকার

কাজ। এ-ছাড়া আরও গুরুতর কাজ করতে হয়। ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে…একটা বছরের খরচ……ক্লাসটা শুধু পার করে না দিলে। তারপর কন্যাদায়। হ্যাঁ, বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু টাকা? গোদের ওপর বিষফোড়া…মেয়েটার না আছে শ্রী, না আছে ছাঁদ। তবু দুহাজার পেলে,—ও-পাপ বিদেয় করবার আর পথ কোথায়? নাছোড়বান্দা কন্যার পিতা ক্রমে মারাত্মক হয়ে ওঠে।

এদিক-ওদিক চেয়েও সুবিধে হয় না। কন্যার পিতা একেবারে এসে দাঁড়ায় মুখোমুখী। নেতার বিষণ্ণ বিপন্ন স্তব্ধতা ওকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। সঙ্কোচ ভেঙ্গে ফিসফিস করে বলে ওঠে—"আজ্ঞে আপনি ত আজও…না হয় নিজেই…।" নেতা পালাতে পথ পান না; ডেকে বলেন, যা হোক কিছু দিয়ে বিদেয় কর। এমনিভাবে চলতে থাকে দেশের কাজ। কংগ্রেসের সভাপতি, দেশের নেতা,—তাই দিন-ক্ষণ থাকতে নেই—বাধা নেই, নিষেধ নেই। রাষ্ট্রপতি সুভাষ অনেক দূরে পড়ে থাকেন। দেশগৌরব সুভাষ তলিয়ে যান অথৈ জলের তলায়। ফুটে ওঠে বাংলার সুভাষ—ভারতবর্ষের সুভাষ—দরদী, মরমী, ভোলানাথ সুভাষ।

ওরই মাঝে দেখা দেয় ব্যক্তি সুভাষ—গম্ভীর, অচপল, কঠিন, আর রাশভারী। ভিন্‌দেশী সাক্ষাৎপ্রার্থী অথবা সরকারী কেউ-কেটা অথবা বিরোধী দলের নেতা বা আর কেউ সামনে এসে সসঙ্কোচে বসে পড়ে। কথা হয় দুটো কি একটা। চারপাশে ঘিরে থাকে দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্ব আর দুর্বোধ্য সংযত রহস্য। বেশি এগোতে চায় না কেউ, পারেও না।

টেলিফোন বেজে ওঠে।…আমি সুভাষ।…কে?…ফ্রী প্রেস?…চারু?…না…না…দুচার দিন…হ্যাঁ থাকব…শুরু হয়ে গেছে…তাল চোর, ঢেল কানন, হিন্দোল, রণপুর…আরও আছে…মহীশূর আর জয়পুরও…হ্যাঁ রাজকোটও…আসবে?…তা, এসো না…ষ্টেটমেন্ট?…আচ্ছা…এসো…দেব, দেব…আচ্ছা…

এবার দেশীয় রাজ্য। চারদিকে শুরু হয় গণ-আন্দোলন। গণেশের ঘুম ভেঙ্গেছে, দোলাতে শুরু করেছে শুণ্ড। গতি মন্থর কিন্তু মারাত্মক অখণ্ড ভারতবর্ষের ঐ যে খাপছাড়া দেশীয় রাজ্য, ওদের বাদ দিয়ে তো স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। ওদেরও সঙ্গে নিতে হবে। ওরাও তো ভারতবাসী।

ফ্রী প্রেসের বিধু সেনগুপ্ত এসে দাঁড়ান। হাতে ওঁর এক-গোছা কাগজ—খুলে ধরেন নেতার সামনে। টেলিগ্রাম—রয়টারের বার্তা। বিলেত থেকে এসেছে এবং এসেছে সদ্য সদ্য। ছাপা হবার সময় পায়নি কাগজে। ভুলাভাই দেশাইএর বক্তৃতার সারাংশ। কংগ্রেস নাকি যুক্ত-রাষ্ট্রের কথা ভাবতে শুরু করেছে। বিরোধ খুব বেশি দেখা না দিতেও পারে। বিস্ময় আর বিরক্তি দেখা দেয় নেতার চোখে-মুখে যুগপৎ। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ভুলাভাই। গান্ধী-গোষ্ঠীর অন্যতম, আইন-জ্ঞানের জাহাজ, বুদ্ধি ও প্যাঁচের খেলায় অদ্বিতীয়, বক্তৃতায় অসাধারণ।(১)

আন্দামান থেকে বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনবার কথা পাকা হয়ে গেছে। ইংরেজের হুকুমনামা এসে গেছে। আনন্দ আর খুশিতে নেতার মন ভরে ওঠে, বলেন,—"মন্দের ভাল, তবু ওরা দেশে ফিরছে। এবার যেমন করেই হোক ওদের জেলের বাইরে নিয়ে আসতে হবে।"

গান্ধীজি দেখা করেছেন বাংলার মন্ত্রীদের সঙ্গে, দেখা করেছেন গভর্ণর এ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন গান্ধীকে জানিয়েছেন যে, কয়েকটি সর্তে ওদের কারও কারও মুক্তির ব্যবস্থা হতে

---

(১) "ওয়ার্ধায় বাপুকে লেখা আগাথা হ্যারিসনের চিঠি আমি পড়েছি। ভুলাভাইএর বক্তৃতার এমন অর্থ হবে, এ-কথা জেনে তিনি খুব দুঃখিত হয়েছেন। লোকে ঠিক ভাবে ভুলাভাইএর কথা বোঝেনি, আর সম্ভবত ঠিকভাবে ওটা প্রচারিতও হয়নি।

—কংগ্রেসের মুখ্য সম্পাদক কৃপালনীর ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮এ জহরলালকে লেখা চিঠি থেকে।—বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, ২৮৯ পৃঃ।

পারে। আর সর্তকগুলি যেন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং বিধান-সভার কংগ্রেস-দলের নেতারাও বিচার করেন।(১)

উত্তরে গান্ধী লিখেছেন—"আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, অনুগ্রহ করে সুভাষবাবু বা শরৎবাবুকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেবেন।"(২)

চিঠি আসে শান্তিনিকেতন থেকে। স্বয়ং কবি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নেতাকে শান্তিনিকেতনে যেতেই হবে, এ তাঁর দাবী। নেতা তৈরী হন। এ-কবি শুধু কবিতা লেখেন না ; শুধু কবিই নন—স্রষ্টা। জাতির বর্তমান গড়ে তোলবার কাজে এগিয়ে আসেন, ভবিষ্যতের পথ প্রেরণায় করে তোলেন উজ্জ্বল। দৃষ্টির সম্মুখে অন্ধকারের ঘনঘটা। দুর্যোগ আসন্ন। তার পূর্বাহ্নে এই মন্ত্রদ্রষ্টার কল্যাণ আশিস মাথা পেতে নিতে হবে না ?

কবির কণ্ঠে মৌন মুক বাংলার বলতে-না-পারা বাণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। কবি ডেকে বললেন—"সুভাষ, বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে আমি তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।"...

সমগ্র দেশ বাংলার কবি-মুখে কথা বলে উঠল। কবি জেনে জাননি, কিন্তু সত্যদ্রষ্টা ঋষির চোখে ভবিষ্যতের অজানা ছবি ভেসে উঠেছিল সেদিন ; তাঁর আশিসসিক্ত জাতির নবজীবনের এই নির্ভীক চালক শুধু চলার পথের ইঙ্গিত দিয়েই যথেষ্ট মনে করেননি, পরন্তু দিয়েছেন সর্বস্ব। আর তারই বিনিময়ে জাতির ভাগ্যে সম্ভবপর হয়ে উঠল আশাতীত দুর্লভ প্রাপ্তি।

১৯৩৮এর শেষ। ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে ওয়ার্ধায়। নতুন

(১) গান্ধীজিকে লেখা নাজিমুদ্দীনের চিঠি, তারিখ ১১ই জুন, ১৯৩৮।

(২) ১৫ই জুন নাজিমুদ্দীনকে লেখা গান্ধীজির পত্রাংশ।

শান্তিনিকেতনের সম্বর্দ্ধনা

বছরের সভাপতি নির্বাচন করতে হবে। নানা প্রদেশ থেকে আসছে সভাপতির নাম। সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ আর ডাঃ পট্টভির নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। সভার কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরতে-না-ফিরতে নেতা জানতে পারলেন এক বিস্ময়জনক ঘটনা। আবুল কালাম আজাদ নিজের নাম প্রত্যাহার করে সমর্থন করেছেন ডাঃ পট্টভিকে। সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন,—"ডাঃ পট্টভির নাম প্রস্তাবিত হয়েছে জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমি নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াব না ভেবে তিনিই সরে দাঁড়াবেন স্থির করে-ছিলেন। আমি তা করতে দিইনি। ডাঃ পট্টভি ওয়ার্কিং কমিটির একজন পুরানো সভ্য, একজন অক্লান্ত কর্মীও। কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন ডাঃ পট্টভিকে সমর্থন করেন। আমি এই আশাই করব যে, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন।"

কয়েকটা ঘন্টার ব্যবধান মাত্র। এই মৌলানার সঙ্গে পাশাপাশি বসে কেটেছে গোটা দুটো দিন। কত কথা হয়েছে। হয়েছে কত আলোচনা। অথচ ঘুণাক্ষরে জানতে দেননি তাঁর মনের গোপন কামনা। কিন্তু কেন? চক্ষু-লজ্জায়? বিবেকের বাধায়? তা যদি না হবে, বলতে বাধল কেন? কুণ্ঠারই বা কারণ ছিল কী?

কানাকানির ঢেউ অনেক আগেই নেতার কানে লেগেছে। বুঝতে বাকি নেই যে, এ-নির্বাচন নির্বিঘ্ন হবে না। কিন্তু এমন ঘোরালো হবে, এ-সন্দেহও জাগেনি নেতার মনে। শঙ্কা, সংশয়, নানা বিরোধী প্রশ্ন উঁকি মারে নেতার মনের দুয়োরে। গান্ধীজি কি প্রসন্ন-মনে সহ্য করবেন তাঁকে আর একটা বছর? তিনি করলেও, ওরা—গান্ধীর চারপাশ ঘিরে রয়েছে যারা?

জাতির ভবিষ্যৎ আর অনাগত নয়, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ইও-রোপের রণাঙ্গণ চোখে দেখা যায়। যুদ্ধ অনিবার্য। গান্ধীজি, তাঁর-সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, কংগ্রেসের সংহতি—সবই হয়ত এবার এই নির্বাচনের ফলে আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাবে। একদিকে এই

সব—অনেকদিনের সৌহার্দ্য আর তার নিবিড় আকর্ষণ, অন্যদিকে দেশ, দেশের মুক্তি, ভারতবর্ষের শতাব্দী-ভরা স্বপ্ন ও সাধনা। সমর্থন কি তিনি পাবেন? হয়ত পাবেন, হয়ত-বা পাবেন না। একা, নিঃসঙ্গ—তবু চলতেই হবে। অচঞ্চল সঙ্কল্প জাগে মনের কন্দরে, জাগে মনের অতল থেকে। টেব্‌লের সামনে ঝুঁকে পড়েন নেতা, লিখতে থাকেন মৌলানার বিবৃতির উত্তর—তাঁর ইস্তাহার।(১)

"বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রস্তাবিত হয়েছে আমার নাম। এ-অবস্থায় নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ানো অন্যায় হবে। এ অধিকার আমার আছে কিনা তাও বিচার্য।...সভাপতি-নির্বাচন বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রশ্ন উত্থাপন করা আমি সঙ্গত মনে করি না। কাজেই মিথ্যা বিনয় বা সৌজন্যের কথা না ভেবেই বিষয়টি বিচার করতে হবে। অন্যান্য স্বাধীন দেশের ন্যায় আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া উচিত সুনির্দিষ্ট সমস্যা আর কর্মসূচীর ওপর।" উপসংহারে নেতা লিখলেন—"মৌলানা আজাদের ন্যায় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতার আবেদনের ফলে যদি আমার পুনর্নির্বাচনের পরিবর্তে ডাঃ পট্টভি নির্বাচিত হন, আমি সানন্দে ও নিষ্ঠার সঙ্গে সে-সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেব।"

কিন্তু ততক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে সমগ্র গান্ধী-গোষ্ঠী। ১৯২১ থেকে তারাই সিদ্ধান্ত করেছে কে হবে কংগ্রেসের সভাপতি। সেই প্রথার হবে ব্যতিক্রম? সুদীর্ঘ আঠার বৎসরের গান্ধী-প্রভাব, সুগঠিত সঙ্ঘ-শক্তি, আর অগণিত বিত্তবান, শিল্পপতি ও পুঁজিপতির দল থাকতে থাকতে সাত-সাতটা প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী—একক, বিচ্ছিন্ন, নিঃসম্বল একজন লোক, সে লোক যত বড় হোক, হোক যত লোকপ্রিয়, এই সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে সে হবে জয়ী? সপ্তরথীর ব্যূহ রচিত হল।

(১) সুভাষবাবুর নির্বাচন-ইস্তাহারে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে দেখা দিয়েছিল আদর্শের সমুচ্চ বনিয়াদ। —পট্টভির কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃঃ।

আজাদ পূর্বেই নেমেছিলেন রণাঙ্গণে। এবার এগিয়ে এলেন সর্দার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়রামদাস দৌলৎরাম, আচার্য কৃপালনী আর শঙ্কর রাও দেও। ব্যূহদ্বার রক্ষার ভার নিলেন পরোক্ষভাবে গোবিন্দবল্লভ পন্থ। কিন্তু অলক্ষ্যে রণাঙ্গণের দূরে থেকে তীক্ষ্ণ তীব্র শরাঘাতে সেদিন এই একক দেশভক্তের মর্মস্থল বিদ্ধ করবার যে হিংস্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী আর বন্ধুর বেশে জহরলাল নেহরু, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার সমতুল নজীর খুব বেশি পাওয়া যাবে না।

মহাত্মাজি ও জহরলাল ছাড়া আর সকলের নামে বেরোল সংবাদ-পত্রে এক যুক্ত বিবৃতি : "পট্টভি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র বলে আমরা বিশ্বাস করি। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির এক-জন প্রবীণতম সভ্য। তাঁর স্বপক্ষে রয়েছে দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন লোক-সেবার কাহিনী। অতএব......" ইত্যাদি।

ডাঃ পট্টভি প্রবীণতম ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য, আপত্তি নেই, কিন্তু সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। ওয়ার্কিং কমিটির কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হল না। প্রয়োজন হল না এমন কি কোন আলোচনারও। স্বাক্ষরকারীদের প্রত্যেকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে এই ষড়যন্ত্রের কুৎসিত আর কদর্য মুখরতায় এল না এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা, এই কথাটাই সর্বাগ্রে সেদিন অনেকের মনে জেগেছিল। অহিংসা, সত্য ও অকপটতা যে সঙ্ঘের মূল নীতি, সেদিনের এই নির্লজ্জ কপটতায় সেই সঙ্ঘের সভ্য হওয়া সত্ত্বেও কুণ্ঠা জাগল না কারও মনে মুহূর্তের জন্যে। কোন বাধা এল না গান্ধীজির দিক থেকে। কথাটা চমকাবার মত কথা। কিন্তু রাজনীতির ক্ষুরধার গতির সঙ্গে যার বিন্দুমাত্রও পরিচয় আছে, সে চমকাবে না। দুর্বোধ্যও তার কাছে ঠেকবে না। অযৌক্তিক বলে সে নাকও তুলবে না। এই তো রাজনীতির সত্য পরিচয়। এর ব্যতিক্রম ভাবা হয়েছিল এতদিন গান্ধীজিকে। বিপরীত আশা

পোষণ করা হয়েছিল গান্ধীজিকে ভেবে ; আর তাঁর গোষ্ঠীকেও। রাজনীতির ভেতর তথাকথিত সত্য, ন্যায় ও অকপটতার স্থান একেবারে যে নেই তা নয়, আছে। আছে এবং থাকবেও প্রতিপক্ষের প্রতি উপদেশ দেবার বেলায়—আছে নিজের গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার ক্ষেত্রে। বাস্তবিক আর-আর দল বা গোষ্ঠীর যে ধর্ম, গান্ধী ও গান্ধী-গোষ্ঠী যে তার ব্যতিক্রম নয়, উর্ধ্বে নয়, এ-কথাটা মনে রাখলে ভিন্ন ধরনের প্রত্যাশা কারও মনেই জাগত না।

প্রত্যুত্তরে নেতা দিয়েছিলেন ক্ষুদ্রতম একটি বিবৃতি। ক্ষুদ্র কিন্তু তীব্র, অধিকন্তু মর্মঘাতী।

"আগামী বৎসর বৃটিশ গভর্নমেন্ট আর কংগ্রেসের দক্ষিণী দলের মধ্যে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। স্বভাবতই একজন বামপন্থীকে সভাপতির পদে নির্বাচিত হতে দেওয়া দক্ষিণীদের অভিপ্রেত নয়। বামপন্থী সভাপতি হলে ওদের আলোচনা আর বোঝাপড়ায় বাধা সৃষ্টি হতে পারে, এই আশঙ্কা জেগেছে ওদের মনে।......"

আচম্বিতে বজ্রাঘাত হলেও লোকে এতটা চমকায় না, সেদিন যে-ভাবে চমকে উঠেছিল গোটা গান্ধী-গোষ্ঠী। লোকচক্ষুর অন্তরালে যদি কোনও পরিকল্পনা মনের কন্দরে জেগেই থাকে, সুভাষ বোস সে-কথা এমনি করে জনারণ্যে উৎঘাটিত করে দেবেন, এ-সন্দেহ এর আগে গান্ধী-গোষ্ঠীর মনে জাগেনি। মনে উৎকণ্ঠা ছিল, কিন্তু তাদের সমবেত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে একা সুভাষ বোসের ঘোষণা দেশবাসী সত্য বলে গ্রহণ করবে, এই কল্পনাতীত উপসংহার বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়েছিল বৈকি। কিন্তু তাও হল। নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র জয়ী হলেন।

এর অব্যবহিত পরেই আমরা গেলাম মালদহে।

সতেরো

মালদহ জেলা সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন কিরণশঙ্কর রায়, আর যুব-সম্মেলনের সত্যরঞ্জন বক্সী। সুভাষ-গোষ্ঠীর অতুল কুমারের আগ্রহে আমরা অনেকেই গিয়েছিলাম মালদায়। অনেকে গিয়েছিলেন নানাস্থান থেকে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের মত অমন একটা বিঘ্ন-সঙ্কুল নির্বাচনে জয়লাভ হল, অথচ নেতার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই। ওটা যেন পথের খেলা, যাত্রার অঙ্গ। কে হিসেব করছে লাভালাভ জয়াজয়ের? জীবন-দর্শনের এপিঠ আর ওপিঠ; পার্থক্য নেই, নেই কোন লাভ-লোকসানের কথা। মালদার সম্মেলনে এসেছেন, ঐটাই যেন প্রত্যক্ষ সত্য। এ-ছাড়া আর কোন কাজ নেই—থাকতে নেই। মিছিল আর জৌলুশ হল অফুরন্ত। নির্বিকার এই মানুষটি তার মধ্যে ডুবে রয়েছেন নিজের ভাবনায় বুঁদ হয়ে, চলেছেন নিজের বৃহৎ কল্পনার জাল বুনে।

মনের পর্দায় ছবি ভেসে ওঠে—ইওরোপের ছবি। বারুদের স্তূপ সাজানো রয়েছে সারা ইওরোপের বুক জুড়ে। ইন্ধনের একটু ছোঁয়াচ মাত্র; জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে। টক্‌টকে লাল সেই দাবানলের শিখায় পুড়বে ইওরোপ— পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ছাই হয়ে যাবে জার্মেনী···ইটালী···ফ্রান্স···আর ইংলণ্ড। কিন্তু ভারতবর্ষ? সে কি বাঁচবে? নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে এই সর্বনাশা নরমেধ-যজ্ঞের আমন্ত্রণ থেকে? বিধিলিপি জুড়ে দিয়েছে তার ভাগ্য ইংরেজের ভাগ্যের সঙ্গে। বার বার সে অস্বীকার করেছে, অস্বীকার করেছে দেড়শ বছর ধরে। তবু বিধিলিপির অলঙ্ঘ্য বিধান ওলটায়নি, বদলায়নি।

শত্রু ইংরেজ পাঁকে ডুবছে স্বখাত পঙ্ককুণ্ডে। ওর ডোববার এই,

পরম মুহূর্তের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে না পারলে কতকাল আরও দুঃসহ পরবশতার দুর্বহ ভার বহন করে চলতে হবে। ১৯১৪ ; সেদিনও এসেছিল এই পরম সুযোগ। দেশ সেদিন প্রস্তুত ছিল না। অখণ্ড ভারতবর্ষের চেতনাও কি ছিল ? তার অনেক পরে ১৯৩৯। দীর্ঘদিনের সাধনায় আর আন্তর্জাতিক নানা আন্দোলনের ঢেউ লেগে, যা ছিল শুধু বাংলায় মহারাষ্ট্রে আর পাঞ্জাবে, তা ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে।

১৯৩৯ চায় মুক্তি। গান্ধীর পথে হোক, অথবা যে পথেই হোক— মুক্তি। মুক্তির সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ জাতির দুয়োরে এসে দাঁড়িয়েছে। রুদ্ধ দরজার কবাট খোলবার অপেক্ষা মাত্র। নেতা ভেবে চলেন— দিনরাত ভেবে চলেন—দিনরাত ভেবে চলেন ঐ একটি কথা— এ-ক্ষণও কি চলে যাবে অলক্ষ্যে আর অবহেলায় ?

দুপুর গড়িয়ে গেল মিছিল শেষ হতে। বিশ্রাম ও স্নান সমাপন করে আমরা চললাম কালীরঞ্জন লাহিড়ীর বাড়ী। প্রবীণ ব্যবহারজীবী কালীবাবু। বর্ধিষ্ণু পরিবার। বাড়ীর ভেতরে ঢুকতেই বেজে উঠল সমবেত শঙ্খের গুরুগম্ভীর ধ্বনি, আর তার সঙ্গে একঝাঁক উলু। সদর থেকে মাথায় পড়ল নানা ফুলের পাপড়ি, হল পুষ্পবৃষ্টি, গায়ে পড়ল গোলাপজলের ধারা। অন্দরের প্রশস্ত অলিন্দে আসন হয়েছিল। প্রতি আসনের সামনে মঙ্গল-ঘটের আলপনা আঁকা। আসনে বসতেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন পুরমহিলারা। হাতে বরণডালা, বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার ; একজনের হাতে পাখা। আর একজন নিয়েছেন বড় একখানা পেতলের থালা। থালার ওপর ছোট ছোট বাটি। প্রত্যেকের বরণ হল। ভৃঙ্গার হতে বারির সিঞ্চন পড়ল গায়ে। সঙ্গে তাল-পাখার সস্নেহ মৃদু ব্যজন। হাতের ওপর দেওয়া হল মধুপর্কের বাটি।

নেতা হকচকিয়ে গেছেন। এ এক নতুন ধরনের অভ্যর্থনা, পরিচয় হয়নি কখনও। কিরণবাবুও হতভম্ব। ডান পাশে আমি। ফিস্‌ফিস করে বললেন নেতা,—“ওরে বাবা ! এ সব কী ?”

"প্রাচীন বারেন্দ্র-বঙ্গের রীতি।" বললাম আমি।

"আমাদের কিছু করবার বা বলবার আছে?"

"আছে। বাটিটা হাত পেতে নিয়ে বলতে হবে—স্বস্তি।"

পাশ থেকে কিরণবাবু বলে উঠলেন,—"বারেন্দ্র মজালে দেখছি!" যারা শুনল, হেসে উঠল।

গভীর রাত্রে শেষ হল প্রকাশ্য সম্মেলন। পরদিন শুরু হল মালদা-পরিক্রমা। পুরানো মালদায় ছিল একটা সভা। নেতার যাওয়া হল না, ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। সেখানকার কাজ শেষ করে ওঁর পেছনে ধাওয়া করে চললাম। রাস্তার জানু-ডোবা ধুলো কেটে গাড়ী ছুটে চলছে তীরবেগে। ডুবে গেলাম ধূলোর তলায়, আর তা শেষ হল নবাবগঞ্জে।

আমনূরার গাড়ীতে উঠেই নেতা বলে উঠলেন—"আগে স্নানের ঘরে ঢোকো। ধূলোর পলস্তারা পড়েছে গায়ে।"

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি নেতা চেয়ে আছেন একদৃষ্টে বাইরের দিকে। গোধূলির আলো তখনও নিবে যায়নি; দিগন্তে তখনও রয়েছে রংএর ঝলকানি—সেইদিকে। হাতে সংবাদপত্র। বিষণ্ণ-তায় দুটি চক্ষু ভরে উঠেছে। সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"পড়ো।"

কাগজখানা হাতে তুলে দিলেন। কাগজ মেলে ধরতেই চোখে পড়ল বড় বড় হরফের কয়েকটা শব্দ। গান্ধীজির বিবৃতি: "ডাঃ পট্টভির পরাজয় আমারই পরাজয়।...তবুও বলব যে, সুভাষ দেশের শত্রু নয়।"

প্রথমটা বিশ্বাস হয়নি। কে এই বার্তা-প্রেরক? এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। সন্দেহ করবার কিছু নেই। নির্ভেজাল সংবাদ। নাতিদীর্ঘ বিবৃতি। ফিরে তাকালাম নেতার দিকে।

ঠোঁট দুখানা ঈষৎ বিকশিত হল মাত্র। কথা ফুটল বেশ খানিকটা পরে। বললেন,—"এত অল্পে ওঁর মত মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে, এটা ভাবিনি।"

কথা আমার ফুটল না। মহাত্মাজির সম্পর্কে চট করে কিছু বলাও তো সহজ নয়। মনে হল, ভাবনি যে তা জানি। কিন্তু সত্যিটাই বেরিয়ে পড়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই কথা : রাধাকৃষ্ণের নাম-শেখানো টিয়ে-পাখীকে বেড়াল যখন ধরে, শেখানো বুলি ও ভুলে যায় ; মুখ থেকে একটানা বেরোয়, ট্যাঁ…ট্যাঁ…ট্যাঁ…

আবার বললেন,—"মহাত্মাজিকে আমি সমালোচনা করি যতটা, শ্রদ্ধা করি তার চেয়ে অনেক বেশি। উনি এতটা নামলেন কেমন করে ?"

"অমন অবস্থায় পড়লে সকলেরই মত বদলায়। গান্ধীর দোষ নেই।" বললাম আমি। হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নেতা। আমি আরও বললাম—"ঘা-টা যে বড্ডই দগ্‌দগে। জ্বালা করবে না একটুও !"

গেরুয়া আর নেংটির নীচেই থাকে রক্ত-মাংসের দেহ। দেহ ঘিরে থাকে মন। সেই মনের খেলা। বিচিত্র বই কি !

কামরায় ঢুকে পড়ল অনেকে। শুরু হল নানা কথা।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় দাবী স্বাধীনতা স্বীকৃত না হলে শুরু করা হবে সারা দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। আইন অমান্য থেকে শুরু করে খাজনা বন্ধ পর্যন্ত হবে আন্দোলনের কর্মতালিকা। ইংরেজ-শাসনকে করে তুলতে হবে অচল। ওর অর্থনৈতিক ভিত্তি দিতে হবে ভেঙে। করতে হবে ওর সমর-প্রচেষ্টা বানচাল।

অতীত ইতিহাসের রোমন্থন আর যথেষ্ট নয়। আগামীকালের বিশ্ব-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষা যে নবতম ইতিহাসের ভিত্তি রচনা করে চলেছে ইওরোপের বুকের ওপর, নেতা তাকে দেখেছেন প্রত্যক্ষ। কণ্ঠে বেজে উঠল সুস্পষ্ট ঘোষণা। আগামী ছমাসের মধ্যে ইওরোপের বুকে শুরু হবে রণ-তাণ্ডব। জড়িয়ে পড়বে ইংরেজ আকণ্ঠ। জাতির সমবেত কণ্ঠের দাবী সে উপেক্ষা করবে কোন্ স্পর্ধায় ?

মালদা থেকে পাবনা,—হিমাইতপুর। মেজদাদা শরৎচন্দ্র সভাপতি। শরৎবাবুর সঙ্গে আমি গেলাম আগের দিন। নেতা এলেন পরদিন। বসুজায়া বিভাবতী দেবী অনুগামিনী হলেন স্বামীর। মালদার প্রস্তাব গৃহীত হল পাবনায়। তারপর জলপাইগুড়ি,—প্রাদেশিক সম্মেলন।

চলল বিরামবিহীন সংগ্রাম-প্রস্তুতি। কিন্তু ওরা কি রাজী হবে? নিশ্চিন্ত মন্ত্রিত্ব আর অসার ভাবাবেগের কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে স্বাধীনতার কামনা। দেশ নাকি প্রস্তুত নয়, রাজী নয়, সংগ্রামের উপযোগী নয়। এই একই অছিলায় ইংলণ্ডের চেম্বারলেন দিনের পর দিন হিটলারের দাম্ভিক ঔদ্ধত্যের কাছে নতি স্বীকার করে হয়ত দুর্যোগ আর রক্তক্ষয়ী সমর-ক্ষেত্র দূরে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন দিন কয়েকের জন্যে। কিন্তু শেষ-রক্ষা কি সম্ভবপর হবে? হবে না। সংগ্রামে তাকে নামতেই হবে। স্বাধীনতা হারাবার ভয়ে তাকে নামতে হবে। তেমনি নামতে হবে ভারতবর্ষকেও তার হারানো স্বাধীনতা ফিরে পেতে। যে অধিকার-বোধ অপ্রস্তুত ইংরেজকে অনুপ্রাণিত করবে, বাধ্য করবে সংগ্রামে নামতে, ভারতবর্ষের বোধ তার চাইতেও বড় আর হওয়া উচিত তীব্রতর। স্বাধীনতা হারাবার সম্ভাবনা নয়, হারানো স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার।

নর্থ বেঙ্গল এক্স্প্রেসে আমরা চলেছি জলপাইগুড়ি। ভোর বেলা চা খেতে খেতে কথা হচ্ছিল,—হাল্কা কথা। দিন-কয়েক আগে বেরিয়েছে গান্ধীজির আনকোরা নতুন বাণী। অহিংসার মহিমায় স্বাধীনতা সম্ভবপর না হলে অন্যপথের স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করে নেবেন না। গাড়ীতে ছিলেন শরৎবাবু, নেতা, আরও কয়েকজন। আর ছিলেন সত্যেন মজুমদার ও সুরেশ মজুমদার—আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক আর প্রতিষ্ঠাতা। সত্যেনবাবু বলে উঠলেন,— "আচ্ছা, হঠাৎ ইংরেজ যদি স্বাধীনতা দিয়েই দেয়, আর বলে যে তোমরা আমাদের হয়ে যুদ্ধে নামো, গান্ধী তখন করবেন কী?"

বসন্ত মজুমদার ছিলেন বসে এককোণে। ঘোঁৎ করে নিঃশ্বেস

ফেলে উনি গম্ভীর হয়ে বলে বসলেন যে গান্ধী সে-স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবেন।

"কিন্তু যুদ্ধ ?" জিজ্ঞেস করলেন সত্যেনবাবু। "যুদ্ধ তো চলতেই থাকবে। আর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমাদের দিতে হবে যোগ।"

"যুদ্ধ আমরা করুম্ না।" শেষ করলেন বসন্তদা।

উচ্চহাসির বান ডাকল।

চুপচাপ বসে আমি খাতায় আঁচড় কাটছিলাম। সহসা নেতা খাতা টেনে নিয়ে পড়তে লাগলেন। পড়তে লাগলেন উচ্চ-কণ্ঠে :

বড় কথা আর নয়, আর নয় কোন বাদ,
কাঙালের দল হাঁক্ ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

"আরে, এ যে রীতিমত কবিতা !" নেতা বলে উঠলেন।

সত্যেনবাবু বললেন—"প্রথম জীবনে ও কবি হবারই চেষ্টা করছিল যে।"

শুরু হল আমার ছাত্র-জীবনের কাহিনী। বক্তা সতুদা। আমরা দুজন তখন থাকতাম বেনেটোলার একটা মেসে। সতুদা ছিলেন ম্যানেজার। আমরা থাকতাম একই ঘরে। সতুদা হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীতে চাকুরী করতেন, আমি পড়তাম সিটি কলেজে। ঐ সময়েই গান্ধীর উদয়, কলেজ ছাড়বার ধুম, অসহযোগের গোড়াপত্তন।

সত্যেনবাবুর কাহিনী শেষ হতেই আমার খাতা ফিরিয়ে দিয়ে নেতা বললেন—"কথাটা ভাল, আর বলা হয়েছে আরও ভাল করে।"

অলক্ষ্যে গাড়ী থেমেছে জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে। সহসা ডাকাত পড়ল গাড়ীতে। জনতার একটা প্রবল তরঙ্গ ছিনিয়ে নিয়ে গেল নেতা আর সম্মেলনের সভাপতি শরৎচন্দ্রকে। আমরা চললাম পিছু পিছু।

প্রকাশ্য সম্মেলনে মূল চরমপত্রের প্রস্তাব উত্থাপিত করবার ভার পড়েছিল আমার ওপর। নেতা করলেন সমর্থন।

বক্তৃতা ফুরিয়ে গেছে। কণ্ঠ চিরে বেরোচ্ছে বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ। পাবক-শুদ্ধ জাতি দীক্ষা নেবে মুক্তিব্রতে। মানুষ সুভাষ পেছনে, দূরে

সরে গেছে। সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে এক প্রদীপ্ত ব্যক্তি। দ্বিধা নেই, শঙ্কা নেই, নেই সংশয়। স্থির অবিচল প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে প্রত্যয়। কে সঙ্গে থাকবে, কেউ থাকবে কিনা, সব হিসেব-নিকেশ তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে সাগ্নিক ঋত্বিক।

কলকাতায় পৌঁছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নেতা বললেন—"সভাপতি-নির্বাচনের জয়ে আজকের দিনে উল্লাস করবার কিছু নেই। বরং আজকের দিনের সবচেয়ে বড় কাজ হবে আত্মানুসন্ধান। আসন্ন ভবিষ্যতের জন্যে আমরা কতটা তৈরী হয়েছি, করতে হবে আজ তারই হিসেব-নিকেশ। নির্বাচন-কালের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা না ভেবে আমরা ভাবব আগামীকালের কথা। বিশেষ করে, যারা নির্বাচনে আমাকে সমর্থন করেছে তাদের তা ভাবতেই হবে।

"এবারকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখে আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরা যদি একথা ভাবতে চায় যে, কংগ্রেসের ভেতর আত্মকলহ দেখা দিয়েছে, আমি তা হলে স্পষ্ট করেই বলব, আমাদের ঐক্য বরাবরের ন্যায়ই অটুট। কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে মতান্তর থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন তারা সংগ্রাম করে, তখন তারা হয়ে ওঠে একটা অবিচ্ছিন্ন দেহ।"

কিন্তু ক্ষমাহীন পঙ্কিল ও কূট রাজনীতির কাছে এ-ঔদার্যের কোন মূল্যই সেদিন ছিল না। হোক না সে ঔদার্য সহজাত, সাবলীল আর একান্ত আন্তরিক। ভবি ওতে ভুলল না। গান্ধীজি এক চরম বিবৃতি প্রচার করলেন—"...আমি অবশ্যই আজ এ-কথা স্বীকার করব যে, গোড়া থেকেই ওঁর (বলা বাহুল্য সুভাষের) পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমার দৃঢ় অভিমত ছিল। এর কারণ আজ আর আমি বলতে চাইনে। আমিই ডাঃ পট্টভিকে নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াতে দিইনি, এবং এই কারণেই আমি বলতে বাধ্য যে, এ-পরাজয় পট্টভির

নয়, এ-পরাজয় আমার। নির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতি বাদ দিলে আমার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আজ স্পষ্ট হল যে, আমার আদর্শ ও নীতি অধিকাংশ কংগ্রেস প্রতিনিধি পছন্দ করে না। পরাজয়ে তাই আমি খুশিই হয়েছি।

"সংখ্যাগরিষ্ঠরা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করুক, পরাভূত দলের এই হবে কামনা। যদি তারা কংগ্রেসের বর্তমান গতির সঙ্গে সমতা ও সঙ্গতি রক্ষা করতে না পারে, কংগ্রেস পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে হবে অবশ্য কর্তব্য।...সহযোগিতা অসম্ভব হলে সঙ্গ পরিহার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আজ কংগ্রেস সভ্যদের এ-কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, খাস কংগ্রেসের বাইরে যে-সব কংগ্রেস ভক্ত রয়েছে, তারাই কংগ্রেসের খাঁটি প্রতিনিধি। কাজেই কংগ্রেসের ভেতরে থাকতে যারা আজ অস্বস্তি বোধ করছে, তাদের কর্তব্য হবে কংগ্রেস ছেড়ে চলে আসা। কোনও প্রকার অসৎবুদ্ধিবশতঃ নয়—দেশের বৃহত্তর ও কার্যকরী সেবা করবার প্রবৃত্তি নিয়ে তাদের আসতে হবে।"

নির্ভেজাল, সংলগ্ন আর সম্ভবত ইতিহাসের পারম্পর্যময় কালোচিত ঘোষণা। এ গান্ধী অনাবৃত; সাধুত্ব ও আধ্যাত্মিকতার মুখোস খুলে দেখা দিলেন ঘোষণার ছত্রে ছত্রে। ক্ষমা নেই, সাধুত্বের অহঙ্কার নেই, নেই নীতিকথা আর উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব, নেই কুয়াশা, নেই রহস্যের ঝাপসা পর্দা। একেবারে নিরঙ্কুশ, স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। নিজের মতবাদ আর দলীয় স্বার্থের কাছে কংগ্রেস—হোক না সে-কংগ্রেস জাতীয় স্বার্থ, আশা ও আদর্শের প্রতীক—অতি তুচ্ছ। জনমত, ডেমোক্র্যাস ততক্ষণ ভাল এবং মান্যও যতক্ষণ নিজের পক্ষে থাকে। তা নইলে, ওদের কথা শুনতে আর ওদের বিশেষ মূল্য স্বীকার করতে গেলে ইতিহাস-রচনার পথে বাধা ও বিঘ্ন দেখা দেবেই।

ইংরেজের শাসন শয়তানের শাসন বলে একদিন মহাত্মা গান্ধী অসহ-যোগ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। সেই গান্ধী দ্বিতীয়বার অসহ-যোগিতার সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রচার করে নির্দেশ দিলেন তাঁর অনুগত

গোষ্ঠীকে আর কংগ্রেসসেবীদের রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অসহ-যোগ করতে। কেননা গান্ধী-মতে "সুভাষ বোস আর যাই হোক্ দেশের শত্রু নয়।"

বিশ্বের ক্ষমতা-দখলের লড়াই আর সংশ্লিষ্ট ইতিহাস এতদিন ছিল নোংরা, মলিন আর জঘন্য। গান্ধীর স্পর্শে সেদিন তার রূপান্তর ঘটল। সে হল পবিত্র, হল সাত্ত্বিক, হল সুন্দর।

নেতা চললেন ওয়ার্ধা। সমষ্টির কল্যাণ-কামনা অন্তরে জাগে বলেই ব্যষ্টির দুঃখবরণের ভেতরে থাকে সার্থকতার অপার আনন্দ। জাতির কল্যাণে, দেশের মঙ্গলে প্রাণযজ্ঞের স্থণ্ডিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শত শত সুভাষ বোসের ব্যক্তিকে। দিতে হবে মুঠো মুঠো হৃৎপিণ্ডের সমিধ। অঞ্জলি পূর্ণ করে বুকের রক্তে দিতে হবে আহুতি। প্রাণযজ্ঞের হোমানল উঠবে জ্বলে। সুভাষ বোস নয়, সুভাষ বোসেরা। ওয়ার্ধা যেতে তাই দ্বিধা এল না।

দেখা হল গান্ধীর সঙ্গে। দীর্ঘ আলোচনাও হল। ফিরে এলেন নেতা কলকাতায়। ফিরে এলেন হৃষ্ট হয়ে। গান্ধী ওঁকে সমাদর করেছেন বলে শুধু নয়, গান্ধী আর তাঁর গোষ্ঠী অসহযোগিতার মনোভাব পরিত্যাগ করবেন, এ আশ্বাসও নেতা পেয়েছেন বলে।(১)

কিন্তু নেতার ভুল ভাঙতে বেশি সময় লাগল না। ওয়ার্কিং কমিটির ১২ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করে বসলেন—গান্ধী-গোষ্ঠীর প্রধান সকলেই—প্যাটেল, আজাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সরোজনী নাইডু, ভুলাভাই, পট্টভি, হরেকৃষ্ণ মহতাব, কৃপালনী, আব্দুল গফ্ফুর, জয়রামদাস দৌলৎরাম এবং যমুনালাল বাজাজ।

জহরলাল এঁদের যুক্ত-বিবৃতি স্বাক্ষর করেননি, পৃথক বিবৃতি প্রচার করলেন সংবাদপত্রে। যে-কথা এঁরা বলতে বাকি রেখেছিলেন, জহরলাল সেই-সব ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে আসামী সাজালেন

(১) ওয়র্ধা থেকে ফিরে এই মর্মে এক বিবৃতি দেন নেতা

ভারতীয় কংগ্রেসের নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়ককে। কিন্তু পদত্যাগ করতে বিরত থাকলেন। জহরলালের বৈশিষ্ট্য এইখানে। দলে থেকেও নিরপেক্ষতার ভূমিকার অভিনয়ে চিরদিনই তাঁর জোড়া নেই।

৮ই অক্টোবর সর্দার প্যাটেল জহরলালকে লিখলেন,—"প্রিয় জহর, আমাদের যুক্ত বিবৃতিতে সই দেবার জন্যে অথবা পৃথক বিবৃতি প্রচার করতে অনুরোধ করে যে-চিঠি তোমাকে লিখেছিলাম, তার উত্তর বরদোলীতে পেয়েছি। বাপুই এভাবে তোমাকে লিখতে বলেছিলেন। তোমার চিঠি তাঁকে দেখিয়েছি। এ-সম্বন্ধে আমার মনোভাব তোমাকে জানাতে তিনিই বলেছিলেন। তোমার চিঠি তাঁর মনঃপুত হয়নি। তবে এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি তিনি পছন্দ করেন না। যুক্তবিবৃতি তাঁর আদেশেই প্রচারিত হয়েছে।

"আমরা পরাজিত হয়েছি এর জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত নই, বরং খুশি। একমতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটি ছাড়া কাজ ভাল ভাবে চলতে পারে না। আর ওটা করবার একটা সুযোগও আমি খুঁজছিলাম।…তোমার মনোভাব আমার জানা নেই। কিন্তু এ আশা আমি নিশ্চয়ই করতে পারি যে, আমরা যা করতে যাচ্ছি, তার জন্যে আমাদের দুষবে না।…

তোমারই অকপট বল্লভভাই" (১)

গান্ধী-গোষ্ঠী ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেই ক্ষান্ত হল না, পার্লিয়ামেন্টারী বোর্ড থেকেও তারা সরে দাঁড়াল। সেক্রেটারী কৃপালনী পূর্বে পদত্যাগ করেছিলেন। ফলে সব বিভাগের কাজ চেপে বসল একা নেতার স্কন্ধে। দেশ, জাতি, স্বাধীনতা, কংগ্রেস সব পেছনে পড়ে রইল। বড় হয়ে দেখা দিল দল আর দলীয় স্বার্থ।

সবরমতীর সাধু পেছন থেকে আর সম্মুখে দেখা দিলেন না।

(১) বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, ৩১২ পৃঃ।

দলের মাধ্যমে জানা গেল তাঁর অভিমত আর কর্ম-সূচী। কখনও বল্লভভাই, কখনও রাজেন্দ্রবাবুর মুখে।

১৯৩৬এর ভূমিকা সাঙ্গ হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে ওর প্রয়োজনীয়তা। জহরলাল গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছেন চিরতরে। নাম লিখিয়েছেন পাণ্ডার খাতায়। তাই সেদিনের শান্তি প্রতিষ্ঠাতা গান্ধীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এই গান্ধীই ১৯৩৬এ সেদিনকার কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল আর গান্ধী-গোষ্ঠীর মনান্তর মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনও গান্ধী-গোষ্ঠীর মাতব্বরেরা পদত্যাগ করেছিল গান্ধীরই ইঙ্গিতে। আবার সন্ধিও স্থাপিত হয়েছিল তাঁরই মধ্যস্থতায়। সেদিন ওরা পদত্যাগ করেছিল জহরলালকে তাদের মতে ও মতবাদে ভিড়িয়ে নিতে। স্বাতন্ত্র্যবাদী জহরলালের স্বাতন্ত্র্যের অহঙ্কার চূর্ণ করে দিতে। তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এবারকার সমস্যা কঠিন। সুভাষচন্দ্রকে প্রথম-বার সভাপতি করে ওরা সে-ঝুঁকি নিয়েছিল। চেষ্টার ত্রুটী হয়নি। মুখোমুখী মতান্তর দেখিয়ে নেতা কোনদিন ওদের ফাঁদে পা দেন নি। ওঁকে চেপে ধরবার সুযোগ ওরা তাই পায় নি। ওরা বুঝে নিয়েছে জহরলাল আর সুভাষচন্দ্রের পার্থক্য। একজন মুখে স্বাতন্ত্র্যের বুলি কপচায় কিন্তু মৃদুতম চাপেই ভেঙ্গে পড়ে। তার হৃদয় আর মস্তিষ্কের মধ্যে লাগে অহরহ দ্বন্দ্ব। মস্তিষ্ক হেরে যায়। জয়ী হয় হৃদয়। হৃদয়ের আহ্বানে গোটা জহরলাল লুটিয়ে পড়ে গান্ধীর পায়ে।

আর সুভাষ? না। হাজার খেল দেখিয়েও ওঁকে দিয়ে 'বাপু' বলানো যায়নি। আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কখনও নির্বিচারে নিজস্ব বিচার, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হারিয়ে গড্ডালিকার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেন নি। ভবিষ্যতেও-যে দেবেন তারও নিশ্চয়তা নেই। কোন্ ভরসায় ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে?

সেদিন আর এইদিন। ১৯৩৬ আর ১৯৩৯। এদের কর্মপ্রণালী অভিন্ন। চমৎকার মিল রয়েছে। রয়েছে সাদৃশ্য। চাপ দিয়ে বশ্যতা

স্বীকার করানো। অহিংস-চাপের ভারে সেদিনের জহরলাল প্রাণ বাঁচাতে গান্ধীর চক্রে ভিড়ে গেলেন। তাঁর 'ইন্‌ডিভিডুয়ালিজ্‌ম্' হারিয়ে গেল। গেল সোস্যালিজ্‌ম্ তলিয়ে। কম্যুনিজম রইল শিকেয় ঝোলানো।

কিন্তু সুভাষ? এ-এক বিচিত্র সমস্যা। তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলবার নেই। কিন্তু নেই সহ্য করবারও উপায়। তাই সোজাসুজি ওঁকে জালে ফেলাও শক্ত। নাছোড়বান্দা গান্ধী-গোষ্ঠী একমাত্র এই কারণেই নির্বাচনের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

জহরলাল পড়েছিলেন সত্যিই বিপাকে। তাই পাশ কাটিয়ে ওঁকে চলতে হয়েছিল। প্রকাশ্যে ওঁর আচরণে গান্ধী-গোষ্ঠীর অহিংস চাপ ও ধাক্কা ছিল না। কিন্তু ভেতরে ছিল শাণিত অস্ত্রের আঘাত। আর সে-অস্ত্র ছিল অসূয়া আর অনুচিকীর্ষার কালীতে লেপা।

চিরদিন দুনৌকোয় পা রেখে জহরলাল চমৎকার বাজীকরের খেল দেখিয়েছেন। এবারও তাই শুরু করেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সর্বোপরি তাঁর ঋজু ও অপ্রতিহত দেশ-প্রেম জহরলালের এই ধোকার জাল ছিঁড়ে প্রকাশ করে দিল এক ভিন্ন জহরলালকে। সে-জহরলাল অত্যন্ত চেনা, জানা আর দেখা। অত্যন্ত সাধারণ জহরলাল। যে-কোনও সাধারণ সংসারের মানুষ জহরলাল,—যাঁর স্বার্থবোধ আছে, আছে প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদ, আছে বৃহত্তর ভবিষ্যতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

গান্ধী। কিন্তু তারপর? গান্ধী-উত্তর ভারতবর্ষের নেতৃত্ব চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে জহরলালের। আর···হ্যাঁ, আরও ছিল।

১৯৩৯এ ইংরেজের ভবিষ্যৎ আর অজানা নয়। দুর্বিপাক আর দুঃসহ অবলুপ্তির ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে দুর্দান্ত বৃটিশ সিংহ। রণডঙ্কার উত্তাল হুঙ্কার ভারতের তটেও করছে মুহুর্মুহু আঘাত। সাম্রাজ্য কি টিকিয়ে রাখতে পারবে ও? হিটলার আর মুসোলিনীই শুধু ছিল। কিন্তু রাশিয়া? সেও-যে ভিড়ে পড়বে বলে মনে হচ্ছে ওদেরই দলে। সহস্র চেষ্টা করেও ষ্টালিনকে দলে ভেড়ানো গেল না। এই একটি মাত্র

ভরসা ছিল ইংরেজের বাঁচবার। সোভিয়েট-জার্মান চুক্তির আভাসে ইওরোপের রাজনীতি উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এইবার হিটলার নিশ্চিন্ত হবে। দুমুখী অভিযান তার মনঃপূত নয়।

এছাড়া জাপান। হিটলারের মস্ত বড় হাতিয়ার। হিটলার নয়, —ইংরেজ পড়েছে বেড়াজালে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনকে বিচার করতে হবে। আগামী কালের আশা, ইঙ্গিত আর সমস্ত কর্ম-পদ্ধতি স্থির করতে হবে এই পরিস্থিতি সম্মুখে রেখে।

বিপাকগ্রস্ত ইংরেজ শেষ চেষ্টা করতে চাইবে ভারতবর্ষের লোকবল ও অর্থবল নিয়ে বাঁচবার। সেই মোক্ষম সময়েও কি ইংরেজ এখানকার গদি আঁকড়েই পড়ে থাকবে? যদি থাকে, ইংরেজ মরবে। কিন্তু বাঁচবার চেষ্টায়, আত্মরক্ষার তাগিদে বিশ্বের সবাই কত-কিছুই-না করে আসছে। ইংরেজেরও যদি এ-শুভ বুদ্ধি জাগে,—প্রলুব্ধ লালসার লালায় জিভ সিক্ত হয়ে ওঠে। জহরলাল ভাবিত হয়ে ওঠেন। গত জীবনের ন্যায় গত-জীবনের সব আদর্শও মরে যায়। দাঁড়িয়ে থাকে আদর্শের ফসিল। কঙ্কাল।

জহরলাল সোস্যালিষ্ট, ১৯৩৬এ এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ। এরই ফলে গান্ধী-গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে অসহযোগ ঘোষণা করেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সবাই পদত্যাগ করেছিলেন। আর জহরলাল চেয়েছিলেন সভাপতির পদ পরিত্যাগ করতে। ১৯৩৬ এর ৫ই জুলাই মনান্তর মিটিয়ে দেওয়ায় গান্ধীজিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জহরলাল লিখেছিলেন,—..."আবারও আমি রাজেন্দ্রবাবুর চিঠিখানা পড়লাম। আরও পড়লাম আমার বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর অভিযোগ (indictment)। অভিযোগ সত্যিই কঠোর কিন্তু অনির্দিষ্ট। ...তাঁর কথার মূল বক্তব্য এই যে, কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য নাকি আমার কাজের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে...লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পূর্বে, এমন কি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময়েও আমার ধারণা ছিল যে, এ-বৎসর সবাই মিলে-মিশে চলা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে না। এখন বেশ স্পষ্টই

বোঝা গেল যে, আমার ধারণা কত ভ্রান্ত।...আসল কথা, আমাদের গোষ্ঠীর (our group) মধ্যে সবাইকে বাঁধবার মত অনুবর্তিতা নেই। গোষ্ঠীটা শুধু নামে। পরস্পরের মধ্যে রয়েছে নিরেট চাপা অসন্তোষ আর অন্যকে চেপে রাখবার মনোভাব। মনোবিজ্ঞানীদের প্রত্যেকেই জানে যে, এই থেকেই নানা ধরনের অবাঞ্ছিত জটিলতা দেখা দেয়। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে কথাটা সমভাবেই প্রযোজ্য।

"আমি যখন এবার বম্বে গেলাম অনেকেই আড় চোখে আমার দিকে চাইছিল। ওদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছিল এ-কথা জেনে যে, আমি এখনও বেঁচে আছি। ওখানকার সকলেরই ধারণা,— টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া ত লিখেই ফেলেছিল যে, একটা শান্তিপূর্ণ অবলুপ্তি (peaceful end) ঘনিয়ে আসছে আমার। বলা বাহুল্য ওরা রাজনৈতিক অবলুপ্তিই ধরে নিয়েছে। শ্মশান-সৎকার ছাড়া নাকি আর সবই করা হয়ে গেছে। আর ওরা তাই আমাকে জ্যান্ত দেখে এতখানি বিস্মিত হয়েছিল। এ কথা সবাই জানতো। শুধু আমারই ছিল অজানা।...

"আমার বইতে এবং অন্যত্রও আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমি স্পষ্ট করে বলেছি।...আমার মনোভাব সাময়িক নয়। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ওর পরিবর্তন হতে পারে। রূপান্তরিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। কিন্তু বর্তমানে ওটা আমার আছে এবং যতদিন থাকবে, ও-কথা আমি সবাইকে বলবোও। দেশের দারিদ্র্য আর বেকার সমস্যা নিয়ে নাকি আমি বড্ড বেশি মাতামাতি শুরু করেছি,—আমার বিরুদ্ধে এও আর একটি অভিযোগ। এবং ও-কথা বলায় নাকি আমার অবিজ্ঞতাই প্রকাশ হয়ে পড়েছে।...

"দিল্লী ও লক্ষ্ণৌএর কথা নিশ্চয়ই আপনি ভোলেননি। আমি খুব স্পষ্ট করেই এ-কথা বলেছিলাম যে, দেশের বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আমার অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতা আমাকে দিতে হবে।... বর্তমানে মত প্রকাশের কথা নয়, আমার রাজনৈতিক মতামত নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।...

"বিরোধ আমাদের আছে। অস্বীকার করে লাভ নেই।...এর ফলে আমাকে সরে দাঁড়াতে হবে এবং বিরোধহীন সমধর্মী ওয়ার্কিং কমিটি গড়ে উঠবে। এ-কথা আমি আর কাউকে আজও বলিনি। তবে আপনি জানবার পূর্বেই, আমি জানি, সন্ধানী ও দুষ্ট দৃষ্টি এ-কথা জেনেও ফেলবে। তা জানুক। ওরা জ্বলে পুড়ে মরবে"...(১)

এ-চিঠি আর সে-দিনের কথা জহরলাল ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন বেমালুম। নিঃশেষে। ভুলে না গেলে সুভাষ বোসকে আঘাত হানা যায় না। রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে ওঁর প্রাধান্য আর ওঁকে দূর করাও সম্ভবপর নয়। তা না করতে পারলে নিষ্কন্টকও হবার আর কোনও উপায় নেই। জহরলালের চরিত্রে উগ্রতা আর হৃদয়হীনতা দেখা দিল অনিবার্য কারণে।

"বয়োবৃদ্ধ নেতাদের চাইতে তোমরা অগ্রগামী, একথা কেমন করে তোমরা প্রমাণ করবে? তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বড়দের সমালোচনায় প্রমাণিত হবে না। অকারণে ওঁদের সমালোচনায় তোমাদের যোগ্যতাও প্রতিষ্ঠা পাবে না। দেশের ও জাতির জন্যে তাঁরা যা করেছেন, তার চাইতেও বৃহৎ ও মহৎ যদি কিছু করতে পার, তবেই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হবে। আজকের এই উল্লাসের মুহূর্তে এমন একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো না, যার ফলে কেউ আহত হয়। কেউ পায় বেদনা।"(২)

এই উদার ভাব-গম্ভীর বাণী জিঘাংসু রাজনীতির ক্ষমা-কৃপণ অন্তরে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করতে পারল না।

(১) বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স—১৮৮ পৃঃ।

(২) ১৯৩৯এর ৩১শে জানুয়ারী কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রদত্ত নেতার বক্তৃতার অংশ।

উত্থানশক্তিহীন সুভাষ চলেছেন ত্রিপুরীর জনাকীর্ণ পথে। হেঁটে নয়, রথেও নয়,—এ্যাম্বুলেন্সে। কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক সতর্ক করেছিলেন বার বার। নিষেধ করেছিলেন কঠোর হয়ে। নেতা শোনেননি। চিকিৎসক বললেন, জীবনান্ত হতে পারে।(১) নেতা সে কথা কান দিয়ে শুনলেন মাত্র। দুর্জয় প্রাণ-শক্তি যার পরিচালক, সে কি মানে বাইরের মানা ? মৃত্যুই তো জীবনের সব চাইতে বড় কথা নয়। জীবনের বিচিত্র, বিরাট ও ব্যাপক লীলার অংশ নিতে যেয়ে কে রেখেছে কবে মৃত্যুর সাবধানী সন্তর্পিত অভিযানের হিসেব নিকেশ? রাখে না। রাখতে নেইও। নেতাও রাখলেন না। অচল দেহটাকে টেনে নিয়ে চললেন ত্রিপুরী। সঙ্গে গেলেন মা-জননী, ইলা, দাদা ডাঃ সুনীল বোস।

ত্রিপুরী। আরণ্যকা ত্রিপুরী। রম্য বনভূমি চারিদিকে ঘেরা। বনমর্মর কথা কয় সঙ্গীতের সুরে। পাশে নর্মদা-কন্যা। ধীরা ক্ষীণা তন্বী। বয়ে যায় উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে দেহবল্লরীর কাচ-স্বচ্ছ আমন্ত্রণ জানিয়ে। দূরে নর্মদা। ওরই কোল জুড়ে মর্মর পর্বত। সানুদেশে জব্বলপুর। প্রাচীন ভারতের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস সজীব হয়ে ওঠে। প্রসেনজিৎ আর কোশলদেবী দেখা দেন মূর্তি নিয়ে। বিম্বিসার-অজাতশত্রু, প্রদ্যোৎ আর পুক্কুসাতি দেখা দেন আকাশের গায়ে। পটভূমি রচনা করে অবন্তী, গান্ধার, কান্যকুব্জ আর কুশীনগর।

রোগজর্জর রাষ্ট্রপতি চলে যান 'এ্যাম্বুলেন্স' এ। পেছনে চলে বাহান্নটি হস্তীবাহিত রথ। রথের ওপর রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি।

(১) ডাঃ নীলরতন সরকার সুভাষের চিকিৎসা করেছেন।

কাতার-বাঁধা জনতা চলে আশে পাশে পেছনে। ক্ষুব্ধ জনতা, বিষণ্ণ জনতা, ক্ষণস্থায়ী জনতা।

অর্ধ শতাব্দীরও বেশি কংগ্রেসের জীবনে শেষবারের মত একটি নিপীড়িত মুমুক্ষু দেশাত্মপ্রাণের অন্তঃস্থল নিংড়ে বেরিয়ে এল অগ্নিস্রাবী বাণী। স্তিমিত হয়ে আসে সংজ্ঞা। হাত কাঁপে। তবু লিখে চলেন নেতা : সময় হয়েছে এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।—The time has come for us to raise the issue of Swaraj and submit our national demand to the British Government in the form of ultimatum. আর তার জন্যে ইংরেজকে পাঠাতে হবে এক চরম পত্র।...এর চাইতে বড় সুযোগ আর কি জাতির ভাগ্যে দেখা দেবে? আন্তর্জাতিক এই চরম সঙ্কটের মধ্যে আমাদের শেষ অভিযান শুরু না করলে আর কবে আমরা করতে যাব? আমি অচঞ্চল কঠিন বাস্তবপন্থী। বর্তমান পরিস্থিতির সবটাই আমাদের অনুকূলে। এর পরিপূর্ণ সুযোগ আমাদের নিতে হবে। নিতে হবে আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে।...আমার গুরু দেশবন্ধুর আশীর্বাদে...আর মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হোক এই আমার আকুল কামনা।(১)

কিন্তু গান্ধী ত্রিপুরীতে আসেন নি। আসতে চান নি। পাছে আসতে হয়, এই জন্যেই তাঁকে রাজকোট সমস্যা সৃষ্টি করতে হয়েছিল। আর তার পেছনে ছিল তিনটি কারণ। প্রথম,—সদ্য সাংঘাতিক পরাজয়ের ক্ষত-ব্যথা গান্ধী তখনও ভুলতে পারেন নি; দ্বিতীয়,—ত্রিপুরীর সমারোহ খানিকটা ম্লান করে দেওয়া, বিশ্বের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তাঁর নিজের দিকে টেনে নেওয়া; আর তৃতীয়,—ত্রিপুরীতে তাঁর সম্মতিক্রমে হলেও সুভাষচন্দ্রকে হতমান করবার জন্যে যে-কার্যক্রম স্থিরীকৃত হয়েছিল, সামনাসামনি তা প্রত্যক্ষ কর-

(১) ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি-ভাষণ

বার মত সাহসের অভাব। চক্ষুলজ্জার যৎকিঞ্চিৎ অবশেষ হয়তো ছিল।

৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯। গান্ধী লিখছেন জহরলালকে ওয়ার্ধা থেকে : "আমার প্রিয় জহরলাল, এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনে আমি দূরেই থাকতে চাই। নির্বাচনের পর এবং নির্বাচনের ধরন দেখে আমি এই কথাই মনে করি যে, দূর থেকেই আমি দেশের সেবায় আরও বেশি করে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো।...আশা করি এ বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। অধিবেশনে যোগ দিতে তুমি কিন্তু আমায় বাধ্য করো না।......

ভালোবাসা—বাপু (১)

বলা বাহুল্য রাজকোট সমস্যা ঘোরাল হয়ে ওঠে এর অনেক পরে। সত্যাশ্রয়ী গান্ধীর সব পরিকল্পনা আগে থেকেই গড়ে ওঠে মনের কন্দরে। পরে তা রূপ নেয়। সে-রূপ অনিবার্য, কঠোর ও বস্তুতান্ত্রিক।

নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে গোটা গান্ধী-গোষ্ঠীর মন। সুভাষ রোগাক্রান্ত? শয্যাশায়ী? মরণাপন্ন? বাজে কথা। ওটা জ্বর নয়, কারচুপি। ভাণ। লোক-মত নিজের দিকে টেনে নেবার ছলা-কলা। মানুষের সহানুভূতি আদায়ের দুষ্ট ফন্দী। হাজার কথা মুখে মুখে প্রচারিত হল ত্রিপুরীর সর্বত্র। অভ্যর্থনা সমিতির ডাক্তারও প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চাননি। পরে করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হল তাঁরই পরামর্শে। বোর্ডের সভ্য হলেন, সেন্ট্রাল প্রভিন্স্ ও বেরারের সিভিল হাসপাতালের ইন্স্পেক্টার জেনারেল, ডাইরেক্টার অব্ পাবলিক্ হেলথ, আর জব্বলপুরের সিভিল সার্জেন। এঁরা যুক্ত বিবৃতি দিলেন রোগী সম্পর্কে। রোগ সত্যি এবং সাংঘাতিকও। স্তব্ধ বিস্ময়ে গোটা ত্রিপুরী আর তার বাইরের ভারতবর্ষ

(১) বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটার্স্, ৩০৭ পৃঃ।

শুনল এই মর্মান্তিক সত্য কাহিনী। আর বিরুদ্ধ পক্ষের সত্যের প্রতি দুর্বার আগ্রহ জেনে পরম নিশ্চিন্ত হল।(১)

গান্ধী-গোষ্ঠী সবই ভুলে যেত। ক্ষমা করাও হয়তো তাদের পক্ষে অসম্ভব হত না,—যদি সুভাষ বোস সেদিন নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করতেন। ভবিষ্যতে এদের, গান্ধী-গোষ্ঠীর ইঙ্গিতে পরিচালিত হবে তাঁর বাকি জীবন,—এমন একটা সর্ত মেনে নিলে সেদিনের যাত্রা-পথ সুগম আর সহজও হতে পারত, একথা নেতা জানতেন। সবই হতে পারত, তিনিও হতে পারতেন অনেক-কিছু। গান্ধী থেকে জহরলাল,—কেউ তাকে অস্বীকার করতেন না। গদি পাকা হত। হত ভবিষ্যতের প্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

ত্রিপুরীর কিছুদিন বাদেই, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯ জহরলাল লিখছেন গান্ধীজিকে : "...বর্তমান সমস্যা আলোচনার জন্যে সুভাষ আমাকে ডেকেছেন।...আমার 'না' বলবার উপায় নেই। কিন্তু তাঁকে কী বলব তাও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। বর্তমানে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-দের নাম স্থির করবার সম্পূর্ণ ভার আপনার ওপর ছেড়ে দেবার পরামর্শ ছাড়া আমি তো আর কোনও পরামর্শ তাঁকে দিতে পারছিনে। তিনিও দু-একজনের নাম না-বলতে পারেন তা নয়, কিন্তু একথা তাঁকে স্পষ্ট করে বলতেই হবে, সে-নাম আপনি ইচ্ছে করলে রাখতে পারেন আবার অগ্রাহ্যও করতে পারেন। ভবিষ্যৎ-কর্মপন্থার কথাও আছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাব এ-ব্যাপারে স্থির নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে। অতীতের পারম্পর্য আর কর্মসূচী মানতে হবে, তার বাইরে যাওয়া চলবে না। সুভাষ যদি এতে রাজী হন, তাহলে (মীমাংসার) দায়িত্ব আপনাকে নিতেই হবে।"(২)

প্রস্তাব স্পষ্ট। এবং নির্বিকল্প। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

---

(১) দি রেবেল প্রেসিডেন্ট—পৃঃ ১২৯।

(২) বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটার্স ৩৬৯ পৃঃ

কিন্তু বন্ধুপ্রবর জহরলাল এবং আর-আর বিজ্ঞজনের অনুরোধ ও সদুপদেশ উপেক্ষা করে এই অপরিণামদর্শী মানুষটি সেইক্ষণে বরণ করে নিলেন এমন এক ক্ষুরধার পথ, যার রূপ দেখে অনেকেই সেদিন শুধু থমকেই দাঁড়াল না,—ভয়ও পেল। ভয় পেল এই মানুষটির সঙ্গে থাকতে। ভয় পেল সাথী হতে।

সেদিন ঐ সাবধানী হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলতে চেয়েছিল যে, এই মানুষটির আর যাই থাক, বাস্তব বুদ্ধি খুব বেশি নেই। যেটুকু আছে, তাও যথেষ্ট বিচারসহ নয়। যাদের প্রতিশ্রুতি সে-দিন ছিল মুখর ও প্রগল্ভ, সেই সোস্যালিষ্ট পার্টি শেষ মুহূর্তে ত্রিপুরীর রণক্ষেত্রে নিজেদের সৈন্যবল নিয়ে নির্বিকার নিরপেক্ষতার যে-কৃতঘ্ন ভূমিকায় দেখা দিয়েছিল, দলীয় রাজনীতির মসী-মলিন ইতিহাসে তারও বুঝি তুলনা নেই।(১)

পন্থ-প্রস্তাবে প্রতিহিংসার রূপ ছিল, তীব্র আঘাতের নির্মমতা ছিল, আইনসম্মতও ছিল না, কিন্তু এসব সত্ত্বেও নেতার মনে তা রেখাপাত করতে পারেনি। চিরদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই রূপ নিয়েই দেখা দেয়। প্রতিপক্ষকে যদি আঘাত করতেই হয়, সে আঘাত মর্মান্তিক হওয়াই তো স্বাভাবিক। যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তরবারি দিয়েই করতে হবে,—অস্ত্র চিকিৎসার ছুরি দিয়ে নয়। যার উদ্দেশ্য হবে উৎখাত,—নিরাময়তা নয়। সোজা কথা। আর পদ্ধতিও একান্ত স্পষ্ট।

কিন্তু নেতার চোখে ভেসে উঠল ভারতীয় রাজনীতির অন্য আর একটা দিক। যারা নিজেদের পরিচয় দিতে উৎসুক চরমপন্থী বলে, বিপ্লবী বলে,—তারা এত সংশয়ী কেন? দুর্বল কেন? কেন এত স্বল্পে তুষ্ট?

(১) "ত্রিপুরী কংগ্রেসে যদি সোস্যালিষ্ট পার্টি (c.s.p.) নিরপেক্ষ হয়ে না থাকত, সব বাধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রকাশ্য অধিবেশনে আমাদের সংখ্যাধিক্য থাকত।"

—১৯৩৯এর ২৫শে মার্চ, মহাত্মাজির কাছে সুভাষের জিয়ালগোরা থেকে লেখা চিঠির অংশ।

জহরলালের প্রতিচ্ছায়া দেখলেন নেতা তাঁর চারদিকের বন্ধুর চোখে, মুখে আর আচরণে।

ত্রিপুরীর রণাঙ্গন পরিত্যাগ করলেন নেতা নিঃশব্দে।(১) রোগ শয্যায় শুয়ে আছেন কিন্তু দৃষ্টি চলে গেছে ইতিহাসের এক রহস্য-ঘন অস্পষ্ট ইঙ্গিতের প্রতি। মূর্ত হয়ে ওঠেনি অবয়ব তার,—কয়েকটি রেখা মাত্র, কিন্তু মনে হল তাকেই অব্যর্থ বলে।

কংগ্রেস, গান্ধী-গোষ্ঠী, রাজনীতি, দলাদলী, ক্ষমতার লড়াইএর বাইরে রয়েছে এক বিশাল ভারতবর্ষ। সনাতন ভারতবর্ষ। হাজার বছর পরাধীন রেখেও যাকে তার আদর্শ, ধর্ম, কৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করা যায় নি,—সেই ভারতবর্ষ। যে-ভারতবর্ষ নিরক্ষর কিন্তু অশিক্ষিত নয়। যে-ভারত পরবশ্যতা স্বীকার করে কিন্তু অস্বীকার করে পরধর্ম। যে-ভারত জয় করেনি কোনও দেশ কিন্তু জয় করেছে সহস্র দেশের আত্মা। সেই দেশ, সেই ভারতবর্ষ এগিয়ে আসে নেতার শয্যার পার্শ্বে। গান্ধী তাকে ত্যাগ করুন। ক্ষত বিক্ষত করতে থাকুক গান্ধীর বড় আর নাম-করা ভক্তের দল। বন্ধু ও বান্ধবের মিছিল, যারা এসেছিল রাজনীতির পঙ্কিল পথ-যাত্রায়, সবাই দূরে সরে যাক। ছুটে আসে উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল আর মৌন বেদনার অশ্রু নিয়ে গোটা ভারতবর্ষ।

(১) অধিবেশন-শেষে সভাপতির বিদায়-যাত্রা চিরদিনই বেশ ঘটা করে সম্পন্ন হয়ে আসছে। আগমন-অভ্যর্থনার তুলনায় জাঁকজমক কম হলেও বিদায়-যাত্রাও কম চিত্তাকর্ষক নয়। কিন্তু ত্রিপুরীতে এর বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা গেল। সভাপতি বিদায় নিলেন একটা বিষাদ-গম্ভীর পরিবেশের ভেতর দিয়ে। বিদায়ের সময় তাঁর কাছে ছিলেন তাঁর পরিবারের কয়েকজন লোক, দুজন ডাক্তার, আর দুজন মাত্র ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য।

পট্টভি প্রণীত কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃঃ।

আসে বার্তা নিয়ে, পত্র নিয়ে, প্রসাদী ফুল নিয়ে, পুজোর চরণামৃত নিয়ে। পাঠায় অজানা পল্লীর বধু তুলসী-মৃত্তিকা। পাঠায় সাধু আর সন্ন্যাসী মন্ত্রপুত কবচ ও মাদুলী। পাঠায় তপস্যারত যোগী তার সাধনার ইষ্ট মন্ত্র ভূর্জপত্রে লিখে। কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয়ের দুর্ভেদ্য চূড়া,—কে জানত বিগলিত জাহ্নবীর মত আসমুদ্র হিমাচলের এই স্নেহ ও মমতার অফুরন্ত ধারার কথা! ১) সমগ্র অন্তর কাণায় কাণায় ভরে ওঠে। উপচে পড়ে। ভিজে যায়। জীবনের অফুরন্ত চলার পথে ক্ষয় ক্ষতির পরিবর্তে যে বৃহৎ মানবিকতা তার সহস্র লোচন আর বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরল একান্ত স্নেহে ও নিবিড় প্রেমে, অস্বীকার তাকে করবেন তিনি কেমন করে? সমগ্র অন্তর ফুলে দুলে কেঁদে ওঠে। মানুষের ওপর জেগেছিল অবিশ্বাস। অভিমান আর হতাদরের গ্লানি মনের কন্দরে এনে দিয়েছিল নিরাশার জমাট কালী। সব মুছে গেল। ধুয়ে গেল। দূর হয়ে গেল। রোগী উঠে বসেন বিছানায়। মুখে ফুটে ওঠে হাসির ক্ষীণ রেখা। চোখে দেখা দেয় স্বপ্ন। রোগ মুক্ত হয়ে নেতা ফিরে আসেন কলকাতায়।

কিন্তু এর আগেই জামাডোবায় গিয়েছিলেন জহরলাল। আলোচনা হয়েছিল দীর্ঘ আর বিভিন্ন বিষয়ে। জহরলাল ফিরে এসে সহসা মারমুখী হয়ে উঠলেন। বিবৃতি ঝাড়লেন গোটা কয়েক। সভা করলেন দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আলমোরা, মুসৌরী, দেরাদুন, আর এলাহাবাদে। এবং ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখলেন 'ন্যাশনাল হেরাল্ডে।' নেতাকে লিখলেন এক দীর্ঘ পত্র।(২) নানাবিধ অভিযোগ উত্থাপিত হল সেই পত্রে। নেতার কার্যের সমালোচনায় জহরলাল মুখর হয়ে উঠলেন।

(১) মডার্ণ রিভ্যুয়েতে প্রকাশিত সুভাষচন্দ্রের "মাই স্ট্রেন্‌জ ইল্‌নেস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স—৩০৭ পৃঃ।

২৮শে মার্চ, ১৯৩৯। জহরলালের চিঠি আর তাঁর আচরণের প্রত্যুত্তরে নেতা লিখলেন এক চিঠি। অতি দীর্ঘ এ-চিঠি। ফুলস্কাপ কাগজ টাইপ করা। সাতাশ পৃষ্ঠা। নেতার জীবনের দীর্ঘতম চিঠি। এই পত্রে নেতা তাঁর নিজের মতামতের আলোচনা করেছেন। বিচার করেছেন জহরলালকে দুর্বার মানদণ্ডে। গান্ধীজি ও গান্ধী-গোষ্ঠীও বাদ পড়েনি। নেতা লিখছেন,—

জিয়ালগোরা, মানভূম, বিহার
২৮শে মার্চ, ১৯৩৯

আমার প্রিয় জহর,

কিছুদিন হলো আমার সম্বন্ধে তুমি প্রচণ্ড বিরূপভাব পোষণ করে আসছো, এটা আমি লক্ষ্য করছি। আমি একথা বলছি এই কারণে যে, আমার বিরুদ্ধে সামান্যতম ত্রুটির গন্ধ যেখানেই পাও, অমনি তুমি তার সদ্‌ব্যবহার করতে ছাড়ো না। আমার সমর্থনে কিছু থাকলে সেটা তোমার চোখ এড়িয়ে যায়। আমার রাজনৈতিক বিরুদ্ধ পক্ষ আমার সম্পর্কে যা-কিছু বলে তাতেই তোমার সমর্থন ও সায় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকলেও তুমি বলতে চাও না।

আমার প্রতি তোমার এই বিরূপ মনোভাবের কারণ আমার নিকট রহস্যাবৃত। ১৯৩৭এ অন্তরীণ বন্দী-দশা থেকে মুক্তি পাবার পর, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি কর্মক্ষেত্রে, বরাবরই আমি সাধ্যমত শ্রদ্ধা ও সৌজন্য তোমাকে দেখিয়ে আসছি। রাজনৈতিক জীবনে তোমাকে আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং নেতার সম্মান দিয়েছি। এবং অনেক সময় তোমার উপদেশও চেয়ে নিয়েছি।...

বিগত সভাপতি-নির্বাচনের পর থেকে জঘন্য বিতণ্ডা চলছে। তার কতক আমার স্বপক্ষে, কতক বিপক্ষে। তোমার বলা-কথা ও দেয়া-বিবৃতির সবগুলো আমার বিপক্ষেই গেছে। দিল্লীর এক সভায় বক্তৃতা কালে তুমি বলেছো যে, আমার স্বপক্ষে আমি যা করেছি কিংবা

অপরেও যা-কিছু করেছে, তা তুমি পছন্দ করনি। তোমার মনের যথার্থ ভাব আমার জানবার উপায় নেই। কিন্তু তোমার ভুলে যাবার ক্ষমতা সত্যিই চমৎকার। ডাঃ পট্টভির নির্বাচনী-আবেদনের পর যে আমার আবেদন কাগজে বেরিয়েছে, এ-কথাটা তুমি ভুলে গেলে কেমন করে? তুমি তদ্বিরের কথা তুলেছো। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একথাটা ভুলে গেছ কিনা জানিনে যে, ডাঃ পট্টভির পক্ষে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা কোমর বেঁধে লেগোছলেন। তাছাড়াও ছিল রকমারি সঙ্ঘ ও সমিতির সহায়তা। গান্ধী সেবা-সঙ্ঘ, চরখা-সঙ্ঘ, এ, আই, ভি, আই, এ প্রভৃতির মিলিত শক্তি একযোগে কাজে লেগে গিয়েছিল। সর্বোপরি বিরাট পুরুষদের,—তার মধ্যে তুমিও আছো,—সমাবেশ হলো। মহাত্মা গান্ধী, তাঁর নাম ও বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি সঙ্গে করে বিপক্ষের দলে যোগ দিলেন। দেশের অধিকাংশ কংগ্রেস-কমিটির তো কথাই নেই। এই সমবেত যুযুৎসুদের বিরুদ্ধে কে ছিল? আমি। একা। একথা কি তুমি জানতে না যে, ডাঃ পট্টভির নামে কোন প্রচারই হয়নি? হয়েছিল গান্ধী ও গান্ধীবাদের পক্ষে? এটা কিন্তু শোনা কথা নয়। এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু এটাও হয়তো তোমার অজানাই যে, এত করা সত্ত্বেও এই সমবেত প্রচেষ্টা অনেকের মনে বিন্দুমাত্রও দাগ কাটতে পারেনি। এ-সব জানা সত্ত্বেও একটা প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তুমি আমাকে জনসাধারণের কাছে হেয় ও তুচ্ছ করবার চেষ্টা করেছো।

এরপর পদত্যাগের প্রশ্ন: বার জন ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য এক-যোগে পদত্যাগ করলেন। তাঁরা যে-পত্র আমাকে লিখেছিলেন, তা সত্যিই সরল এবং অকপট, আর ভদ্রও। তাঁদের বলবার কথাগুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্ট করে বলেছেন। আমার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে আমার সম্পর্কে একটি অপ্রিয় কথাও তাঁরা বলেননি। যদিও, আমি জানি, ইচ্ছে করলে তাঁরা বলতে পারতেন। কিন্তু তোমার বিবৃতি? সত্যিই তা বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই।

কঠোর ভাষা ব্যবহার আমি করবো না। শুধু বলবো যে, ও-ধরনের বিবৃতি তোমার কলম থেকে বার হওয়া শোভন হয়নি।···

যাঁদের নাম বেরিয়েছে পদত্যাগ পত্রে, তাঁদের মধ্যে তোমার নাম নেই। অথচ তোমার বিবৃতি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে যে, তুমিও পদত্যাগ করেছো। লোকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তোমার আচরণে। তোমার অবস্থা সত্যিই রহস্যময়। দুর্বোধ্য। সঙ্কটকালে কোন দিনই তুমি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পার না। ফলে লোকের নিকট তোমার প্রকৃত মনোভাব অজানাই থেকে যায়। দুনৌকোয় পা দেবার মত হয় তোমার অবস্থা। (to the public you appear as if you are riding two horses)···তোমার ধারণা তুমি খুব যুক্তিবাদী। এবং তোমার আচরণও সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু তোমার কথা ও কাজ এর উল্টোটাই প্রমাণ করে।

আলমোড়া থেকে প্রচারিত বিবৃতির উপসংহারে তুমি বলেছিলে যে, আমাদের কথা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে একমাত্র আদর্শ ও কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সত্যিই ভোলা উচিত। আরও উচিত সেটা যখন বিশেষ-কোন ব্যক্তির সম্পর্কে ওঠে। তাই না? সুভাষ বোস যখন দ্বিতীয়বার নির্বাচনে দাঁড়ায়, তখন ব্যক্তি-প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই নিন্দার্হ। তখন আদর্শের জয়গান গাইতেই হবে! সুভাষ বোস না হয়ে সেই ব্যক্তি যদি হন মৌলানা আজাদ, তাঁর সমর্থনে দীর্ঘ প্রশস্তি লিখতে তোমার আটকায় না কোথাও। সুভাষ বোসের সঙ্গে যখন সর্দার প্যাটেল এবং আর সকলের দ্বন্দ্ব লাগে তখন তোমার মতে সুভাষ বোসকেই তার ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি স্পষ্ট করে খুলে বলতে হবে আগে,—তাঁদের নয়···।

আমার ব্যক্তিগত কথা যখন তোমার কাছে আজ এতই বড় হয়ে উঠেছে, সেটার কথাই আমি প্রথমে বলবো। তোমার বক্তব্য এই যে, আমার সহকর্মীদের ওপর আমি অবিচার করেছি। বলা বাহুল্য এইসব সহকর্মীর মধ্যে তুমি নেই। কাজেই তুমি যা বলতে চাইছো, তা

তোমার নিজের পক্ষ সমর্থনে নয়, যাদের পক্ষে ওকালতির ভার তুমি নিয়েছো, তাদের হয়ে। মক্কেলের কথার চাইতে সব সময়েই উকিলের কথা জোরদার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সর্দার প্যাটেল, রাজেনবাবু এবং মৌলানা আজাদের সঙ্গে এই নিয়ে যখন আলোচনা করেছিলাম, তাঁরা কিন্তু তোমার মত নির্বাচন-বিবৃতির উল্লেখ করেন নি। তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন বরদলীর সভার কথা। কাজেই তোমার মক্কেলরা নির্বাচন-বিবৃতির ওপর ততটা গুরুত্ব দেননি, যতটা তাঁদের উকীলরূপী তুমি দিয়েছ।···নির্বাচন-বিবৃতির কথা অনেকেই ভুলে গিয়েছিল, তুমিই খুঁচিয়ে ওটাকে জাগিয়ে তুলেছো। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ বারোজন ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য একযোগে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে আমাকে হতমান করতে যতটা সমর্থ হয়েছিলেন, তুমি একা করেছো তার চাইতে অনেক বেশি।

অবশ্য তুমি আমাকে যে-ভাবে আঁকতে চাও সত্যিই যদি আমি অমনি পাষণ্ডই হয়ে থাকি, দেশবাসীর সম্মুখে আমার স্বরূপ উন্মুক্ত করে দেওয়া তোমার পক্ষে শুধু সঙ্গতই হবে না, হবে অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ : দেশের জাঁদরেল জাঁদরেল নেতা, তুমি এবং মহাত্মাজির বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও যে-পাষণ্ড কংগ্রেসের সভাপতির পদে পুনর্নির্বাচিত হয়, তার কিছু-একটা সার্থকতা আছেই। নিজের পক্ষ সমর্থন করবার উপযোগী তার কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না, বিপক্ষে ছিল অজস্র প্রতিকূলতা, তা সত্ত্বেও এতো লোকের আশীর্বাদ ও সমর্থন সে অমনি পায়নি। নিশ্চয়ই দেশের জন্যে এমন কিছু সে করেছে যার ফলে এটা সম্ভবপর হয়েছে···।

বাম ও দক্ষিণপন্থী বলতে আমার কী ধারণা তোমার বিবৃতি তা আমাকে পরিস্ফুট করতে বলেছে। এবং উপদেশও দিয়েছে। তোমার কাছে এ-ধরনের কথা বাস্তবিকই আমি আশা করিনি। হরিপুর কংগ্রেসের রিপোর্টের কথা তুমি কি ভুলে গেছ? আচার্য কৃপালনী

আর তুমিই-না সে-রিপোর্ট দাখিল করেছিলে ? সেই রিপোর্টেই না তোমরা লিখেছিলে যে, দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের ওপর জুলুম করে, তাদের চেপে রাখে। প্রয়োজনের বেলা, তুমি যা লিখতে বা বলতে পার, অন্যের বেলায় তাই হয়ে ওঠে দুষ্য,—তাই না ?

আমার বিরুদ্ধে তোমার আর একটা অভিযোগ, আমার নাকি দেশীয় বা বহির্দেশীয় ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নেই। ভুল হোক, আর শুদ্ধ হোক নীতি আমার একটা নিশ্চয়ই আছে। ত্রিপুরীর সংক্ষিপ্ত ভাষণে অকুণ্ঠ ভাষায় তা আমি বলেওছি। তার ভেতর দ্ব্যর্থতা ছিল না। বৈদেশিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের পক্ষে একটিমাত্র করণীয় সমস্যাই রয়েছে বর্তমানে,—বৃটিশের চোখের সম্মুখে স্বরাজের দাবী উঁচু আর স্পষ্ট করে তুলে ধরা। আমি বিনীত ভাবে বলতে চাই যে, আমার বক্তব্য এই একটিমাত্র। দেশের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে বর্তমানে দেশীয় রাজ্যবাসীর আন্দোলন পরিচালনার উপযোগী একটা ব্যাপক পরিকল্পনা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ত্রিপুরীর পূর্বে এবং শান্তিনিকতনে ও আনন্দভবনে আলোচনা প্রসঙ্গে তোমাকে আমার কথা খুলেই জানিয়েছি। এখন যা লিখলাম, তা থেকে আশা করি আমার নীতি সম্পর্কে তোমার ধারণা অন্তত কিছুটা নিশ্চয়ই হবে। এইবার তোমাকে প্রশ্ন করবো। তোমার নীতিটা আমাকে জানাবে কি ? তোমার সাম্প্রতিক এক পত্রে ত্রিপুরী কংগ্রেসের জাতীয় দাবী সম্পর্কীয় প্রস্তাবের উল্লেখ তুমি করেছো। তোমার ধারণা, একটা বলিষ্ঠ প্রস্তাব তোমরা গ্রহণ করেছো। মোটেই তা নয়। ঐপ্রস্তাবটা একটা অদ্ভুত আর অর্থহীন প্রস্তাব। ওর সবটাই মুখরোচক অসারত্বে ভরা। আমাকে আকর্ষণ করতে পারে, এমনই কিছুই আমি ওর ভেতর খুঁজে পাইনি। ও-প্রস্তাব জাতিকে তার চলার পথে কোন ইঙ্গিতই দেবে না।

যদি সত্যই স্বাধীনতার জন্যে বৃটিশ-গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামই আমাদের কাম্য হয়, এবং যদি সত্যই মনে করি যে, বর্তমান সময়ে

জাতির সম্মুখে একটা সুযোগ দেখা দিয়েছে,—আমরা স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাবে ও-কথাটা বলতে পারছিনে কেন? আর সে-পথে চলতেই-বা আটকাচ্ছে কোথায়? অনেকবার তুমি আমায় বলেছ যে, চরমপত্র দেবার পক্ষপাতী তুমি নও। কিন্তু কেন নও সে সম্পর্কে তুমি নির্বাক। গত বিশ বছর মহাত্মা গান্ধী বার বার ইংরেজকে চরমপত্র দিয়েছেন। এবং একমাত্র চরমপত্রের ফলেই ইংরেজের কাছ থেকে যা-কিছু আদায় করা গেছে। যদি সত্যি সত্যি 'জাতীয় দাবী' কার্যকরী করে তুলতে চাও, চরমপত্র ছাড়া আর কোন্ উপায়ে তা করা সম্ভব আমায় বলবে কি? এই সেদিনও রাজকোটের ব্যাপারে গান্ধীজি চরমপত্র প্রয়োগ করেছিলেন। আমার মুখ থেকে চরমপত্রের কথা বের হয়েছে, এই কি তোমার আপত্তির কারণ? তাই যদি হয়, দোমনা না করে স্পষ্ট করে তা বললেই তো পারো!

সত্যি কথা বলতে কি দেশের আভ্যন্তরিক সমস্যা সম্পর্কে তোমার মতামত আমার কাছে একান্তই দুর্বোধ্য। এই সেদিনের কথা, এক বিবৃতিতে তুমি বলে বসলে যে, রাজকোট আর জয়পুরের সমস্যা দেশের সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যাকে ঢেকে ফেলেছে। তোমার মত একজন বিচক্ষণ নেতার মুখ থেকে একথা শুনে আমি তো হতবাক। যে-কোনও সমস্যা, তা যত বড়ই হোক, দেশের মৌল সমস্যা, প্রধান সমস্যা—স্বাধীনতার সমস্যাকে ছাপিয়ে দাঁড়াতে পারে, এ আমার কল্পনার অতীত। জয়পুর রাজকোটের চাইতে আয়তনে বড়, সেই জয়পুরের সমস্যাও আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের তুলনায় মাছি-মশার কামড় ছাড়া বেশি-কিছু নয়। দু'শ দেশীয় রাজ্য আছে ভারতবর্ষে। রাজকোটের মত অমনি ঢিমে-তেতালে টিমৃটিম্ করে যদি সব-কটার মীমাংসা করতে হয়, আর তারই জন্যে আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম রাখতে হয় স্থগিত,—আগামী দু'শ পঞ্চাশ বছর লাগবে মাত্র দেশীয় রাজ্যের ব্যাপার মেটাতে। আর তারপর আমরা ভাবতে চাইব আমাদের স্বাধীনতার কথা।

তোমার বৈদেশিক নীতি আরও কুয়াশাচ্ছন্ন। কিছুদিন আগে

তুমিই-না ইউদীদের আশ্রয় দেবার প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটিতে এনেছিলে? কমিটি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হয়নি বলে তুমি দুঃখিতও হয়েছিলে।

বৈদেশিক নীতি খুবই বস্তুতান্ত্রিক। জাতির নিজ স্বার্থই ওর নিয়ামক। সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখ। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে সে যতই কম্যুনিজম্ নিয়ে ব্যস্ত থাক, কোনও ভাবপ্রবণতাকেই সে বৈদেশিক ব্যাপারে নাক গলাতে দেয় না। তার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে সে, তাই, সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের সঙ্গে মিতালি করতে কুণ্ঠিত হয় না। ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট ও চেকোশ্লোভাক্-সোভিয়েট চুক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেবে। এমন কি আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্যাক্ট করতে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

এইবার তোমার বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা একটু শোনা যাক। বল তো ওর স্বরূপটা কী? ফেনায়িত সস্তা ভাবপ্রবণতা আর সাধুত্বের রং ফলানো অর্থশূন্য কথায় বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা চলে না। সব সময় অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের পক্ষ সমর্থনে সার্থকতা কোথায় বলতে পারো? একদিকে তুমি জার্মেনী আর ইটালীর নিন্দায় পঞ্চমুখ, অন্যদিকে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রশস্তি গাইতে তোমার জুড়ি নেই। বলতো কোন্‌টা তোমার সত্যিকারের মত?

কিছুদিন ধরে তোমাকে এবং মহাত্মা গান্ধী এবং আরও অনেককে আমি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছি যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যা যাতে ভারতবর্ষের কল্যাণে কাজে লাগানো সম্ভবপর হয়, আমাদের তা করতেই হবে। চরমপত্রের মাধ্যমে জাতীয় দাবী তুলে ধরতে হবে বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছে। কিন্তু তোমাদের ওপর আমি কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারিনি, যদিও দেশের বহুলোক আমাকে সমর্থন করতে চায়। সম্প্রতি ইংলণ্ড থেকে বহু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র নিজেদের স্বাক্ষর দিয়ে এক বিবৃতি আমার দাবীর সমর্থনে পাঠিয়েছে।

তোমরাই ত্রিপুরীর প্রস্তাব জুড়ে দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছো। আবার এই মুহূর্তে কেন আমি ওয়ার্কিং

কমিটি গঠন করলাম না, তার জন্যে আমাকে দোষী সাজাতেও তোমাদের তাড়াহুড়ার সীমা নেই। (১) আর ঠিক এই সময়েই তোমার চোখে আন্তর্জাতিক সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠলো। ইওরোপে সহসা এমন কি ঘটেছে যা কিনা কল্পনাতীত? আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কীয় ওয়াকিবহাল প্রতিটি ব্যক্তিই জানতো যে, শরৎকালের মধ্যেই ইওরোপের সমস্যা ঘোরালো হয়ে উঠবে। চরমপত্র দেবার প্রস্তাব ওঠাবার কথায় আমিও কি বারবার একথা বলিনি?

তোমার এক বিবৃতির অন্য আর একটা অংশ : "অন্তত বর্তমানে ওয়ার্কিং কমিটি বলে কিছু নেই। সভাপতি সম্ভবত কংগ্রেসের অধিবেশনে নিজের ইচ্ছামত প্রস্তাব উপস্থাপিত করতে চান। তাঁরই ইচ্ছায় দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্যেও ওয়ার্কিং কমিটির কোন সভা ডাকা হয়নি।" এমন একটা অর্ধসত্য,—তাই-বা কেন,—অসত্য কথা বলবার মত দুষ্ট মনোবৃত্তি তুমি কেমন করে পেলে? কমিটির বারোজন সদস্য অকস্মাৎ আর অভাবনীয়রূপে আমার মুখের ওপর তাদের পদত্যাগ পত্র ছুড়ে ফেলে দিল, এতেও তাদের দোষ তোমার চোখে একবারও পড়লো না। উল্টে তুমি বলতে পারলে যে, সম্ভবত আমি ইচ্ছামত প্রস্তাব উত্থাপন করতেই কমিটির সভা ডাকিনি!···

ত্রিপুরী কংগ্রেসের সাতদিন পর তুমি টেলিগ্রামে আমাকে বলেছিলে, কংগ্রেসের একটা অচল অবস্থা নাকি আমি সৃষ্টি করে তুলেছি। তোমার সাধুত্বের তো অভাব নেই,—তবু একথা তোমার ধারণায় এলো

(১) তাড়াহুড়ার নমুনা ইতিহাসেও স্থান পেয়েছে। ডাঃ পট্টভি কংগ্রেসের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, ১১৪পৃঃ) লিখছেন,—"প্রায় প্রত্যহ দেশ আশা করছিল যে, সুভাষবাবু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম মনোনীত ও ঘোষণা করবেন। কিন্তু তা হল না।" মহাত্মাজির অনুমোদন ও আস্থাভাজন না হলে সুভাষচন্দ্রের মনোনয়নে ওয়ার্কিং কমিটি (ত্রিপুরী প্রস্তাবের ফলে) গঠিত হতে পারল না,—একথা পট্টভি চেপে গেছেন।

না যে, পন্থ-প্রস্তাব পাশ করবার সময় আমি ছিলাম ভয়ানক অসুস্থ। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ত্রিপুরী থেকে অনেক দূরে। ইচ্ছে করলেই কি সে সময় আমরা একত্র হয়ে কিছু করতে পারতাম? অবৈধ এবং নিয়মতন্ত্র-বিরুদ্ধ এক প্রস্তাব পাশ করিয়ে কংগ্রেসই-যে এই অচল অবস্থা তৈরী করেছিলো, একথাও তুমি মনে করতে পারছো না। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব দ্বারা যদি কংগ্রেসের গঠন-তন্ত্র এমন করে অমান্য না করা হত, আমি কংগ্রেসের পরদিন,—১০ই মার্চেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে ফেলতাম। ৭ দিনও কাটত না। তুমি আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিলে। দিলে একথা জেনেও যে, তখনও আমি রোগশয্যা-শায়ী। তোমার টেলিগ্রাম আমি পাবার আগেই ছাপা হয়ে গেল সংবাদপত্রে। যেদিন ১২ জন ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য একযোগে আসন্ন ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্বাহ্ণে পদত্যাগ করে কংগ্রেসের অচল অবস্থা সৃষ্টি করে বসলো, প্রতিবাদে তুমি কি একটি কথাও বলেছিলে? আমার জন্যে তোমার অন্তরে বিন্দুমাত্র করুণাও কি জেগেছিল?...

চারদিক থেকে হীন আক্রমণ যেদিন আমার ওপর চলতে লাগলো অবাধে, অন্যায় আঘাত এল অতর্কিতে,—সহানুভূতির কণামাত্র বাষ্পও তোমার কাছ থেকে আমি পেলাম না। আত্মরক্ষার জন্যে আমি যখন জানালাম প্রতিবাদ,—তোমার মেজাজ গেল বিগড়ে। বললে, "ঐ সব কূটতর্কে মীমাংসা হবে না।" আমার বিরুদ্ধ-পক্ষের বিবৃতির পর একথা তোমার মনে উদয় হল না কেন? হল না, কারণ, ওদের কথাগুলো তোমার কাছে যে মিষ্টি বোধ হয়েছিলো।

স্থানীয় ব্যাপারে কংগ্রেসের ওপর-তলার নেতৃবর্গের হস্তক্ষেপের সমালোচনা ছলে তুমি যা বলতে চেয়েছো, তার উত্তরে আমি এইটুকুই শুধু বলবো যে, একাজে তোমার জুড়ি নেই। তোমার আমলে সভাপতি হিসেবে তুমি যা করেছো, বেমালুম তুমি তা ভুলে বসে আছ।

নির্বাচন-বিতণ্ডার সবটা বিচার করে এই সিদ্ধান্তই লোকের মনে জেগেছিলো যে, নির্বাচনের পর সব গোলমাল মিটে যাবে। ও-অধ্যায়ের

যবনিকা পড়বে ওখানেই। সমস্ত ভেদাভেদ হবে কবরস্থ। আর খেলোয়াড়ের মতই সবাই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে হাতে হাত মেলাবে। কিন্তু তা হলো না। হবার নয় বলেই হলো না। সত্য ও অহিংসার পথিকদের ওটা হতে নেই! খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব দেখা গেল না। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ লালিত হতে থাকলো। এবং প্রতিশোধের কামনা দেওয়া হলো লেলিয়ে। কমিটির অন্যান্য সদস্যের পক্ষ হয়ে তুমি আসরে অবতীর্ণ হলে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। নেবার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একবারও তোমার মনে একথা উদয় হলো না যে, এ লোকটারও কিছু বলবার থাকতে পারে!

ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি আমি, আমার অসাক্ষাতে এবং অনুপস্থিতিতে যখন অন্যান্য সভ্যেরা ডাঃ পট্টভিকে সভাপতি পদের জন্যে মনোনীত করলো, তার ভেতরে তুমি অন্যায় কিছু দেখলে না। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হয়ে সর্দার প্যাটেল এবং আর সবাই যখন ডাঃ পট্টভির সমর্থনে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের নিকটে আবদন জানালেন, তখনও তার ভেতরকার কোনও অন্যায় তোমার চোখে পড়লো না!

ইলেক্‌সনের হাটে কে গান্ধীর নাম আর তাঁর আদেশ প্রচার করেছিল? সর্দার প্যাটেল না? তবুও তিনি অন্যায় করেননি! আমার পুনর্নির্বাচনে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে বলে সর্দার প্যাটেল বিবৃতি প্রচার করলেন,—সেটাও অন্যায় নয়! কী বলো? কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আমার বিরুদ্ধে লাগান হয়েছে ভোটের জোগাড়ে, তাও ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে তোমার মতে,—তাই না?

ফেডারেল পরিকল্পনা নিয়ে আমি যে-কটাক্ষ করেছিলাম, তা নিয়ে অনেক কথাই তুমি বলেছো। আমার যা বলবার, ত্রিপুরী কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সভায় তা বলেছি। কিন্তু একটা কথা : লর্ড লোথিয়ান(১)

(১) লর্ড লোথিয়ানের সঙ্গে জহরলালের বেশ নিবিড় পরিচয় ছিল। এবং নিয়মিত পত্রালাপও চলতে উভয়ের মধ্যে। বাঞ্চ্‌ অব্‌ ওল্ড্‌ লেটার্সের মধ্যে উভয়ের বহু পত্র দেখতে পাওয়া যাবে।

যখন ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, প্রকাশ্যে তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে, ফেডারেল স্কীম সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরুর মতামতের সঙ্গে কংগ্রেসের অনেক নেতারই মতৈক্য নেই। এই কথাটার মর্মার্থ এবং ইঙ্গিত তুমি একটু খুলে বলবে কি ?

তুমি অনেক সময়েই বলে থাক যে, তোমার কোন দল নেই, তুমি একা, তুমি কারও প্রতিনিধিত্ব করো না। আমি লক্ষ্য করেছি এই সব কথা বলবার সময় তুমি বেশ কিছুটা গর্বও অনুভব করো। আর এরই সঙ্গে একথাও বলতে তুমি ছাড়ো না যে, তুমি একজন সোস্যালিষ্ট, খাঁটি সোস্যালিষ্ট। একজন সোস্যালিষ্টএর পক্ষে একই সময়ে কেমন করে স্বতন্ত্রবাদী হওয়া চলে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। একটা আর একটার বিপরীতধর্মী। স্বতন্ত্রবাদীর পক্ষে কেমন করে সমাজে সোস্যালিজম্ চালু করা সম্ভবপর হবে, তাও বোঝবার মত বুদ্ধি আমার নেই।········ কোন দেশে পার্টির সহায়তা ছাড়া কোন ব্যক্তি-বিশেষ সোস্যালিজম্ চালু করতে পেরেছে, এ তথ্য আমার জানা নেই। মহাত্মা গান্ধীর মত মানুষেরও পার্টি আছে।

আরও একটা কথা প্রায়ই তোমার মুখে শোনা যায়। জাতীয় সংহতি। তুমি বা আমি কেন, সবাইএরই ওটা কাম্য। কিন্তু ওরও একটা সীমা আছে। কর্মের সংহতিই আমাদের কাম্য, নিষ্কর্মের নয়। সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে অবিমিশ্র অমঙ্গলই সব সময় দেখা দেয় না। অগ্রগমনের পথে অনেকক্ষেত্রে সংঘর্ষেরও স্থান আছে। ১৯০৩এ যখন সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি বলশেভিক আর মেনশেভিক হয়ে দুদলে ভাগ হয়ে গেল, লেনিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।···

ভারতবর্ষেও যেদিন নরমপন্থীরা কংগ্রেস ছেড়ে গেল, কেউ দুঃখ করেনি। তারপর এল ১৯২০। গেল কত লোক কংগ্রেস ছেড়ে। কে তা নিয়ে কাঁদতে বসেছিলো ? সম্প্রতি এই একতা ও সংহতির নামে বড্ড বাড়াবাড়ি চলছে। এবং দুষ্কার্য ও দুর্বলতা ঢাকা দেবার যন্ত্রও হয়ে পড়েছে। এরই নামে তুমি গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট সমর্থন করে-

ছিলে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বেলাতেও তাই।(১) সেই জন্যেই মনে হয়, যতই আপত্তির কারণ থাক অথবা বিবেকের থাক বিরোধিতা, ফেডারেল স্কীম যদি ইংরেজ চালু করতে চায়, তখনও যারা ওটাকে সমর্থন করতে যাবে, এই সংহতির নাম নিয়েই তারা তা করে বসবে। সংহতি বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ কথা নয়। একটা পথ মাত্র।···

তোমাকে সোজাসুজি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে : ধরো, ভোটের জোরে কংগ্রেস ফেডারেল স্কীম চালু করবার প্রস্তাব সমর্থন করে বসলো। তখন তুমি কী করবে? (সংহতির নামে) তুমিও কি সমর্থকদের দল ভারী করবে? না, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?······

আরও একটা অভিযোগ এনেছো তুমি : আমি নাকি সভাপতির পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিনি সভার কার্য পরিচালনা করবার সময়। অর্থাৎ পরিচালনার ব্যাপারে আমি যোগ্যতার পরিচয় দিইনি। অনেকটা এ্যাসেম্ব্লীর স্পীকারের মত কাজ চালিয়েছি। তুমি সভায় উপস্থিত থাকতে কার সাধ্য সভাপতির কাজ করে যাবে? ওয়ার্কিং কমিটির সব সময়টাই কাটে তোমার একার কথা শুনতে। তোমার মত আর একজন বচনবাগীশ (Talkative) থাকলে আমাদের সকল কাজের গয়া হতে বেশিদিন লাগত না। তাছাড়া সভাপতির যে কাজ, সর্বদাই সেটা জবর দখল করে তুমি বসে থাকতে চাও। বাধা আমি দিতে পারতাম কিন্তু দিতে গেলে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া করতে হতো। আমি তা চাইনি। বকাটে ছেলের মত (as a spoilt child) তোমার আচরণ হয়ে উঠতো মাঝে মাঝে। প্রায়ই মেজাজ যেত বিগড়ে। কিন্তু তোমার এই স্নায়বিক চাঞ্চল্য এবং ঝাঁপাঝাঁপির ফল

---

(১) আরও পূর্বে ১৯২৯এ সর্বদলীয় নেতৃসম্মেলনের ডোমেনিয়ন স্টেটাসের দাবীতেও জহরলাল স্বাক্ষর দিয়ে দীর্ঘ পত্রের পরিশেষে মনের দুঃখ জানিয়েছিলেন গান্ধীকে।

কী হয়েছে ? ঘন্টার পর ঘন্টা তুমি বচনের তুবড়ি ছোটাতে। শেষকালে পড়তে ঝিমিয়ে। সর্দার প্যাটেলরা জানতেন কী করে তোমাকে চালাতে হয়। তোমায় তাঁরা বাধা দিতেন না। সমানে কথা চালাতে দিতেন। তারপর সময় বুঝে তাঁদের প্রস্তাব খসড়া করবার ভার দিতেন তোমার ওপর। তোমার আনন্দের আর সীমা থাকতো না। লেগে যেতে খসড়া করতে। তোমার নিজের বক্তব্য প্রস্তাবে না থাকলেও খসড়া করতে তোমার আটকাতো না। শেষ পর্যন্ত তোমার নিজের মতামত কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যেত এই সব প্রস্তাবে।

কোন খবর না রেখেই তুমি আরও অভিযোগ করেছো যে, বম্বে ট্রেড ডিস্‌পিউট বিল বর্তমান আকারে আইনে পরিণত হবার সময় আমি বাধা দিইনি। কথাটা আমাকে বিস্মিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিক-কালে আমার সম্পর্কে অভিযোগ করতে তুমি সবিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে থাকো। অনেক সময় সেটা প্রচারও করে ফেলো। আর তা করো সত্যা-সত্য নির্ণয় না করেই। সত্যি যদি সঠিক কথা জানবার তোমার বাসনা থাকে, সর্দার প্যাটেলকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখো। এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কলহ করা ছাড়া সর্বতোভাবে তাঁকে আমি বাধা দিয়েছি। এতে যদি আমাকে অপরাধী বলে তোমার ধারণা জন্মে থাকে, সে-অপরাধ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, একটা কথা : কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা নাকি আইনটিকে সমর্থন করেছে ? এ সংবাদ তুমি রাখো ?

এইবার তোমার কথা : বিলটি আইনে পরিণত যাতে না হয়, বলো তো তার জন্যে তুমি কী করেছো ? তুমি কি বাধা দিয়েছিলে ? তুমি যখন বম্বে এলে, তখনও সময় ছিল কিছু করবার। করেছিলে কি ? তাছাড়া অনেক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী তোমাকে ধরেওছিলো। আর তুমিও দিয়েছিলে তাদের আশ্বাস। তোমার পক্ষে কিছু করবার সুবিধাও ছিলো প্রচুর। গান্ধীজির ওপর আমার চাইতে তোমার প্রভাব বেশি। আমি যা পারিনি তুমি তা পারতে। অবশ্য যদি চেষ্টা করতে। করেছিলে কি ?

কোয়ালিশন্‌ মন্ত্রিত্বের আভাষ শোনবামাত্র আমাকে তুমি খোঁচা

দিতে ছাড়ো না। নীতিবাগীশ রাজনীতিবিদের মতই কোয়ালিশন মন্ত্রিত্বকে তুমি দক্ষিণপন্থী চাল বলে ধরে নাও। এ ব্যাপারে তোমার চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশ করবার পূর্বে তুমি একটা কাজ করবে? একবার যাবে আসামে? বেশি নয়, মাত্র দিন চোদ্দ ঘুরে দেখে এসোনা আসাম প্রদেশটা। আর দেখে এসে আমাকে বলো যে, ওখানে কোয়ালিশন্ মন্ত্রিসভা গঠন করা প্রগতির কাজ হয়েছে, না, প্রতি-ক্রিয়াশীল হয়েছে। এলাহাবাদে বসে বসে এই সব উচ্চাঙ্গের কথা বলায় লাভ আছে কি? না, এর সঙ্গে প্রকৃত অবস্থারই কোন সম্বন্ধ আছে?...

তারপর বাংলা। আমার বিশ্বাস বাংলা সম্পর্কে তুমি একেবারেই অজ্ঞ। দুবছর তুমি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলে। দুবছরের মধ্যে একটিবার বাংলায় আসবার তোমার অবকাশ হয়নি। তার প্রয়ো-জনীয়তাও তুমি বোধ করোনি। আর-সব প্রদেশের চাইতে বাংলায় আসা এবং বাংলার সমস্যার দিকে তোমার দৃষ্টি পড়া কতই-না প্রয়ো-জনীয় ছিল। কী ভয়ানক অত্যাচারের ঝড় বয়ে গেছে এই প্রদেশের বুকের ওপর দিয়ে। হক্-মন্ত্রিত্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই প্রদেশে কী ঘটেছে তা জানবার জন্যে তুমি কি কোনও চেষ্টা করেছো? তা যদি করতে, নীতিবাগীশের মত এমন কথা তুমি বলতে পারতে না। বাংলাকে বাঁচাতে হলে এ-মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটাতেই হবে এবং বর্তমান অবস্থানুযায়ী যাতে কোনও প্রগতিশীল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তাও করতে হবে। কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট ছাড়া বাংলার গত্যন্তর নেই। কিন্তু এই কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের কথা আজ উঠেছে কেন জানো? স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে। সংগ্রাম শুরু করো, পরক্ষণেই দেখতে পাবে কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের কল্পনা শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে।...

এইবার তোমার নিজের কথা বলবার জন্যে তোমাকে অনুরোধ করবো। স্পষ্ট করে বলো তো তুমি কী? ধোঁয়া নয়, ভাসা-ভাসা নয়।

স্পষ্ট করে, সোজা কথায় বলো। তুমি কি সোশ্যালিস্ট ? বামপন্থী ? মধ্যপন্থী ? দক্ষিণপন্থী ? গান্ধীপন্থী ? না, এ-সব ছাড়া অন্য কিছু ?

শরতের(১) কাছে তোমার লেখা চিঠিতে দুটি উচ্চাঙ্গের বাক্য রয়েছে : "ব্যক্তিগত কথা যখন রাজনীতিকে ছাপিয়ে ওঠে, ব্যথা পাই আমি সব চাইতে বেশি। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে কোন গোল-যোগের সূত্রপাত হলে আমি এই কামনাই করবো যে, ওর মানদণ্ড যেন উঁচুই থাকে। আর যেন সীমাবদ্ধ থাকে নীতি ও আদর্শের গণ্ডির ভেতর।" নিজের কথা অনুযায়ী যদি তুমি নিজে চলতে পারতে, কংগ্রেস রাজনীতির রূপ হতো ভিন্ন ধরনের।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে কোথায় এবং কেমন করে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এটা নাকি তোমার অজানা। সত্যি, তোমার অকপটতার প্রশংসা না করে উপায় নেই! ত্রিপুরী কংগ্রেসে কার্যতঃ একটি প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছিলো,—পন্থ-প্রস্তাব। আর ঐ প্রস্তাবের আগা-গোড়া পূর্ণ ছিল নীচতা ও প্রতিশোধ স্পৃহায়। সভাপতি নির্বাচনের পর সত্য আর অহিংসার পূজারীরা তারস্বরে ঘোষণা করেছিলো যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাজে তারা বাধা দেবে না। কিন্তু বাধা-না-দেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা পরক্ষণেই একযোগে পদত্যাগ করে বসলো। ত্রিপুরীতে আর কিছুই ওরা করেনি। বাধা সৃষ্টি করাই ছিল ওদের একমাত্র কাজ। অবিশ্যি এ-কাজ করবার তাদের অধিকার আমি অস্বীকার করিনে কিন্তু ওদের কথা আর কাজে এত বেশি অসামঞ্জস্য কেন ?……

তোমার কি মনে একথা জাগে না যে, পন্থ-প্রস্তাবের মুল উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মাজিকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া ? আমার দিক থেকে আজ পর্যন্ত মহাত্মাজির সঙ্গে কোনও প্রকার বিরোধের কারণ ঘটেনি। এই অবস্থায় এই অপপ্রচেষ্টা তোমার কাছে কি খুব সংগত

(১) শরৎচন্দ্র বোস।

আর সাধু বলে মনে হয়েছে? বুড়ো পাণ্ডাদের যদি সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে লড়বার ইচ্ছাই ছিল, সোজাসুজি তা তারা করলো না কেন? মহাত্মাজিকে এর মধ্যে টেনে নাবালো কেন? তাদের অনুসৃত পথে প্রতারণার ধূর্তামো আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সত্য ও অহিংসার সঙ্গে ওটা খাপ খাবে কিনা সেইটেই ভাববার কথা।

আমার পুনর্নির্বাচনের বেলা সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন যে, দেশের স্বার্থের পক্ষে হবে এ-নির্বাচন ক্ষতিকর। এ সম্পর্কে তোমার মতামত আমি জানতে চেয়েছি। তুমি উচ্চবাচ্য করোনি। তোমার মৌনতা প্রকারান্তরে তাঁকে সমর্থন করেছে। নির্বাচনের ফল জানবার পর মহাত্মাজি বলেছিলেন যে, মোদ্দা কথা, সুভাষ বোস দেশের শত্রু নয়। কথাটা শোনবার পর তোমার মনে কী ভাবের উদয় হয়েছিলো, আমার জানতে ইচ্ছে করছে। কথাটা কি তোমার মতেও সংগত হয়েছিলো? যদি তা মনে না হতো, আমার পক্ষ সমর্থন করে একটা কথাও মহাত্মাজিকে তুমি বলোনি কেন?

মহাত্মাজি পন্থ-প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থক, এ-কথা আমরা ত্রিপুরীতে থাকতেই দৈনিক সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছিলো। এর পেছনকার কূট-কৌশল কি তুমি ধরতে পারোনি?

এইবার সোজাসুজি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো: পন্থ-প্রস্তাবের মানে তোমার কাছে কী মনে হয়েছে? জনপ্রবাদ যে, প্রস্তাবটির রচয়িতাদের মধ্যে নাকি তুমিও ছিলে (১)। এটা কি সত্যি? ভোটের সময় তুমি নিরপেক্ষ ছিলে। কিন্তু সত্যিই কি প্রস্তাবটা তুমি সমর্থন করো না? প্রস্তাবটির ব্যাখ্যা তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাইছি। তুমি কি মনে করো না যে, ওটা আমার বিরুদ্ধে অনাস্থাজনক প্রস্তাব?

······তুমি নাকি কী-সব লিখছো আমার সভাপতিত্বের বিরুদ্ধ-

(১) পত্রোত্তরে জহরলাল একথা স্বীকার করেছেন। বাঞ্চ, অব, ওল্ড লেটার্স—৩৫০ পৃঃ।

সমালোচনা করে। আমি এখনও দেখিনি। দেখলে ও-বিষয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করবো। তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখাবো যে, তোমার ও আমার মধ্যে কে বামপন্থার আদর্শ এগিয়ে নিয়ে গেছে বেশি—দুবছর সময় পেয়ে তুমি, না, এক বছরে আমি।

পত্রে হয়তো স্থানে স্থানে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছি। হয়ত তোমাকে ব্যথাও দিয়েছি। ক্ষমা করো আমাকে। তুমি নিজেই বলে থাকো যে, অকপটতার চাইতে বড় আর কিছু নেই। আমি অকপট হবার চেষ্টা করেছি। হয়ত খানিকটা নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছি।......

তোমার স্নেহ-সিক্ত সুভাষ"(১)

নেতার এই মারাত্মক পত্রের উত্তর জহরলাল খুব মোলায়েম ভাবে দেবেন, একথা ভাবা একটু কষ্টকর বই কি। জহরলালের উত্তর এল দেরি না করে। এল দিন সাতেকের মধ্যে। চিঠির তারিখ ছিল ৩রা মার্চ, ১৯৩৯। জহরলাল চিঠিতে উষ্ণ হয়ে ওঠেননি। ওঠবার উপায়ও কি ছিল ? নেতার অভিযোগ, শ্লেষ ও বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকার করে নিয়েছেন জহরলাল। লিখছেন তিনি,—"আমার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছো তুমি। ও-বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। তোমার উল্লেখ-করা দোষ-ত্রুটি সত্যিই আমার আছে, তাও বুঝতে পারছি। আরও একটা কথা বলব : ১৯৩৭এর পর অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়ে যখন তুমি এলে, সত্যিই আমার প্রতি তোমার আচরণ ছিলো সর্বক্ষেত্রে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর ঔদার্যপূর্ণ। তোমার 'কথার সত্যতা আমি পূর্ণভাবে স্বীকার করি। মূল্যও দিই যথেষ্ট। তোমার কাছে এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞও

(১) স্থানাভাবে গোটা পত্রখানার অনুবাদ দেওয়া সম্ভবপর হল না। বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটার্স—৩১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কম নই। ব্যক্তিগতভাবে পূর্বে এবং এখনও তোমার ওপর আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধা অপরিসীম,—যদিও তুমি যে-সমস্ত কাজ করো এবং যেমন করে করো, তার সঙ্গে রয়েছে আমার মতভেদ। আমার মনে হয়, আমাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে খানিকটা পার্থক্য। জীবন-সমস্যা আর জীবন-দর্শনও সম্ভবত এক নয়।"

জহরলাল যখন সভাপতি ছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটির প্রবীণ সদস্যরা ও তাঁর মধ্যেও সংকট দেখা দিয়েছিল, এ-পত্রে তারও উল্লেখ আছে। "কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম, এইভাবে ওঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তোমার ও আমার পক্ষে দেশের স্বার্থে সমুচিত হবে না। ...তাছাড়া ঐ প্রকার একটা আকস্মিক অবস্থার সম্মুখে দাঁড়াবার মত আমার মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না।"(১)

সুভাষচন্দ্র সোজাসুজি পন্থ-প্রস্তাব ব্যাখ্যা করতে জহরলালকে আহ্বান করেছিলেন। জহরলাল স্পষ্ট কথার পরিবর্তে পাশ কাটিয়ে গেছেন। বলেছেন,—"পন্থ-প্রস্তাব দ্বারা তোমার ওপর অনাস্থা বোঝায় না, তবে পূর্ণ আস্থাও বোঝায় না। গান্ধীজি সম্বন্ধে পন্থ-প্রস্তাব আস্থা জ্ঞাপয়ক, এ-কথা আমি নিশ্চয়ই বলবো।"

দীর্ঘ আঠার বছর ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রের একচ্ছত্র অধিনায়কের পক্ষে সেদিন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল একথা প্রমাণ করবার যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মীর তিনি আস্থাভাজন। সুভাষ-চন্দ্রের নির্বাচন কালে গান্ধী সুভাষ-বিরোধিতার যে-প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সমর্থিত প্রার্থীর পরাজয়ে যে-নিদারুণ বেদনা ও গ্লানি গান্ধীর মনে জেগেছিল, তারই পটভূমিকায় হয়তো এর প্রয়োজনও ছিল কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচক-চক্ষুতে একথা একান্ত সহজভাবে প্রস্ফুটিতও হয়ে উঠল যে, গান্ধী আর ভারতবর্ষের অবি-

(১) উদ্ধৃত অংশগুলি বাঞ্চ্ অব্ ওল্ড্ লেটার্স থেকে নেওয়া। ৩৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সংবাদী নেতৃত্বের অধিকারী নন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়েছে। প্রতিবাদ জেগেছে। আর সম্ভবত গান্ধী-বাদের নিঃসংশয় কার্যকারিতার ওপর দেখা দিল স্পষ্ট অবিশ্বাসের দোলা।

এই চিঠি পড়েই মনে হবে, জহরলাল আত্মানুসন্ধানে খানিকটা সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। প্রতি-আঘাত স্পৃহা ওঁর সীমিত হয়ে উঠেছে। অনুশোচনাও কি জাগল? হয়তো জেগেছিল। হয়তো জাগেনি। জাগলেও জহরলালের পক্ষে সেদিন ন্যায় ও সত্যের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তার অপক্ষপাত বিধান মেনে নেবার মত শক্তির অভাব ছিল। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূজারী জহরলাল, সোস্যালিস্ট জহরলালের আর-কিছু অবশিষ্ট নেই। গান্ধী-গোষ্ঠীর-একজন-জহরলালের পক্ষে গান্ধী-গোষ্ঠীর সমর্থন ছাড়া আর কিছু করবার উপায়ও ছিল না।

রাজনীতি ক্ষমাহীন। রাজনীতি নিষ্ঠুর। রাজনীতি সুযোগ ও সুবিধাবাদী। গান্ধী-প্রবর্তিত রাজনীতি এর ব্যতিক্রম, এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে একথার প্রতিবাদ-প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে বাধ্য।

পন্থ-প্রস্তাব কংগ্রেস-সংবিধান-বিরোধী কিনা এ-প্রশ্ন সেদিন অনেকেই উত্থাপন করতে চেয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী পুরোনো সংবিধান পাল্টে গড়েছিলেন নতুন সংবিধান ১৯৩৪এ। সেদিন তিনি জানতেন যে, তাঁর ও তাঁর গোষ্ঠীর বিরোধী কারও পক্ষে কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া কোনও দিনই সম্ভবপর হবে না। আর তাই সভাপতিকে দেওয়া হয়েছিল ওয়ার্কিং-কমিটি-গঠনের অবাধ ক্ষমতা। সংবিধানে দেওয়া সভাপতির এই মৌল অধিকারের মূলে কুড়ুল মেরে গান্ধী-গোষ্ঠী ও তাদের অনুগামীদের কারও মনে এ-প্রশ্ন ক্ষণকালের জন্যেও জাগল না যে, সুভাষ বোসকে হয়ত চরম শিক্ষা দেওয়া এতে চলবে কিন্তু অনাগত যুগের ইতিহাসও কি তাদের আদেশে চিরকালই হয়ে থাকবে মৌন। মূক? সত্যের দুর্বার স্বরূপ কোনও দিনই কি সে দেখাবে না অনাবৃত আর স্পষ্ট করে?

নেতা ২০শে মার্চ গান্ধীকে যে-পত্র লিখেছিলেন তাতে একবার উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তী বহু পত্রে গান্ধীর কাছে ঐ প্রস্তাবের তাৎপর্য জানতে চেয়েছেন। কি জহরলাল, কি গান্ধী, কেউই সোজা আর স্পষ্ট উত্তর দেননি। এ সত্ত্বেও নেতা লিখলেন,—"কিন্তু স্বভাবতই আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আইন বা সংবিধানের কড়াকড়ি আমি পছন্দ করিনে। তাছাড়া সংবিধানের আড়ালে আত্মরক্ষার বা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টার মধ্যে কোন পৌরুষও নেই।"

সর্বসাকুল্য ৪৯খানা পত্র এবং টেলিগ্রাম নেতা গান্ধীজিকে লিখে-ছিলেন। নেতার প্রতিখানা পত্রের ছত্রে ছত্রে আছে সৌজন্য, ধৈর্য ও গান্ধীজির ওপর অপরিসীম শ্রদ্ধার পরিচয়। কোন পত্রের ভেতর থেকেই ব্যক্তি-সুভাষ একটি কথা বলেননি। পত্রের প্রতিটি শব্দে ফুটে উঠেছে একটি সমুজ্জ্বল আদর্শ। কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পূর্বেই ২০শে এপ্রিলের এক চিঠিতে নেতা গান্ধীকে লিখছেন,—"সভার পূর্বে কলকাতায় বা নিকটবর্তী কোনস্থানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে ব্যাকুল ও অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি। মনে আশাও কম নেই।··· পন্থ-প্রস্তাবানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব আপনার। ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করলে আপনি দেখতে পাবেন যে, আমাদের সাধ্যানুসারে আমরা আপনার সঙ্গে সহযোগিতাই করবো।"

কিন্তু গান্ধীর কাছে সহযোগিতার আশ্বাস তো ভাল, প্রতিশ্রুতিও আর যথেষ্ট নয়। আশ্বাস নয়। প্রতিশ্রুতিও না। তিনি চান অবলুপ্তি। আত্মসমর্পণ। মামেকং শরণং ব্রজ। নিঃসংশয়, অকুণ্ঠ, নিখাদ, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।(১)

(১) পন্থ-প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য ছিল, গান্ধী-নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই প্রশ্ন বিচার করতে যেয়ে ডাঃ পট্টভি লিখছেন—"গান্ধী-নেতৃত্ব যদি আবার স্বীকৃতই হয়, যে-সভাপতির নির্বাচনই শুধু তাঁর ইচ্ছা-বিরুদ্ধ নয়,—গান্ধীর আদর্শ, মতবাদ এবং কর্মধারা যাঁর সঙ্গে সর্বথা অসংগতিপূর্ণ, যাঁর নির্বাচন-জয়,

ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি কোনদিন অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়, তা দেবে জহরলালকে উপলক্ষ্য করেই, এমনি একটা মনোভাব হরিপুরের পরবর্তী সময়ে নেতার মনে স্থান পাওয়া অস্বাভাবিক হয়তো ছিল না। কিন্তু ত্রিপুরীর পূর্বে নেতা কোনদিন কোন কারণেই একথা ভাবতে চাননি যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁকে করতে হবে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে। তিনি ভাবতে চাননি কিন্তু এ-ভবিতব্যতা তাঁকে নিষ্কৃতিও দিল না। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। জীবিত গান্ধীর পায়ে জহরলাল যেদিন এবং যে-মুহূর্তে নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জলাঞ্জলি দিয়ে শরণাগতের ভূমিকা লাভ করে সন্তুষ্ট ও কৃতার্থ হলেন, সেই দিনই তাঁর পৃথক নেতৃত্বের দাবী নিঃশেষ হয়ে গেল। গান্ধীর সামনে জহরলাল নেতা নন,—অনুগামী, ভক্ত, শিষ্য। সুভাষ বোস অহিংসায় সম্ভবত গান্ধীর মনঃপূত সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি কিন্তু তিনি নেতা। বিরোধ যদি কোন কারণে দেখা দেয়ই, নেতার সঙ্গে নেতার বিরোধই কাম্য।

কলকাতা সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল এ-বিরোধের পরিণতির দিকে চেয়ে। আর তার সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষ। হয়তো তারও সীমা পেরিয়ে দূরের অনেক দেশও। রাজকোটের মত একটা সামান্য, অপ্রধান, অসময়োচিত সমস্যা স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করে তার পক্ষপুটের আশ্রয়ে গান্ধী আত্মরক্ষার দুর্বল চেষ্টা দ্বারা সুভাষ-বিরোধিতার প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র পরিহার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি জানতেন যে, একদিন এই দুঃসাহসী, অপরিণামদর্শী, লাভালাভের প্রতি সমউদাসী ব্যক্তিটির সামনা-সামনি তাঁকে দাঁড়াতে হবে। আর এ-কথা ভেবে তাঁর

গান্ধী মনে করেন তাঁরই পরাজয়, এমন সভাপতির সহযোগী হয়ে গান্ধী চলবেন কেমন করে? দুটো যুগ ধরে একমাত্র গান্ধীর নির্দেশে এবং তাঁর অনুমোদনে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়ে আসছে। এবার কি হবে তার ব্যতিক্রম?

কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১১৮ পৃঃ।

দুশ্চিন্তারও অবধি ছিল না। শত অনুরোধ সত্ত্বেও গান্ধী সেদিন সুভাষচন্দ্রের আতিথ্য স্বীকার করতে ভরসা পাননি। থাকলেন কলকাতার অনেক দূরে। সোদপুরে। কিন্তু জহরলালের পক্ষে শরৎ-বাবুর আতিথ্য স্বীকার করতে বাধে নি। জহরলাল সুভাষের অন্তত সেই ক্ষণে প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে নেতা পুরোনো বসনের ন্যায় জীর্ণ সংস্কার মুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর স্বভাব-ধর্মের পরিপূর্ণ ছটা নিয়ে। বিপ্লবী, আপোষ-বিরোধী, নিঃসর্ত স্বাধীনতার পূজারী সুভাষ। অনাগত কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের মুক্তিদূত হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম অবশিষ্ট দুর্বলতা পরিহার করে শুভ্র ঔদার্য ও নিঃসংশয়-নির্ভীতির যে অপরূপ মাধুর্য ও সুষমায় সেদিনকার ভারতরাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন-কক্ষ পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন, তা শুধু অভাবনীয় বলেই গান্ধী ও গান্ধী-গোষ্ঠীকে পরাভূত করেনি, পরন্তু নিঃসন্দেহে সুভাষ সেদিন রাজনীতির পঙ্কিল ও স্বার্থবহ পরিবেশের মধ্যে রচনা করেছিলেন এক দিব্য ও সুন্দরের আবাহন স্তব, যা দেখে ওরা চমকেও উঠেছিল। যে-মুহূর্তে গান্ধী ও গান্ধী-গোষ্ঠী সুভাষচন্দ্রের পরাজয়-কামনায় স্বপক্ষীয় ও বিরুদ্ধ পক্ষের অনেককে পক্ষভুক্ত করে চরম অভিযানের আকুল আগ্রহে অতিব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে একান্ত সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সভাক্ষেত্রে দাঁড়ালেন এসে ধীর পদক্ষেপে। পা একটু কাঁপল না। কণ্ঠে একটু বাধল না। দেহ একটু কুব্জ হল না। ঋজু, অবিচল, বস্তু-ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভ্রূক্ষেপহীন আদর্শবাদী বিপ্লবী পদত্যাগ-পত্র পাঠ করলেন।

"বন্ধুগণ, ত্রিপুরী কংগ্রেসে নতুন-ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, আপনারা তা অবগত আছেন। প্রস্তাবটি এই :—

'সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষে এবং পরবর্তীকালে যে বিতণ্ডা দেখা দিয়েছিল দেশের মধ্যে এবং কংগ্রেসের ভেতর, আর তার ফলে যে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিখিল

ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষে এই অবস্থার পরিষ্কার ধারণা এবং কংগ্রেসের প্রচলিত নীতি ঘোষণা করা আবশ্যক হয়ে উঠেছে।

'বিগত কতিপয় বৎসর ধরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে কর্মধারা এবং মৌল নীতি দ্বারা কংগ্রেস পরিচালিত হয়ে আসছে, এই সমিতি তার প্রতি দৃঢ় আনুগত্য স্বীকার করছে এবং দৃঢ়ভাবে এই অভিমত প্রকাশ করছে যে, ভবিষ্যতেও কংগ্রেসে এই নীতি ও কর্মপন্থা অব্যাহতই চলবে। গত বৎসর যে ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের কার্য পরিচালনা করেছেন, এই সমিতি তার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করছে এবং কমিটির কোন কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ উপস্থাপিত হয়েছে, তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছে।

'আগামী বৎসর একটা সংকটপূর্ণ সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনা রয়েছে; এই দুর্যোগে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীকেই সফলতা ও বিজয়ের পথে দেশ ও কংগ্রেসকে পরিচালিত করবার উপযুক্ত নেতা মনে ক'রে সমিতির সুস্পষ্ট এবং অবশ্য প্রতিপাদ্য অভিমত এই যে, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি (ওয়ার্কিং কমিটি) তাঁর আস্থাভাজন হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং সমিতি সভাপতিকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, তিনি যেন গান্ধীজির অনুমোদন অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। প্রস্তাবক,—গোবিন্দবল্লভ পন্থ।'

"ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর আজ পর্যন্ত নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু এটা ঘটেছে এমন একটা পারিপার্শ্বিকতার চাপে, যার ওপর আমার কোন হাত ছিল না। মহাত্মাজির কাছে আমি যেতে পারিনি, কারণ আমি অসুস্থ ছিলাম। তাই, আমি আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপে প্রবৃত্ত হই। এতে করে আমাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ হয়ে উঠল অনেকটা কিন্তু সমস্যার সুরাহা এতে হল না। যখন আমি বুঝলাম যে, আমাদের এই পত্রালাপ ফলপ্রসূ হল না, আমি দিল্লীতে গিয়ে মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষাও আমার অপূর্ণই রয়ে গেল। মহাত্মাজির

এখানে আসবার পর থেকে আমরা দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছি কিন্তু একান্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, তাতেও সমস্যার সমাধান-পথে আমরা এগোতে পারিনি। পুরোণো ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বাদ দিয়ে আমার মনোমত সদস্য নিয়ে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে মহাত্মাজি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। নানা কারণে মহাত্মাজির এই উপদেশ অনুযায়ী কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। দুটি প্রধান কারণ এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই। পন্থজির প্রস্তাব এ সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছে, (আমি মহাত্মাজির কথা মত কমিটি গঠন করলে) তা হত সেই বিধানের বিরোধী। আর একথাও পন্থ-প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে গান্ধীজির ইচ্ছামত এবং কমিটিকে হতে হবে তাঁর একান্ত আস্থাভাজন। গান্ধীজির উপদেশ মত আমি যদি নিজের মনোমত কমিটি গঠন করতাম তা না-হত তাঁর মনোমত, না-হত তাঁর একান্ত আস্থাভাজন। তাছাড়া, এ-সম্বন্ধে আমার নিজের বিশ্বাসের প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। আমাদের সম্মুখে দেশের এবং আন্তর্জাতিক যে সংকটপূর্ণ সময় এগিয়ে আসছে, ওর পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সব চাইতে বেশি সংখ্যক সভ্যের বিশ্বাসভাজন একমতাবলম্বী কমিটি গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যে কমিটি বহন করবে ভারতব্যাপী কংগ্রেসের সাংখিক প্রতিচ্ছায়া। মহাত্মাজির উপদেশানুযায়ী কাজ করা আমার পক্ষে, তাই, সম্ভবপর হয়নি। ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী গান্ধীজিকে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার জন্যে বার বার অনুরোধ জানিয়েছিলাম কিন্তু অতীতের বহু নিষ্ফল আবেদনের মত আমার এ আবেদনও ব্যর্থ হয়েছে। এবং একথাও তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, যে ধরনের কমিটিই তিনি গঠন করুন, তার প্রতি থাকবে আমার অটুট আনুগত্য। কেননা পন্থ-প্রস্তাব কর্মে পরিণত করতে আমি বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য, মহাত্মাজি নতুন কমিটি গঠন করতে অপারগতা বোধ করেছেন।

"শেষ চেষ্টা হিসেবে ঘরোয়াভাবে সমস্যার সমাধানের জন্যে আমার সাধ্যমত যা করবার আমি তা করেছি। পুরোণো কমিটির প্রধানদের সঙ্গে আমি কোন প্রকার মীমাংসায় আসতে পারি কিনা তার জন্যে চেষ্টা করতে মহাত্মাজি আমাকে বলেছিলেন। আমি রাজী হয়েছিলাম। চেষ্টারও ত্রুটি করিনি। সফল হলে সম্মতির জন্যে রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্মুখে আমাদের আবেদন রাখতাম। পরিতাপের কথা, দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা আলোচনা করেও আমরা কোনও মীমাংসায় আসতে পারি নি। আর তাই আপনাদের সম্মুখে গভীর হতাশার সঙ্গে এই কথাই আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আমি নতুন কমিটি গঠন করতে অপারগ হয়েছি।

"সমিতির সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানকল্পে আমি কী এবং কতটা করতে পারি তা নিয়ে আগে থেকেই গভীরভাবে আমি ভেবে আসছি। বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে সভাপতির পদ আঁকড়ে থাকা রাষ্ট্রীয় সমিতির চলার পথে বাধা বা বিপত্তি বলে মনে হতে পারে। সমিতি এমন কমিটি গঠন করতে উন্মুখ হয়ে উঠতে পারেন যাতে আমার অবস্থিতি হবে একান্তই বিসদৃশ। আর কাউকে নতুন করে সভাপতি করলে হয়তো সকল সমস্যার সুমীমাংসা হলেও হতে পারে, এ কথাও আমার মনে উঠেছে। বিশেষ অনুধ্যানের পর, তাই, একান্ত সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমার পদত্যাগপত্র আপনাদের সকাশে উপস্থিত করলাম।

"আমার সময় খুবই সংকীর্ণ। আর তাই এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি রচনা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। তবুও আমি এই বিশ্বাসই করব যে, এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পরিস্থিতির বর্তমান রূপ স্পষ্ট করেই তুলে ধরেছে।

"বন্ধুগণ, এইবার সমিতির কাজ চালাবার জন্যে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করতে আমি আপনাদের অনুরোধ করব।" (১)

(১) কলকাতার এই সভার যাবতীয় দায়িত্ব ছিল সুভাষচন্দ্রের ওপর।

জ্বালা নেই। অভিযোগ নেই। নেই কারও প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ। প্রতি ছত্রে রয়েছে উদার, অকপট, নির্ব্যক্তিক বিচার আর মীমাংসার আগ্রহ। কিন্তু গান্ধী-গোষ্ঠী নির্বিকার। তাদের মনে এর কোনও আবেদনই রেখাপাত করতে পারেনি!

সভা হল নিস্তব্ধ। বিজয়ের উল্লাস বিরোধী পক্ষের গোপন অন্তর-কক্ষে পড়ে থাকল মূর্ছিত হয়ে। গান্ধী জিতলেন।

উনিশ

সারা কলকাতা থর থর করে কেঁপে উঠল সুভাষের অভ্যর্থনায়। জামাডোবা থেকে হাওড়ায় গাড়ী থামল সকালের দিকে। বৈরাগী বৈশাখের রুক্ষতা ছড়িয়ে পড়েছে রোদে পথে বাতাসে। জনতার পাঁচীল ঠেলে ভেতরে গেলাম। ছেলের দল কলরব করে ঘিরে দাঁড়াল। আমাদের গোষ্ঠীর অনেকেই আসেনি। আসেনি কেন তাও আমার অজানা ছিল না। কিরণশঙ্কর রায়কে ঘিরে নতুন দল গড়ে উঠেছে কলকাতায়; তথা বাংলায়। সভা বসে প্রায়ই ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটে। প্রথম দিকটা আমিও গেছি কয়েকদিন। তারপর আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পরিস্ফুট হয়ে উঠল ওদের পরিকল্পনা। গান্ধীর দলের দিকে রয়েছে সফলতার ইঙ্গিত। রয়েছে জয়ের ইসারা। সর্বোপরি ও-পথ নির্বিঘ্ন আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। এই দলের বিরুদ্ধে ঐ-যে একরোখা সংসারের ভালো-মন্দ জ্ঞানহীন দুরন্ত লোকটি রুখে দাঁড়িয়েছে, ওর সঙ্গে থাকবার সত্যিই কি আর কোনও সার্থকতা আছে? ওর সঙ্গে থেকে আর ওর ঐ অগ্নি-

কর্মব্যস্ত সুভাষচন্দ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আফিসে বসে সাদা কাগজে এই পদত্যাগ রচনা করেছিলেন।

দগ্ধ কপালের সঙ্গে কপাল মিলিয়ে দিলেই হয়েছে! ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা, প্রত্যক্ষ বর্তমানও ওর কালো হতে বসেছে। একটুখানি সমঝে চললে কতই না হতে পারত। ওর তো হতই, যারা ছিল ওর সঙ্গে, তাদেরও কি হতে বাকি থাকত? আদর্শবাদ আর দেশোদ্ধার বড় কথা সন্দেহ নেই কিন্তু তাই বলে সর্বনাশকেই ডেকে আনতে হবে? সর্বনাশের ডাক শুনে ওর উল্লাস জাগে। নিজের চরণে নিজের কল্যাণ দলে-পিষে ও চলে সর্বনাশের পথে। তাই ও-পথে আর নয়। বিজ্ঞের দল হাওড়ায় আসেনি।

কিন্তু মুষ্টিমেয় ঐ বিজ্ঞের দল ছাড়াও-যে রয়েছে অগুন্তি বোকা বোবা আর দেউলিয়ারা দেশ জোড়া, যারা বড় হতে চায় না, চাইলেও কোনদিন হয় না,—তারা? তারা এল ভিড় করে, দল বেঁধে, সারা সহর উজাড় করে। ফুলে-ঢাকা মোটরে উঠিয়ে দেওয়া হল নেতাকে। টেনে হিচড়ে নেতা পাশে বসিয়ে দিলেন আমাকে। গাড়ী চলল ধীরে। সন্তর্পণে। কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে গাড়ী থেমে গেল মানুষের চাপে। নেতা দাঁড়িয়ে আছেন গাড়ীর মাঝখানে। পাশের আমি ডুবে গেছি ফুলের চাপে। নেতার কোমর ছাপিয়ে উঠেছে ফুলে মালায় তোড়ায়। মুখের পাশ থেকে ফুল সরিয়ে কোনমতে বলে ফেললাম,—“এবার আমার ছুটি। আর পারছিনে—”

নেতা হেসে বললেন,—“ফুলের চাপেই?”

“এ ফুল নয়, রাষ্ট্রপতির বোঝা।”

“বোঝা হালকা হবার দেরি নেই।”

সুর কি গম্ভীর হয়ে উঠল? হয়ে উঠল অর্থপূর্ণ? ফিরে তাকালাম চোখ তুলে। পাশের মানুষটির চোখ ততক্ষণে চলে গেছে দূরে। জনতার বুকের ওপর। মুখ-ভরা স্মিত হাসি। বদ্ধাঞ্জলি ধ্যানী বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন।

* * * *

ওয়েলিংটন পার্কের কাজ তখনও শেষ হয়নি। সমারোহে চলছে

তখনও রাষ্ট্রীয় সমিতির কাজ। নেতার ডাকে আমরা গেলাম বউবাজারের একটা বাড়ীতে। বিভিন্ন প্রদেশের ছিলেন অনেকে। বাংলার ছিলেন আস্‌রাফউদ্দিন চৌধুরী, সত্যরঞ্জন বক্সী, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বাগচী, আরও কয়েকজন। ফরোয়ার্ড ব্লকের পত্তন হল। কায়া নয় তখনও,—কাঠামো।

ঋষি কবির বার্তা এল : "ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যেও অসাধারণ আত্মমর্যাদা ও ধৈর্যের যে-পরিচয় তুমি দিয়েছ, তার তুলনা নেই। তোমার নেতৃত্ব-শক্তিকে অভিনন্দন জানাই। বাংলাকে দীর্ঘদিন চলতে হবে এই পথে। তোমার আপাতঃ পরাজয় অবিনশ্বর বিজয়ের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।"

রোমাঞ্চিত দেহ। কম্পিত কণ্ঠ। অশ্রু-ভেজা দুটি চোখ। শোনা যায় না এমন অস্ফুট কণ্ঠে নেতা বললেন,—"আমাদের চলার পথের অক্ষয় সম্বল।"

৩রা সেপ্টেম্বর। খৃষ্টাব্দ ১৯৩৯। ইওরোপের বুকে জ্বলে উঠল দাবানল। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর। কাঁটায় কাঁটায় ছ'মাস। ছ'মাস পূর্বের ভবিষ্যৎ-বাণী। ফলে গেল অক্ষরে অক্ষরে। নেতা তখন মাদ্রাজে।

কিন্তু এর আগেই গড়ে উঠেছিল ফরোয়ার্ড ব্লক। বউবাজারের বৈঠকের পর আমাদের বৈঠক বসেছিল ব্রড্‌ওয়ে হোটেলে। সর্দার শার্দুল সিং আর লালা শঙ্করলাল থাকতেন ঐ হোটেলে। তাঁদের ঘরে বসল বৈঠক।

আর-আর পার্টির মতই ফরোয়ার্ড ব্লকও একটা পার্টি হবে কিনা, এর মীমাংসা তখনও হল না। নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র দল গড়তে নেতা প্রথমটায় চাননি। দেশের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে নানা ধরনের বামপন্থীরা। কেউ ঢুকেছে সোস্যালিস্ট পার্টিতে। কেউ কম্যুনিস্ট দলে। আবার ছুটকোও আছে অনেকে।

নতুন আর একটা দল এর মধ্যে গড়ে উঠেছে। রায়ের দল। এম, এন, রায়। পুরো নাম মানবেন্দ্র রায়। ওটা কিন্তু আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। আগের আসল নাম ছিল নরেন ভট্টাচার্য। গার্ডেন রীচের ডাকাতি-মামলায় ধরা পড়েছিলেন নরেন ভট্চায্। জামিনে খালাশ হয়ে গা ঢাকা দেন। তারপর একেবারে সাগরপার। অগুনতি বিপদ, ঝক্কি আর অদম্য সঙ্কল্প নিয়ে এই নির্ভিক বিপ্লবী নানা দেশ ঘুরে স্থান বেছে নিলেন রাশিয়ায়। বিচার ও বিশ্লেষণের অপূর্ব শক্তি, যুক্তি ও প্রদীপ্ত বুদ্ধির সমন্বয়ে দিনে দিনে এই আশ্চর্য মানুষটি বিশ্ব-রাজনীতি-ক্ষেত্রে অতি অল্পদিনের ভেতর শুধু নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠ করেই ক্ষান্ত রইলেন না, রাশিয়ার মত অমন কম্যুনিজ্‌মের মক্কাসরিফেও হয়ে উঠলেন একজন কেউ-কেটা। একেবারে ওদের চাঁইদের অন্তরঙ্গ ও অন্যতম। সেই এম, এন, রায়।

১৯৩০এ ভারতে ফিরে আসেন। গা ঢাকা দিয়েই কাটিয়ে দেন অনেকগুলি দিন। তারপর কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র-মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন দীর্ঘ ছ বছর। সেই এম, এন, রায়। সমুন্নত এক বিরাট দেহ। ঋজু। শ্যামলা রং। মস্ত বড় মাথাটা ভরতি একরাশ চুল। এলোমেলো। সাপের ফণা দোলে মাথার ওপর। রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান আর অর্থনীতি নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে ওঁর মগজের খোলে। অনেক তরুণের প্রাণ চঞ্চল হয়ে ছুটল ওঁর দিকে। কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি আর যুক্তির চাপে আসল মানুষটি গিয়েছিল হারিয়ে। ভারতবর্ষের,—বাংলার নরেন ভটচায নামটাই শুধু পালটাননি,—পাল্টে গিয়েছিল গোটা মানুষটাও ; যে-মানুষ ১৯৩৬এ দেখা দিলেন ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে,—দেশবাসী তাঁকে দেখল, বাণী তাঁর শুনল, কিন্তু গ্রহণ তাঁকে করতে পারল না নিজের বলে।

নেতা এদের প্রত্যেকটিকে বিচার করে দেখেছেন। ত্রুটী অনেকেরই আছে। গলদ নেই, তাও নয়। আছে। কিন্তু ত্রুটী আর গলদ বাদ দিয়ে মানুষ মিলবে কোথায়? আর মেলেও কি? মেলে না।

নেতা একথা জানেন। নিজেরও কি ত্রুটী নেই? অন্যের চোখে হয়তো অজস্র গলদ ধরা পড়ে। ত্রুটী গলদ আর ভুলের তুলাদণ্ডেই কি মানুষ চিরদিন মানুষকে করবে বিচার? করবে মূল্য নিরূপণ? নেতা একথা মানেন না। প্রসঙ্গ উঠলে বলেন,—"স্বামী বিবেকানন্দের ও-কথাটা আমার বড় ভালো লাগে। গরু চুরী করে না, মিছে কথাও বলে না। দেয়ালও তাই। কিন্তু গরু বা দেয়াল দেবতা হয় না। মানুষ অনেক অন্যায় করে,—আর সেই মানুষই হয় দেবতা।"

এদের দোষ সত্ত্বেও এরা বামপন্থী। বিপ্লবে বিশ্বাসী। আপোষ আর রফার ছোঁয়াচ থেকে থাকে তফাতে। হয়তো সবাইকে পাওয়া যাবে না কিন্তু যাদের পাওয়া যাবে, তাদের নিয়ে একটা সম্মিলিত বামপন্থী বহর যদি গড়ে তোলা যায়, তার শক্তি হবে অদম্য। নেতা মেতে ওঠেন।

অবিরাম চলতে থাকে নেতার সফর। সফর নয়,—অভিযান। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, নাগপুর, বম্বে আর মাদ্রাজ। বাংলা আর উড়িষ্যা তো আছেই। চলতে থাকে অভিযান একটানা। সময় আর নেই। ঘনিয়ে আসছে দুর্যোগ। ইংরেজের দুর্যোগ। আর তাইতো ভারতবর্ষের সুবর্ণ সুযোগ। দেশের নানা সমস্যা; আন্তর্জাতিক সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা আর থিয়োরীর সমস্যা। আছে আর থাকবেও। কিন্তু এই পরিস্থিতি আর সুযোগও কি থাকবে চিরদিন একই ভাবে? সরে যাবে না? রূপান্তরিত হবে না?

সব কথা চাপা দিয়ে একটি সমস্যাই, তাই, নেতার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। ভারতবর্ষের মুক্তি-সমস্যা। কোন প্রশ্ন নেই। সংশয় নেই। নেই কেন আর কী। যে দেশ ভারতবর্ষের একমাত্র শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, সেই হবে মিত্র। কোন ইজ্‌মের প্রশ্ন নেই। বড় বড় আদর্শের কচকচি আর চুল চেরা বিচার অনেক শোনা গেছে। শোনা গেছে অনেক সারগর্ভ বাণী। ওতে করে বন্ধন-শৃঙ্খল একতিলও ক্ষয় হয়নি। ভাবালুতা আর দর্শনের উচ্চাঙ্গ বিশ্লেষণ এগিয়ে নিতে পারেনি স্বাধীনতার পথে একচুলও। বড় কথা আর নয়।

কিন্তু সবাই ওরা,—যারা মুখে বলে স্বাধীনতা চাই, একথা মানে না। কথায় কথায় ওরা কেতাব খুলে বসে। কেউ কেউ খুঁটিতে বাঁধা। কেতাব ও বাদের খুঁটি। বাঁধা ওদের সত্তা। মনে জাগে মুক্তির প্রশ্ন কিন্তু বাধা দেয় থিওরী।

অনেকে নেতার সাথী হল। কিন্তু তাদের চাইতেও বেশি অনেকে পিছিয়ে গেল। উপায়ন্তর না দেখে নেতা ফরওয়ার্ড ব্লক গড়ে তুললেন। সেটা ছিল মে মাস।(১) একই সঙ্গে চেষ্টা চলল বামপন্থী সংহতির। সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট আর রায়দলের কাছ থেকে নেতা পেলেন আশ্বাস।

কিন্তু সভাপতির পদ নেতা পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও গান্ধী-গোষ্ঠী ভরসা খুব বেশি পেল না। স্বস্তিও কি ছিল? এর আগে রাজবন্দীদের মুক্তি প্রশ্ন নিয়ে যুক্ত প্রদেশ আর বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছিল। বাদ বাকি সবাই গদী আঁকড়েই থাকল। বিপদ দেখা দিল তাদের নিয়ে। সুভাষ বোসের অভিযান চলছে দ্বিমুখী। আসন্ন ইওরোপীয় যুদ্ধের সুযোগ নেবার কথা আর রেখে ঢেকে নয়। বলছেন প্রকাশ্যে। খোলাখুলি। প্রতিটি সভায় বলছেন। প্রতিটি সম্মেলনে প্রস্তাবাকারে উপস্থাপিত করে চলেছেন। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে দীর্ঘদিন যে প্রতিক্রিয়াশীল নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করে তুলেছে কংগ্রেসের মাতব্বর নেতারা, এদের হাত থেকে দেশ নিষ্কৃতি না পেলে সংগ্রামের মনোবল কি ফিরে আসবে? ফিরে না এলে ইংরেজের বুকে চরম আঘাত হানবেন কাদের নিয়ে? কেমন করে? নেতার সমালোচনা তাই তীব্র হয়ে উঠল এদের বিরুদ্ধে।(২)

গান্ধী-গোষ্ঠীও এই ভয়ই করে আসছিল। বড় দুঃখের পর এই মন্ত্রিত্ব জুটেছে ভাগ্যে। ঐ বদরোখা লোকটির চাপে অকালেই যাবে

(১) আনুষ্ঠানিকভাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের পত্তন হয় জুন মাসে। ২২শে জুন।

(২) একথাটা স্মরণ রাখতে হবে যে, বাংলা দেশের জলপাইগুড়ী সম্মেলনে

তা সাঙ্গ হয়ে ? বস্তুত এই ভয় থেকে এবং এই অবাঞ্ছিত অবস্থা না ঘটে এই কথা ভেবে রাষ্ট্রীয় সমিতি বম্বের অধিবেশনে গ্রহণ করল দুটি নতুন প্রস্তাব। একটিতে বলা হল যে, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অনুমোদন ছাড়া কোথাও সত্যাগ্রহ বা ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ সংগ্রামমূলক কোন আন্দোলন চালু করা চলবে না। দ্বিতীয়টিতে বলা হল যে, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস মন্ত্রীদের বিরুদ্ধাচরণ তো দূরের কথা সমালোচনাও করতে পারবে না। যে-সব প্রদেশে তখনও কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব বজায় ছিল, যে-কোন প্রকারে তাদের টিকিয়ে রাখতে হবে। নইলে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে। মন্ত্রিত্ব কংগ্রেসকে শক্তিশালী করেছে, প্রাণবান করেছে, সংগ্রামমুখী করেছে। এই বিপন্ন মিথ্যাচরণ সেদিনের কংগ্রেস-নেতৃত্ব বরণ করে নিয়েছিল আত্মরক্ষার দুর্বার আগ্রহে। কিন্তু সেদিন ঐ-সব নেতারা এই সহজ কথাটিই ভুলে গিয়েছিল যে, চিরকাল সকলকে মিথ্যার স্তোকে ভুলিয়ে রাখা যায় না। প্রতিবাদের ঝড় বহে গেল সারা দেশের বুকে। ঘোর সে প্রতিবাদ রূপপরিগ্রহ করে মূর্ত হয়ে উঠল সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে।

সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট, রায়পন্থী র‍্যাডিক্যালরা সবাই সমর্থন করল

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে ছ'মাসের সময় দিয়ে চরমপত্র দেবার এবং ওটা কার্যকরী না করলে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। বাংলা দেশ এসম্বন্ধে তৎপর ও উৎসাহী হয়ে উঠেছিল।···সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ত্বরান্বিত করতে বাংলা চাইছিল। কংগ্রেসের কর্তারা পাছে সরকারের সঙ্গে আপোষ করে ফেলেন একথা ভেবে বাঙ্গালীর দুর্ভাবনাও কম ছিল না। সোজাসুজি তারা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। এছাড়া ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারেও সত্যাগ্রহের হুমকি ছিল। একদিকে আটটা প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব চালাবে, আর তাদেরই কোন-কোনটায় চলবে সত্যাগ্রহ, কংগ্রেসের পক্ষে এ অবস্থা ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া আর কী হতে পারে ?

—ডাঃ পট্টভি প্রণীত কংগ্রেসের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ১১৫ পৃঃ।

নেতার প্রতিবাদ। ৯ই জুলাই সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস বলে পালন করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।(১)

গান্ধী-গোষ্ঠী এই ধরনের সুযোগের প্রত্যাশা সেদিন করেছিল কিনা নিশ্চয় করে একথা বলা না গেলেও নিঃসংশয়ে একথা বলা চলে যে, তারা এ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এক মুহূর্ত সময়ও বৃথা নষ্ট করেনি। সুভাষ বোস সভাপতিত্ব ছেড়েছেন, কিন্তু তার ফলে হতমান হওয়া দূরের কথা তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ও আকর্ষণ শতগুণ বেড়ে গেছে। একথা ওরা জানে। বুঝতেও পারে। আর তাই দুশ্চিন্তারও ওদের অবধি নেই।(২)

সভাপতির পদ যেন-তেন প্রকারেণ আঁকড়ে বসে থাকলে চার-পাশের ঐ-সব সদা-সতর্ক প্রহরীর দল,—প্যাটেল-প্রসাদ-বাজাজ-রাজার দল তাঁকে রেহাই দিত না কোন ক্রমেই। রাশ টেনে রাখত নিজেদের হাতে। ওদের নির্বাচিত আর নির্ধারিত পথে চলতে বাধ্য করত। বাধ্য করত ছলে বলে কৌশলে। আজ তিনি মুক্ত। বেপরওয়া। দুর্বার। তাই তিনি অবাঞ্ছিতও। ক্ষীণতম বিচ্যুতিও তাই সেদিন বড় হয়ে দেখা দিল। বসল মন্ত্রণা সভা। বিচার হল ভারতীয় কংগ্রেসের দু'বার নির্বাচিত ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতির। কৈফিয়ৎ চাওয়া হল অপরাধীর। অপরাধী উত্তর দিলেন নব নির্বাচিত সভাপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদকে ৭ই আগষ্ট, ১৯৩৯।

"রাঁচি থেকে লেখা আপনার ১৮ই জুলাইএর চিঠির উত্তর দিতে

---

(১) মুহূর্তে এম, এন, রায় লেফ্‌ট্ কন্‌সোলিডেশন্ কমিটি পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের আদেশ শিরোধার্য করেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল্, ১৯৩৫—'৪২, ৮৮ পৃঃ।

(২) প্রকৃতপক্ষে কয়েকমাসের মধ্যেই মহাত্মা মন্তব্য করেছিলেন যে, লেখকের (সুভাষের) জনপ্রিয়তা সভাপতির পদ পরিত্যাগ করবার পর অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল, ১৯৩৫-'৪২, ২৭ পৃঃ।

দেরি হল বলে আমি খুবই দুঃখিত। বঙ্গের ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদে আমি যা করেছি তার কৈফিয়ৎ তলব করেছেন আমার কাছ থেকে।

"প্রথম, কোন প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানানো এবং ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ বা প্রস্তাব-বিরুদ্ধ কোন কাজ করবার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মনোভাব জানানো ছাড়া আর কিছু আজ পর্যন্ত আমি করিনি।

"ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গ্রহণ-করা কোন প্রস্তাব সম্পর্কে আমার মনোভাব জানাবার আইনসঙ্গত অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি। সমিতির প্রতিটি অধিবেশন শেষ হবার পর বহু কংগ্রেস সভ্যই চিরদিন অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রকাশ্যে বলে আসছেন। যদি কংগ্রেস সভ্যদের এ-অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়,—প্রস্তাবের সমর্থনেই শুধু মত দেওয়া চলবে, আর বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হবে আইনবিরুদ্ধ, এ-কথা বলা সঙ্গত হবে কি? আপনার চিঠি পড়ে কিন্তু আমার এই কথাই মনে হল যে, বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করাই আপনি বন্ধ করতে চান।

"এতদিন আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যে-সব অধিকার আদায় করতে লড়াই করেছি, তাদের মধ্যে নাগরিক অধিকার অর্জন করাও অন্যতম। বাক্যের স্বাধীনতাও নাগরিক অধিকারের অন্তর্গত। কংগ্রেসের বা রাষ্ট্রীয় সমিতির সংখ্যা-গরিষ্ঠদের কথা বা কাজের সমর্থন করতে না পারলে আমাদের সংখ্যা-লঘুদের বাক্যের এই মৌল অধিকার,—স্বাধীনতার অধিকার দাবী করবার উপায় নেই,—আপনার বক্তব্য দাঁড়াচ্ছে এই প্রকার।

"ইংরেজের কাছ থেকে যে অধিকার দাবী করবার বেলায় আমরা পঞ্চমুখ, কংগ্রেস বা তার অন্তর্গত কোন সংস্থার কাছ থেকে সে অধিকার পাবার কথা বলা হবে মহাপাপ। দেশের অহিতকর বলে মনে করলেও রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবের সমালোচনার অধিকার থেকে আমাদের

বঞ্চিত করবার পরও কি ডেমোক্রাসী অক্ষুণ্ণই থাকবে ? আমি আপনাকে একান্ত গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই : ডেমোক্রাসীর দাবী চিরদিনই কি আমরা উত্থাপন করব কংগ্রেসের বাইরে ?—ভেতরে নয় ?

"রাষ্ট্রীয় সমিতি যদি কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করে, সমিতির পরবর্তী অধিবেশনে সে প্রস্তাব সমালোচিত, সংশোধিত, পরিবর্তিত, এমন কি পরিত্যক্তও হতে পারে। আর তা করবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের, সমিতির সভ্যদের আছে ; আমার বিশ্বাস আমার এ-কথার সঙ্গে আপনি একমত হবেন। আমার এ-কথার সঙ্গেও সম্ভবত আপনি একমত হবেন যে, রাষ্ট্রীয় সমিতির কোন সিদ্ধান্ত যদি আমাদের মনঃপূত না হয়, মূল প্রতিষ্ঠান ভারতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঐ সিদ্ধান্ত নাকচ বা পরিবর্তন করবার আবেদনও আমাদের মৌল অধিকার। আরও একটা কথা সম্পর্কে আশা করি আপনার দ্বিমত হবে না যে, প্রচার দ্বারা সংখ্যা-গরিষ্ঠদের ভেতর থেকে নিজেদের সমর্থক-সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করার অধিকার সংখ্যালঘুদের চিরদিনই বর্তমান।

"কংগ্রেস আজ আর মুষ্টিমেয় লোকের সংস্থা নয়। এর সভ্যসংখ্যা, আমি যতদূর জানি, ৪৫ লক্ষের কাছাকাছি। কংগ্রেসের সর্বস্তরে আমাদের বক্তব্য সংবাদপত্র এবং জনসভার মাধ্যমেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর। অবশ্য যদি আপনার অভিমত এই হয় যে, রাষ্ট্রীয় সমিতি একবার কোন প্রস্তাব গ্রহণ করলে তা হবে অলঙ্ঘ্য এবং তাকে মনে করতে হবে বেদবাক্য বলে, তাহলে রাষ্ট্রীয় সমিতির বিরুদ্ধে সমালোচনার গলা টিপে ধরবার অধিকার নিশ্চয়ই আপনার আছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাব পরবর্তী অধিবেশনে কিম্বা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে পরিবর্তিত, সংশোধিত, সংযোজিত বা পরিত্যক্ত হতে পারে, এ অধিকার স্বীকার করে নেবার পর কেমন করে বিরুদ্ধ-সমালোচনার পথ রুদ্ধ করা যেতে পারে তা আমার ধারণা বহির্ভূত।

"শৃঙ্খলা শব্দটির যে ব্যাখ্যা আপনারা করে থাকেন আমি তাতে সায় দিতে পারছিনে। নিজেকে একজন কঠোর নিয়মানুবর্তী ও শৃঙ্খলা-পরায়ণ বলে মনে করা সত্ত্বেও এ-কথা আমি নিশ্চয়ই বলব যে, শৃঙ্খলার নামে আপনারা সুস্থ সমালোচনার গতিরোধ করতেই বেশি উৎসুক। শৃঙ্খলা কোনও মানুষকে তার স্বাভাবিক ও মৌল বিধিসম্মত ও লোকমতগ্রাহ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না।

"অধিকারের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও যে-প্রস্তাব আমরা দেশের অহিত-কর বলে মনে করি, তা যদি সত্যিই কার্যকরী করে তোলবার চেষ্টা অবলম্বিত হয়, তার ফল কী দাঁড়াবে? সমগ্র দেশ কি আরও বেশি নিয়মতান্ত্রিক পথে দ্রুত গড়িয়ে যেতে চাইবে না? কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দুর্বল করে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ-প্রাদেশিক-মন্ত্রীদের প্রভাব শক্তি ও প্রভুত্ব দৃঢ়তর করা হবে না? কংগ্রেস ও জনসাধারণ, রাষ্ট্রীয় সমিতি ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান রচনা করে কোন্ মঙ্গল সাধিত হবে? সর্বোপরি এতে এতকালের কংগ্রেস অনুসৃত বিপ্লবী পন্থাকে করে তোলা হবে নিস্তেজ। কাজেই দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রীয় সমিতি গৃহীত ঐ দুটি প্রস্তাব স্থগিত রাখা অবশ্য কর্তব্য এবং পরবর্তীকালে হয় ও-দুটোর প্রয়োজনীয় সংশোধন অথবা একেবারেই ওদের বর্জন করতে হবে।

"এই প্রসঙ্গে ১৯২২এর গয়া কংগ্রেসের সময়কার এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে আমি পারছিনে। সেই সময় স্বরাজ পার্টি যা করেছিল, তা ভুলে না-যেতে আমি আপনাকে অনুরোধ করব। একথাও দয়া করে ভুলবেন না যে, গয়া কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সংশোধিত হয়ে গৃহীত হল পরবর্তী রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে। আর গুজরাট প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সে-প্রস্তাব উপেক্ষা করবার জন্যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

"এইবার আমার শেষ কথা: আমার যতদূর মনে পড়ছে, মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' লিখেছিলেন যে, সংখ্যা-লঘুদের বিদ্রোহ করবার

অধিকার আছে। বিদ্রোহ আমি করিনি। আমাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও দলে-ভারীরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তারই সমালোচনা করবার অধিকারটুকুই বোঝাতে চেয়েছিলাম মাত্র।

"আমাদের মৌলিক অধিকার নিয়ে আপনারা এমন একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন, এতে আমাকে সত্যিই বিস্মিত করেছে। আমার বিশ্বাস, আমার জবানবন্দী আপনার মনঃপূত হবে। যদি না হয় এবং যদি আপনারা শাস্তি দেবার সংকল্প গ্রহণ করেই থাকেন, একটা সাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে হাসিমুখে সে-দণ্ড আমি মাথা পেতে নেবো।

"উপসংহারে আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবো যে, ৯ই জুলাইএর ঘটনার জন্যে যদি কোন কংগ্রেসসেবীকে দণ্ড ভোগ করতেই হয়,—আমি যেন তা থেকে বঞ্চিত না হই। ৯ই জুলাইএর সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস পালন করায় যদি অপরাধ হয়েই থাকে,—আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে, আমিই সর্বপ্রধান অপরাধী। নমস্কারান্তে নিবেদন ইতি—

ভবদীয় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।"

অতীত মৃত একথা সত্য। কিন্তু সব অতীত মরে না। মাঝে মাঝে ওরা জ্যান্ত হয়ে দেখাও দেয়। মরা-অতীত আর-একবার জীবন্ত হয়ে দেখা দিল জাতির চাক্ষুস ইতিহাসের পাতায়।

কৈশোর সবে উত্তীর্ণ। যৌবনের শুভারম্ভ। প্রেসিডেন্সী কলেজের সুভাষচন্দ্র বসু। শুধু একজন ছাত্র। অনেক ছাত্রের একজন। সেদিনও সেই বয়ঃসন্ধিক্ষণে অনাগত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সকল গ্লানি আর লাঞ্ছনার পঙ্কতিলক মুছে দিয়ে পুরিয়ে দিয়েছিল ঐ কুন্দ-শুভ্র ললাটের মধ্যভাগে এক বিচিত্র ও পরম অগ্নিতিলক। মুহূর্তে পারি-পার্শ্বিকতা অতিক্রম করে বহুর ভেতর থেকে আবির্ভাব হল একটির। একটি ছাত্রের। বহুর তথাকথিত অপরাধের গ্লানি আর দণ্ড নীল-কণ্ঠের মত একা ধারণ করে হয়ে উঠল সেইক্ষণে সেই নবাগত একজন অনন্য। অসামান্য।

প্রতিবাদকারীর ভেতর স্বামী সহজানন্দ ছিলেন। ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। ছিলেন আরও কত সোস্যালিষ্ট আর কম্যুনিষ্ট। সকলের ভেতর থেকে অতুল্য তুটি সবল বাহু প্রসারিত করে আড়াল করে দাঁড়ালেন নেতা আর-সব সহকর্মীদের। ওয়ার্ধার গান্ধী-আশ্রমে বসে সেদিনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা বিচার কার্য সমাপ্ত করে এই আত্ম-প্রসাদ নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল যে, শত্রুকে তারা চরম দণ্ড দিয়েছে। দীর্ঘ তিন বৎসরের জন্যে কংগ্রেস থেকে নির্বাসন। সেদিনের ওয়ার্কিং কমিটির হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না। থাকলে সুভাষচন্দ্রকে ওরা দেশ থেকে নির্বাসিত করত।

তুঃখের আগুন যাকে পোড়াল না, বড় হবার সম্ভাবনাও তার জুটল না। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে ইংরেজের অবিশ্রান্ত উদ্ধত অবিচার সুভাষচন্দ্রকে বড় করেছে, গৌরব দিয়েছে, অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারী করেছে। কিন্তু জাতির মিথ্যা প্রতিনিধিত্বের অন্ধ অহঙ্কারে ক্ষিপ্ত হয়ে ঈর্ষাদগ্ধ ও স্বার্থগৃধ্নু দলীয় চক্র যেদিন তাঁকে দেশের ও জাতির বুক থেকে উৎসাদনের স্বপ্ন দেখছিল, সেইদিন আর সেইক্ষণে এক অচিন্ত্য নবতম পথের ইঙ্গিত ওরা এই নির্যাতিত মানুষটির কানে কানে বলে দিয়েছিল,—ইতিহাসের এই পরম সত্য তত্ত্ব ওরা কোনদিনই ধরতে পারেনি। কিন্তু ওরা ধরতে না পারলেও ইতিহাসের চক্ষে তা অজ্ঞাতও রইল না। কংগ্রেসের ভেতর থেকে সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক দেশের মুক্তি সংগ্রামে কংগ্রেসকে করে তুলবে শক্তিশালী, তীব্র ও তৎপর, নেতার এ-কামনা অপূর্ণই রয়ে গেল।—ইংরেজের ইচ্ছায় নয়, কংগ্রেসের কর্ণধার গান্ধী-গোষ্ঠীর পরিকল্পনায়। কিন্তু কংগ্রেসের বাইরে যে-মুমুক্ষু ভারতবর্ষ তার সহস্র বৎসরের জ্বালা ও অবমাননার মৌন বেদনা নিয়ে অপেক্ষা করছিল, স্নেহ ও মমতার অফুরন্ত ধারা উজাড় করে ডেকে নিল সেই ভারতবর্ষ তার এই তুরন্ত, মুক্তি-পাগল পুত্রটিকে একান্ত ও পরম আকিঞ্চনে।

লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা। অপার অগাধ নীলাম্বু-ধোয়া বেলাভূমি

ভরে গেছে। ভরে গেছে উবুচুবু। সমুদ্র সৈকত। মাদ্রাজের তীরভূমি। উদ্‌গ্রীব জনসমুদ্র দাঁড়িয়েছে সমুদ্রের কোলে। রুদ্ধ আক্রোশ ফুঁপে উঠছে বুকের প্রত্যন্ত থেকে। উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ডুবে যায় নেতার ভাষণ। কী হবে কথা শুনে? কথা জ্যান্ত হয়ে ওঠেনি? আর রূপ নিয়ে ধরা দেয়নি চোখের সামনে? কথা ওরা শুনেছে ঢের। আর রকমারি। কিন্তু মানুষ? এ-মানুষ কি অনেক দেখেছে? বড় কথার চাইতে এ-মানুষ অনেক বড় না?

সভার মাঝখানে সহসা বার্তাবহ বার্তা হাতে তুলে দেয় নেতার। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে নিঃশেষ নিস্তব্ধতার মধ্যে। উদ্‌গ্রীব জনতা স্থির হয়ে গেছে তখন। পলকহীন দৃষ্টি ওদের নিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করে নেতার স্তব্ধ গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে।

কথা ফোটে কণ্ঠে। ইওরোপের বুকে আগুন লেগেছে। নরমেধ যজ্ঞের আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। লক্‌লকে জিহ্বা ওর আকাশচুম্বী। আর কথা নয়। কথা হয়ে উঠল বাণী। সত্তা হল বাঙ্‌ময়। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সমস্ত দেহ।

দুটি কলুষ-কঠিন সাঁড়াশি আঁকড়ে ধরেছিল অতি দীর্ঘদিন ভারত-বর্ষের কণ্ঠনালী। শ্বাসরুদ্ধ করে ওকে মারতে চেয়েছিল। সাঁড়াশি আগুনে পুড়ছে। ধীরে,—অতি ধীরে বজ্রমুষ্টি শিথিল হতে শুরু করেছে। খসে পড়বে সাঁড়াশি। নিঃসন্দেহে। একটা ঝাঁকির অপেক্ষা মাত্র। তারপর, নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়ানো। মৃত্যু ভীতি-মুক্ত স্বাধীন মহাভারতের ভাস্বর রূপ চোখ ধাঁদিয়ে দেয় নেতার। ইংরেজের আর ত্বর সইল না। ইংলণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের ভারতবর্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মেনীর বিরুদ্ধে। কোথায় জার্মেনী আর কোথায় ভারতবর্ষ! তবু যুদ্ধে তাকে নাবতেই হবে। ইংরেজের খাস তালুক ভারতবর্ষ না?

ভারতবর্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করল কিন্তু ভারতবর্ষ জানল না সে-কথা। জানল না কংগ্রেস। জানল না তেরটা প্রদেশের মন্ত্রীরা। জানল না

কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্ব্লী। সঙ্গে সঙ্গে অর্ডিন্যান্স জারি হল। আভ্যন্তরিক শান্তি বজায় না রাখলে ভারতবর্ষের কল্যাণ হবে কীসে? কেমন করে?

৬ই তারিখ বড়লাট লিন্‌লিথগো ডেকে পাঠালেন গান্ধীকে। গান্ধীজি প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন আর কি! ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবে, পারলিয়ামেন্ট গৃহ আর সেন্টপল গির্জার ওপর বোমা পড়বে। চূর্ণ হয়ে যাবে ঐ-সব ঐতিহাসিক স্মৃতি স্তবক। একথা ভেবে গান্ধী অস্থির হয়ে উঠলেন। ইংরেজকে প্রদান করলেন অকুণ্ঠ সহযোগিতার আশ্বাস।(১)

১৯২৭ থেকে কংগ্রেস বার বার ঘোষণা করেছে ভবিষ্যৎযুদ্ধ সম্পর্কে তার সংকল্পের কথা। ১৯১৪র কথা ভারতবর্ষ ভোলেনি। সহযোগিতা সেদিনও সে অঙ্গীকার করেছিল। প্রতিদানে পেয়েছিল জালিনবালা-বাগের হত্যাকাণ্ড, রাউলট্ এ্যাক্ট আর হাজারো রকমের পুরস্কার। আর না। ও-পথে আর তাই সে যাবে না। বিন্দুমাত্র সহানুভূতি সে ইংরেজের প্রতি দেখাবে না। বিনা কারণে ভারতবাসী বুকের রক্ত ঢেলে ভিজিয়ে দেবে ইওরোপের রণাঙ্গণ, অর্থ আর সামর্থ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে ইংরেজের অস্তিত্ব, তার সাম্রাজ্যের স্তম্ভ রাখবে অক্ষুণ্ণ, আর তারই বিনিময়ে তাকে পড়ে থাকতে হবে আরও কত দীর্ঘদিন ইংরেজের পায়ের তলায়। এই দুঃসহ কৃতঘ্নতার সহযোগী সে আর হবে না।

কংগ্রেসের জাঁদরেল নেতারা অতীত বেমালুম ভুলে গেল। প্রাণ তাদের বিগলিত হয়ে উঠল ইংরেজের বর্তমান দুঃখে। ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের কথা ভেবে। ভাষার কারচুপি, কারসাজি আর যাদুকরী খেলার প্যাঁচালো কথা বেরোতে থাকল নেতাদের কণ্ঠ চিরে। ইংলণ্ড হল ডেমোক্রাসীর স্রষ্টা, ফ্রান্স স্বাধীনতার পূজারী।

(১) ডাঃ পট্টভির কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১২৫ পৃঃ

দানব জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে দেবসেনারা,—এমনি কত কথাই-না শোনা গেল। দেবসেনার পক্ষ না নিলে আধ্যাত্মিক সনাতন ভারতবর্ষের নেতৃত্ব জগতের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে ?(১)

১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসল ওয়ার্ধায়। গান্ধী সুভাষকে নিমন্ত্রণ পাঠালেন সভায় যোগ দিতে। দণ্ডিত অপরাধী সুভাষ। সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমন্ত্রণ জানাননি,—জানিয়েছেন গান্ধীজি। তবে কি নেতার প্রতি এই দণ্ডাদেশে গান্ধীর অনুমোদন ছিল না ? ছিল না স্বীকৃতি ? গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির সে-অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। সীমান্ত প্রদেশে গিয়েছিলেন সফরে।

মান নেই, অভিমানও নেই। অমানিনা মানদেন,—বাংলার ঠাকুর-না বলেছেন মানের গোড়ায় ছাই দিতে ? তাই দিয়ে নেতা ছুটে গেলেন ওয়ার্ধায়।

ফিরে এসে বলেছিলেন,—"ওঁর ওপর রাগ আমার হয় না, তা নয়। হয়। কিন্তু সে-রাগ আমি পুষে রাখতে পারিনে। হাসি আর স্নেহ দিয়ে মুহূর্তে আমাকে ভুলিয়ে ফেললেন।"

ওয়ার্ধা আশ্রমে চাএর পাট ছিল না। কিন্তু কঠোর গান্ধী

(১) ১৯৪০এর কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখছেন,—India must have no hesitation in aligning herself with the democratic powers. (ভারতবর্ষ অবশ্যই গণতান্ত্রিক দেশগুলিকেই সমর্থন করবে)। বলাবাহুল্য 'গণতান্ত্রিক' অর্থে মৌলানা নির্দেশ করেছেন ইংলণ্ড আর ফ্রান্সকে। ইণ্ডিয়া উইন্‌স ফ্রীডম,—৩১ পৃঃ

ডাঃ পট্টভি তাঁর ইতিহাসে লিখছেন,—বিবদমান দুই দলের মধ্যে প্রথমোক্ত দলের (ইংলণ্ড ও ফ্রান্স) দিকেই ছিল কংগ্রেসের সহানুভূতি।—কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড ১৩৫ পৃঃ

মহাত্মা গান্ধী সিমলায় বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে এক বিবৃতিতে বলেন,—"আমি মহামান্য বড়লাটকে জানিয়েছি যে, আমার সহানুভূতি সম্পূর্ণ ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের দিকে।"

সুভাষের চা-প্রীতি কখনও ভোলেননি। পরিচ্ছন্ন একখানা ঘরে ওঁকে থাকতে দেওয়া হত। ঘড়ি ধরে আসত চা। আসত রুটি মাখন। আসত নিয়মিত। দুবেলা।

মহাত্মাজির ঘরে হয়েছিল সভার স্থান। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে নেতাকে ডেকে পাঠান গান্ধীজি। অনেকক্ষণ ধরে কথা হল দুজনের মধ্যে। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন গান্ধী সুভাষের যুক্তি।

গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী নেতার অজানা নয়। সবই জানেন। আর বোঝেনও। অনেক ক্ষেত্রে আর অনেক বিষয়ে গান্ধীর কথায় নেতা সায় দিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে গান্ধী তাঁর কাছে খুব বেশি দুর্বোধ্য নন। অনেকে কেন, তিনি নিজেও কি নির্মম হয়ে গান্ধীর সমালোচনা করেননি? করেছেন। বর্তমানকেও তিনি রেহাই দেবেন না। প্রয়োজন হলে বার বার তিনি গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। দাঁড়াবেন কঠোর হয়ে। তবু তাঁর অবদান তিনি অস্বীকার করবেন কেমন করে? তাই কোনদিনই গান্ধীকে তিনি তুচ্ছ করে দেখেননি। তাচ্ছিল্যও করেননি। তাঁর অহিংসা আর সত্যের প্রতি অবিচল আগ্রহ গান্ধী-স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। দেশের স্বাধীনতা গান্ধীরই কি কম কাম্য? কিন্তু স্বাধীনতার ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবিকতার সার্বভৌম আবেদন রয়েছে ওঁর কণ্ঠে। নিজের দেশ আর জাতির কল্যাণ-স্বার্থ অতিক্রম করে ওঁর দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে দূরে,—অনেক দূরে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী ইংরেজকে সহযোগিতা আর সহানুভূতির আশ্বাস দিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্রকেও গান্ধী সবটা না হলেও অনেকটা বুঝে নিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, আদর্শ ও কর্মপন্থার অনেক-কিছুই গান্ধী সমর্থন করতে পারেন না সত্য, কিন্তু এই সবের পেছনে এই নির্ভিক মুক্তি-উপাসকের সমগ্র হৃদয়খানি যে অপার অগাধ দেশ-প্রেমে ভরপুর হয়ে আছে, তাও তো গান্ধীর অজানা নয়। তাই দণ্ডিত অপরাধী জেনেও গান্ধী সুভাষকে ভুলতে পারেন না। তাই জাতির এত বড় আসন্ন দুর্দিনে সুভাষকে না-ডেকে তিনি থাকতে পারেননি।

ওয়ার্ধায় পা দিয়েই নেতা বুঝে নিয়েছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে চলছে এক বিরাট আলোড়ন। ওদের মনে জন্মেছিল সংশয়, দ্বিধা আর খানিকটা ভীতিও। গান্ধী-নেতৃত্বের অন্তরালে সারা জীবন কাটিয়ে এই সব মাতব্বর নেতাদের আপন বুদ্ধি ও সিদ্ধান্তের ওপর প্রত্যয় করবার অবকাশ কোনদিন দেখা দেয়নি। নিজেদের এমন-কোনও শক্তি-সচেতনতাও ছিল না যার দ্বারা গান্ধী ছাড়া স্বতন্ত্র পথে এরা চলতে পারে। তাই প্রতি পদে মনে জাগত এদের সংশয়, দ্বিধা আর ভীতি। মাতব্বরদের মধ্যে এক জহরলালেরই খানিকটা স্বাতন্ত্র্য-বোধ ছিল। তাই সেদিন জহরলাল নতুন কোনও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে নয়, নিছক চিন্তা রাজ্যে একটু স্বতন্ত্রভাবে ভাবতে চেয়েছিলেন। এবং কংগ্রেস তথা দেশকে এগিয়ে না দিয়ে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য-শক্তি দ্বারা কংগ্রেসের অগ্রগতি স্তব্ধ করে রেখেছিলেন কয়েকটা বছর। কিন্তু এ-সব পরের কথা।

কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রকে অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে সেদিন জহরলালের মনের কোনে এক দূর প্রসারী আকাঙ্ক্ষার নবজন্ম হয়। চলতে থাকে মনের মধ্যে এক বিপুল দ্বন্দ্ব। ত্রিপুরী এবং তার পরবর্তী ভূমিকায় জহরলালকে দেখতে পাওয়া যায় নিছক গান্ধীর প্রতিচ্ছায়া রূপে। কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। পার্থক্য নেই। নেই কোন নিজস্বতা। সুভাষ-চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সংক্রামকতা সেদিন জহরলালকে কেমন করে বা কতখানি উত্তেজিত করেছিল, হয়তো বলতে পারার মত দলীল কোনদিনই মিলবে না, কিন্তু নির্বিচারে গান্ধীজিকে অনুসরণ ও স্বীকার করতেও-যে সেদিন থেকে জহরলাল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রমাণেরও অভাব নেই।

নিঃসর্ত সহযোগিতা, সর্তাধীন সহযোগিতা আর প্রত্যক্ষ বিরোধিতা, —মূলতঃ এই তিনটি প্রস্তাব ও প্রশ্নই ছিল সেদিনের সবচাইতে বড় কথা। অল্প-বিস্তর সব কংগ্রেসসেবী আর মুক্তিকাম দেশবাসীর মনে এই কটি কথাই দেখা দিয়েছিল প্রত্যক্ষ হয়ে। প্রথম থেকেই গান্ধী

তাঁর জীবন-দর্শনের ছকে ফেলে যুদ্ধের পরিণাম ভাবতে চেয়েছিলেন। কোন অবস্থা বা কারণেই যুদ্ধ তিনি চান না। সে স্বাধীনতার জন্যেও নয়। সেদিন শুধু ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনকেই যুদ্ধ পরিহার করবার অনুরোধ তিনি জানাননি, হিটলারকেও চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আর জীবন-দর্শনের এই আদর্শই তাঁকে বলিয়েছিল,—"ইংরেজকে যদি সাহায্যই করতে হয়, তা করতে হবে নিঃসর্তে।"

কিন্তু জহরলালের যত গান্ধী-ভক্তি ছিল, ঠিক ততটা গান্ধী-দর্শনের প্রতি প্রীতি ছিল না। অনুরক্তি তো নয়ই। সুভাষচন্দ্রের স্পষ্ট, দ্বিধাশূন্য শাণিত কল্পনা তাঁর পক্ষে না ছিল স্বাভাবিক, না ছিল সম্ভবপর। কিন্তু গান্ধীর রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় আধ্যাত্মিকতাও ছিল তাঁর ধারণা বহির্ভূত।

ইংরেজী ভাব, সাহিত্য, দর্শন আর বাল্য ও যৌবনের শিক্ষা তিনি কোনদিনও ভুলতে পারেননি। ভোলা তাঁর পক্ষে সম্ভবপরও নয়। ঘটনার চক্রান্তে রাজনীতির ডামাডোলে নিজেকে সঁপে দিয়ে দীর্ঘদিন আর তার চাইতেও দীর্ঘপথ তিনি অতিক্রম করেছেন। অভিজ্ঞতার সঞ্চয় জমে উঠেছে। ভবিষ্যৎ দেখবার মত পেয়েছেন দৃষ্টি। এই সঞ্চয় ও দৃষ্টি তাঁকে সাবধানী করেছে। করেছে বাস্তব পন্থী।(১)

তাই তিনি অনায়াসেই বল্‌তে পারলেন ;—

"There were some people, of course, who thought that England's difficulty and peril were India's opportunity. But the leaders of the Congress were definitely opposed to any

(১) জহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন,—"ব্যক্তিগতভাবে আমি ইংলণ্ডের কাছে আমার মানস-ভন্ডার জন্যে এত বেশি ঋণী যে, ইংরেজকে পর ভাবা আমার পক্ষে একটু কষ্টকর বইকি।...(রাজনীতির বাইরে) আমার মনের অনুরক্তির সবটাই ইংলণ্ডের দিকে আর ইংরেজের জন্যে এবং আজ যে আমি, যাকে বলে ইংরেজ শাসনের আপোষহীন বিরোধী, সেটাও ঘটেছে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।"

such advantage being taken of a situation full of disastrous foreboding for England and declared so publicly." (১)

অর্থাৎ এমন মূঢ়জনও ছিল যারা দুর্গত ও বিপন্ন ইংরেজের বিপদ ও দুর্যোগের সুযোগ নিতে লালায়িত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর মত উদার পন্থী কংগ্রেস নেতারা তা ভাবতেও চাননি।

এই উচ্চাঙ্গের ইংরেজ প্রীতির অদম্য উচ্ছ্বাস আর তাঁরই খসড়া-করা সর্তাধীন সহযোগিতার আমন্ত্রণ জানিয়ে সেদিন জহরলাল ও তাঁর সমর্থকেরা বিপন্ন ইংরেজকে চাপ দিয়ে কৌশলে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আদায় করবার যে বুদ্ধি-প্রাখর্য দেখিয়েছিলেন, কেমন করে একই সঙ্গে এই পরস্পর বিরোধী দুটি কথা ও ভঙ্গীর সমন্বয় সম্ভবপর হল, সে কথাই বিচার্য।

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী ভাবের ভাবুক জহরলাল ছিলেন ইংরেজের মতই দোকানদারী মনোভাবের পূজারী। গান্ধীকে বাদ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করবার শক্তি ও সাহস তাঁর ছিল না। নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতার অন্তরালে, তাই, সেদিনের জহরলাল বেছে নিয়েছিলেন এই কপট ও দ্ব্যর্থক ভূমিকা। তাঁর চরিত্রের এই দ্বিমুখী অভিব্যক্তি সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারেননি। এক বিবৃতিতে গান্ধী বলেছিলেন,—

"The author of the statement is an artist. Though he can not be surpassed in his implacable opposition to Imperialism in any shape or form, he is a friend of the English people. Indeed he is more English than Indian in his thoughts and make up. He is often more at home with English men than with his country men." (২)

(১) দি ডিকভারি অব্ ইণ্ডিয়া, ৪৬২ পৃঃ

(২) ডাঃ পট্টভির কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩২পৃঃ

গান্ধী জহরলালকে দেখেছেন এবং চিনেছেন শিল্পীরূপে। সত্যিই তিনি শিল্পী। অভিজ্ঞ ও কৌশলী শিল্পী। জীবনের প্রারম্ভে দু-নৌকোয় পা রেখে তিনি চলতে শিখেছিলেন। সেই পরম বিদ্যা তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন নানা ক্ষেত্রে আর নানা ভাবে। একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ, সমাজবাদ আর সাম্যবাদ তাঁর মনের খোরাক জোগায়। সাম্রাজ্যবাদের পরম শত্রু হয়েও ইংরেজের পরম মিত্র হবার তাঁর আশ্চর্য সামর্থ্য আছে। গান্ধী, তাই, জহরলালকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, চিন্তা ও ধরনে তিনি ভারতবাসী যতটা, তার চাইতে অনেক বেশি ইংরেজ। আর তাই তাঁর স্বদেশবাসীর সাহচর্যে তিনি যতটা খুশি হন অনেক বেশি খুশি হন তার চাইতে ইংরেজের সাহচর্যে।

সত্যিই গান্ধীর মত জহরলালকে আর কেউ এমন করে বুঝতে পারেনি। আর তাই এতকাল পরে গান্ধী প্রসন্নমনে জহরলালকে সমর্থনও করতে পারলেন না।

জহরলালের প্রস্তাব গৃহীত হল। নেতা ফিরে এলেন কলকাতায়। কিন্তু সুভাষ বোসকে নেমন্তন্ন করে গান্ধী-যে এমন বিপাকে পড়বেন, তাও তাঁর অজানাই ছিল।

ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধী পরাজিত হয়েছেন। তাঁর নিঃসর্ত সহযোগিতার প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। গৃহীত হয়েছে জহরলালের সর্তাধীন প্রস্তাব। গান্ধীর চোখে ফুটে উঠেছে আগামী দিনের আভাষ। খুব বেশি নির্লিপ্ত ও উদাসীন হয়ে এই পরিণতি গ্রহণ করতে পারেন নি গান্ধী। খুলেই বলে ফেলেছেন,—" আমার বন্ধুদের অহিংসার ওপর বিশ্বাস নেই। এ-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায়" ।(১)

(১) ডাঃ পট্টভির ইতিহাস, ১৩৩ পৃঃ; এই প্রসঙ্গে জহরলাল তাঁর 'ডিস্কভারী অব ইণ্ডিয়ার' ৪৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : সমগ্র কংগ্রেস—এমন কি গান্ধীর একান্ত অনুগত ভক্তদেরও অনেকে গান্ধীকে আর সমর্থন করতে পারল না।

সম্ভবত এই সর্বপ্রথম জহরলাল আত্মতৃপ্তি উপভোগ করলেন আকণ্ঠ। তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে। গান্ধীর পরাজয়ে নয়,— নিজমত জয়ী হওয়ায়। বস্তুত জহরলালের ভেতরকার দুটো সত্তা অবাধে আর একই সময়ে চিরদিন ভিন্নধর্মী ও বহুরূপী ভূমিকায় অভিনয় করেছে। গান্ধী নেতৃত্ব একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্গীকার করেও তিনি একই সময়ে নিজের স্বতন্ত্র-নেতৃত্ব-কামনা অন্তরে পোষণ করতেন অবলীলায়। ডাঃ পট্টভি সুন্দর করে এর ব্যাখ্যা করেছেন,—

"It is true that Jawaharlal himself has belaboured all along under too complexes, a certain superiority complex which made him feel superior to all the rest in India and certain inferiority complex lest he should be considered second to Gandhi." (১)

সহজ কথায় বলতে গেলে কথাটার অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ : দুটো জটিল মানস-ভঙ্গী জহরলালের ঘাড়ে চেপে রয়েছে সদাসর্বদা। নিজেকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভেবে পুলকিত হয়ে ওঠেন তিনি নিশ্চয়ই, কিন্তু পাছে গান্ধীর চাইতে কেউ তাঁকে ছোট করে দেখে, এ-কথা মনে করে দুর্ভাবনাও তাঁর কম নেই।

এই দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গীই রাজনীতি ক্ষেত্রে চিরদিন জহরলালকে পরিচালিত করেছে। আর এরই ফলে গান্ধী নিজেকে খানিকটা বিপন্ন মনে করেই ইংরেজের সঙ্গে দর কষাকষির মুখপাত্র স্থির করতে চাইলেন জহরলাকেই। কিন্তু তার পূর্বেই কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ পদত্যাগ করে বসলেন।

ধাক্কাটা অস্বাভাবিক এবং সম্ভবত অপ্রত্যাশিতও। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে ঘোড়ার চাট খেতেই হয়, এটা শাস্ত্র বাণী। সুভাষ বোসকে রাষ্ট্রপতির অজ্ঞাতে নিমন্ত্রণ করবার প্রতিফল থেকে গান্ধীজিও রেহাই পেলেন না।

(১) ডাঃ পট্টভির কংগ্রেস ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৯ পৃঃ

গোপন কক্ষে বসে উভয়ের মোকাবিলায় কী হয়েছিল জানবার উপায় নেই কিন্তু প্রকাশ্যে দেখা গেল মোকাবিলার পর রাজেন্দ্রবাবু পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করেছেন। আর গান্ধীজি ঢুকছেন কংগ্রেস ছেড়ে আশ্রমের নিঃসঙ্গ কক্ষে মৌন হয়ে।(১)

বিশ

গভীর দুর্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। একটা করে দিন কাটে, নেতা আরও বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। পোল্যাণ্ডকে সমভূমি করে হিটলারী ষ্টীম রোলার এগিয়ে আসছে পশ্চিম রণাঙ্গণে। কংগ্রেসের সাড়া নেই। অতিদীর্ঘ প্রস্তাব রচনার কৃতিত্ব আস্বাদন করছেন জহরলাল আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ। সব্যসাচীর মত একক এই সংগ্রামী নায়ক ভারতময় ছুটে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকল ইওরোপের রণাঙ্গণে।

যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক একমাস পূর্বে রাশো-জার্মান প্যাক্ট সই হয়। ২৫শে আগষ্ট ১৯৩৯। বস্তুত সমর প্রস্তুতি এবং প্রতিশোধ স্পৃহা হিটলারকে সেদিন যত না প্রত্যোৎসাহী করেছিল, এই অনাক্রমণ-চুক্তি করেছিল তার চাইতে অনেক বেশি। দুই রণাঙ্গণে যাতে যুগপৎ যুদ্ধে লিপ্ত না হতে হয়, হিটলার অনেক আগে থেকে এ-বিষয়ে সাবধানী হয়েছিলেন। রাশো-জার্মান চুক্তি তাঁকে নিশ্চিন্ত হবার প্রচুর অবকাশ দিল।

নেতা দেখেন আর ভাবেন। ভাবেন আর দেখেন। ফ্যাসিজম্ আর কম্যুনিজম্। অহি আর নকুল। এদের মিতালী হল কেমন করে? কই, কম্যুনিজমের আদ্যপীঠ রাশিয়া তো এই প্যাক্টে সই দেবার

(১) ডাঃ পট্টভির ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩৩ পৃঃ

বেলায় কার্ল মার্কসের কেতাব খুলে বসল না। এ-কথা ভাবতেও চাইল না যে, হিট্‌লারের সঙ্গে প্যাক্ট করলে কম্যুনিজম্ কতখানি মরবে কিম্বা কতখানি বেঁচে থাকবে। ইজম্‌এর যত কচ্‌কচি কি ভারতবর্ষের জন্যেই মজুত করা ছিল ? আর তাও গোলাম ভারতবর্ষের জন্যে ? ইজম্‌এর যাদের বালাই নেই, বাম্প নেই, তারা প্রাণ ভরে আর্তনাদ করছে। বিপন্ন অহিংসা, ইন্‌টারন্যাশনালিজম্, ডেমোক্রাসী, হিউম্যানিজম্, সোশ্যালিজমএর প্রাণ রক্ষা করতে এদের প্রাণান্ত। মাথাই নেই তো মাথার ব্যথা !

ইংরেজও বসে নেই। মারাত্মক ঘা খেয়েছে ইংরেজ রাশিয়ার কাছে ইংরেজও প্যাক্ট করতে চেয়েছিল। আমল দেন নি ষ্টালিন। ভারতবর্ষে পাঠিয়েছে ইংরেজ তার বিচক্ষণ দুই বে-সরকারী দূত। এডোয়ার্ড টম্‌সন্ আর স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্। দুজনেই জহরলালের পরম বন্ধু।

ক্রীপ্‌স্ এসেছেন কলকাতায়। থাকেন কংগ্রেসী এম, এল, এ যোগেশ গুপ্তের বাড়ীতে। নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান ক্রীপ্‌স্। নানা ওজর দেখিয়ে দিন কাটান নেতা। তিন দিনের মাথায় উভয়ের দেখা হয়। কারণ জানতে চেয়েছিলাম। নেতা বললেন,—"ও যে ইংরেজ। ওর সঙ্গে কথা কয়ে কৃতার্থ হবো না, এইটুকু বুঝিয়ে দিলুম।"

আবার মনে পড়ে ছাত্র জীবনের কথা। বিলেতের কথা। আই, সি, এস পড়তে গেছেন সুভাষ। লণ্ডনে। ইংরেজ ভৃত্য জুতো ব্রাস করে। ঝাঁট দেয় ঘর দোর। খুশিতে সুভাষের মন ভরে ওঠে। সতীর্থ বন্ধুকে বলেন,—"ইংরেজ আমার জুতো ব্রাস করছে। খুশি হবো না ?"

একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। আগষ্ট মাসের শেষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির তরফ থেকে নেতার দণ্ড সম্পর্কে মতামত জানাবার জন্যে জেলা ও অন্যান্য সমিতির কাছে চিঠি পাঠানো হয়। একবাক্যে সমগ্র বাংলা নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা জানায়

প্রস্তাবাকারে। ওয়ার্কিং কমিটির অযৌক্তিক, অকারণ এবং জিঘাংসু মনোভাবের নিন্দা করে কঠোর ভাষায়। নতুন বছরে নেতার মতের অপেক্ষা না করেই নির্বাচিত করা হয় তাঁকে প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি। টনক নড়ে উঠল ওপরওয়ালাদের। এক কলমের খোঁচায় বাংলার নব-নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটি বাতিল হয়ে গেল। বাংলার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হল কর্তাদের মর্জি আর খেয়াল মাফিক এক 'এ্যাড হক্' কমিটি। কিরণশঙ্কর রায় হলেন তার কর্ণধার। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল নতুন কমিটির নাম। এ্যাড হক নয়—'ঢক ঢক' কমিটি।

যুদ্ধ ঘোষিত হয় ৩রা সেপ্টেম্বর। ৮ই থেকে শুরু হয় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন। চলে ১৪ই অবধি। এই সুদীর্ঘ অধিবেশনে কংগ্রেসের নেতারা গভীর ও গম্ভীর হয়ে ছুটো মহা উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। একটিতে জানানো হল সর্তাধীন সহযোগিতার প্রতি-শ্রুতি। অপরটিতে ইংরেজকে অনুরোধ করা হল যুদ্ধের নীতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে। বলা বাহুল্য এ কথাও বলা হল যে, এই ব্যাখ্যা শোনবার পর কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে।

আবারও বলতে হয়,—চমৎকার! বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবম্প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা ও মিথ্যাচারের নজির বিরল বৈকি। বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের স্রষ্টা ও পুরোধা ইংরেজের সংগ্রাম-নীতি ও উদ্দেশ্য যেন রয়েছে এদের অজানা। আর তা জানতে হবে ওদেরই মুখ থেকে!

হিট্‌লার খুনী হোক, নৃশংস হোক, দানব হোক,—ছুশো বছর হিট্‌লার ভারতবর্ষকে পায়ের বুটের তলায় চেপে রাখেনি। ভারতবর্ষকে শোষণ করে শ্মশান করেনি। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দিয়ে জার্মেনী আর বার্লিন গড়ে তেলেনি। তবে?

ডেমোক্রাসীর মশাল বর্তিকা হাতে নিয়ে এই ইংরেজ অতীতের চীন বা ভারতবর্ষ, মিশর বা মধ্যপ্রাচ্য নয়,—একান্ত বর্তমানের মাঞ্চু-

রিয়াকে সর্বহারা করতে জাপানকে প্ররোচিত করেনি? আবেসিনিয়া ধর্ষণ করবার বেলায় ইটালীকে উস্কে দেয়নি? আর চেকোশ্লোভাকিয়া? স্পেন?—তবে?

কোনও মতামতের পরোয়া না করে এই ইংরেজ ভারতবর্ষের সৈন্য নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, ইজিপ্ট, সিঙ্গাপুর, বার্মা, চায়না ও আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার ও সুদৃঢ় করেনি? সহস্র মিথ্যার বেশাতি আর মুখোসের আড়ালে বিশ্বের বুকে সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ দুর্জয় করে তোলেনি?

ইজিপ্টের প্রতিনিধি ভারতবর্ষের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জহরলালকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন,—"নিজের স্বাধীনতা হারিয়েই তোমরা খুশি হওনি, পরন্তু অন্যান্য অনেক দেশ পরাধীন করবার কাজে ইংরেজকে তোমরা সাহায্য করেছ।" (১)—তবে?

শোনা যাক বর্তমান ভারত-রাজনীতির সায়নাচার্য পণ্ডিত জহরলালের ভাষ্য আর টীকা: "শক্তিশালী ইটালী জার্মেনী বা জাপানকে শত্রু করে লাভ কী? বৃটেনের প্রতিটি শত্রুকে ভাবতে হবে আমাদের বন্ধু বলে; রাজনীতির ভেতর আদর্শবাদের স্থান নেই, শক্তি ও তাঁর সময়োচিত প্রয়োগই রাজনীতির মূলকথা;—এই ধরনের মতে যারা বিশ্বাসী, তেমন লোকেরও অভাব ছিল না কিন্তু সংখ্যায় তারা ছিল নিতান্তই নগণ্য।"......

আবারও—"যখন এটা (চায়না মিশন) সংগঠিত হল, সুভাষ বোস তখন ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। জাপান জার্মেনী বা ইটালীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু দেশের ও কংগ্রেসের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও প্রবল মতিগতি বিবেচনা করে তিনি কোন বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে ভরসাও পাননি। বরং সব সময়ে বিনা প্রতিবাদে চুপ করেই তিনি থাকতেন। ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে দেশীয় ও বহির্দেশীয় নীতির প্রশ্নে তাঁর ছিল বড়

(১) দি ডিস্‌কভারী অব ইণ্ডিয়া, ৪৪৮ পৃঃ

একটা ব্যবধান। ১৯৩৯এ এই মতান্তর মনান্তরে গিয়ে দাঁড়াল। আর তার ফলে ঘটল সম্পর্কের ছেদ। ১৯৩৯এর আগষ্ট মাসে এরই পরিণামে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর বিরুদ্ধে একটা শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগ করতে বাধ্য হল। হল এ-কথা জেনেও যে, তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একজন ভূতপূর্ব সভাপতি।(১)

সত্যি? আদর্শবাদী জহরলালের এই পরম সত্য অঙ্গীকার, ভাষণ আর বিবরণ পাঠ করে ভারতবাসী কতটা পুলকিত হয়েছে, তার বিবরণ জানা নেই, কিন্তু পুলকিত হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়ই ইংলণ্ড আর আমেরিকা,—পণ্ডিত জহরলালের তীর্থক্ষেত্র ইংলণ্ড, বার্ধক্যের বারাণসী আমেরিকা।

এই জহরলাল সম্পর্কেই গান্ধী বলেছিলেন যে, উনি একজন আর্টিষ্ট। এই আদর্শবাদী আর্টিষ্ট সম্পর্কে সেদিনের একজন বিদেশিনী, জহরলালের অতিথি হয়ে যিনি আনন্দ ভবনে কাটিয়েছেন বেশ কয়েকটা দিন, খানা-পিনা করেছেন প্রচুর, পারিবারিক উৎসবে নিয়েছেন অংশ, সেই মিস ঈভকুরি—বিশ্বশ্রুতা মাদাম কুরীর কন্যা বলেছেন,—

After he had cursed Britain for hours and hours, the fact remained that Nehru did belong to the same universe of English men whom I had seen fighting in the British isles and on every continent. This individualist, this fanatic lover of Western civilization, this independent thinker could not conceivably live in a world other than the one than Britain with all her faults and the other united nations with all their faults, would erect after their hard won victory. (২)

অর্থাৎ ঘন্টার পর ঘন্টা ইংরেজের কুষ্ঠিকাটা সত্ত্বেও আমি নেহরুকে

(১) দি ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া, ৪৪৭ পৃঃ
(২) জার্নি এ্যামোং ওয়ারিয়ার্স, ৪৪৪ পৃঃ

চিনলাম। চিনলাম সেই সব ইংরেজদেরই একজন বলে যারা দ্বীপময় বৃটেনে আর নানা মহাদেশে যুদ্ধ করে চলেছে শত্রুর বিরুদ্ধে। এই স্বতন্ত্রবাদী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্ধ প্রেমিক, এই স্বাধীন-চিন্তাপ্রিয় মানুষটি, হাজার দোষে দোষী বৃটেন ও তার মিত্রেরা মিলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবী যে-ধাঁচে গড়ে তুলবে, সেই পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও বাস করবার কল্পনাও করতে পারেন না।" জহরলালের যথাযথ আলেখ্য।

আর এই জহরলালের নেতৃত্বে ওয়ার্কিং কমিটি রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত যে-দোদুল্যমান দৃষ্টিভঙ্গী, মানসিক দেউলিয়ানামা ও সিদ্ধান্ত-পরাঙ্মুখতার পরিচয় দিতে থাকল নির্বিকার চিত্তে, তারই পরিণামে দিনকার দিন ইংরেজ হতে থাকল নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত আর সম্ভবতঃ আশান্বিতও।

ওয়ার্কিং কমিটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল গোটা ভারতবর্ষ। তার দোমনা আচরণে যে-ভারতবর্ষের মানসিক ভঙ্গী ইংরেজের প্রতি ছিল এবং আরও বেশি হতে পারত বিরূপ ও বিরোধী,—ইংরেজের বিপুল প্রচার-কৌশলে ও প্রলোভনে তা ভেঙে পড়ল। সঙ্কল্পের গোড়া গেল শিথিল হয়ে। ভারতবর্ষের বিরূপতা টাল খেল বিলক্ষণ। দেশদ্রোহী, স্বার্থসর্বস্ব, ধনী ও সুবিধাবাদী পুঁজিপতির দল ইংরেজকে খুশি ও তোয়াজ করতে হয়ে উঠল তৎপর। বস্তুতঃ যুদ্ধের প্রারম্ভিক অবস্থায় ইংরেজ ভারতবর্ষ সম্পর্কে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা দেখিয়েছে। কংগ্রেস কোন পথে যাবে, কী হবে তার সিদ্ধান্ত, একথা ভেবে সেদিন শুধু ইংরেজই স্তব্ধ হয়ে দুশ্চিন্তা করেনি,—পরবর্তীকালে যারা ইংরেজকে খুশি করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইংরেজের পদপ্রান্তে, তারাও এক পা এগিয়েছে তো সাত পা পিছিয়ে গেছে।

কিন্তু কংগ্রেসের বিচার-বিভ্রান্তি ইংরেজকে সাহসী হবার সুযোগ দিল। অগুণতি ভারতীয় সৈন্য, বিপুল অর্থ ও যুদ্ধসম্ভার ইংরেজ পাঠাতে লাগল দেশ দেশান্তরে। সে কোনদিক থেকে পেল না বাধা। উঠল না কোন প্রতিবাদ। নিশ্চিন্ত আর নিরুদ্বিগ্ন ইংরেজ নিজের চিরা-

চরিত খেলায় মনোনিবেশ করল। ভাইসরয় লিনলিথগো নেমন্তন্ন পাঠালেন নেহরুকে। গান্ধী পূর্বে দেখা করেছেন দুবার। পরে গেলেন রাজেনবাবু আর প্যাটেল।(১)

শতশত সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন নেতা সামান্য কয়েকটা মাসে। ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছেন একা। সঙ্গী নেই। অর্থ নেই। নেই কংগ্রেসের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মার্কা। অন্তরের এক বৃহৎ আকুতি অস্থির করে তোলে সমগ্র সত্তা। যে কোন উপায়ে পরাধীনতার শেকল ছিঁড়ে সার্বভৌম ভারতবর্ষের মহিমান্বিত মূর্তিখানি প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিশ্বের সম্মুখে।

ফল ফলতে শুরু করে। ধীর কিন্তু নিশ্চিত তার গতি। ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশের মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে। ইংরেজের পরাজয়-কামনা হয়ে ওঠে মুখর। চা-এর আড্ডা, রোয়াক আর যাত্রী-গাড়ী মুখরিত হতে থাকে। ইংরেজের দুর্যোগ আসে এগিয়ে। খুশিতে উপচে পড়তে চায় দেশের মন।

মাস খানেকের সফর শেষ করে নেতা ফিরে এলেন কলকাতায়। ইংরেজের প্রচণ্ড দাপটে অসার হয়ে গেছে কলকাতার প্রাণশক্তি। শবের মত পড়ে আছে কলকাতা। প্রাণহীন। সভা বন্ধ। মিছিল নেই।

(১) বড়লাট নেতাকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন। নেতা গিয়েওছিলেন। নেতার পর-পরই বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জি। তিনি তখন বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি। নেতার সঙ্গে বড় লাটের সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, বড়লাট তাঁকে বলেছেন,—"এই একটিমাত্র ভারতীয় নেতার সত্যিকারের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অভিজ্ঞান তিনি লক্ষ্য করেছেন। বোস কথা বলেন কম, কিন্তু যথাযথ (to the point)। গান্ধী বড় বেশি হেঁয়ালি। জহরলাল বাক্যের ফুলঝুড়ি। বাদবাকি অচল। কিন্তু 'Bose is conceited' অর্থাৎ বোস দাম্ভিক।"

স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাইএর কণ্ঠ। হাওড়া থেকে সোজা চলে এলাম নেতার সঙ্গে এলগিন রোডে। পথে কথা হল অনেক।

বিশ্রাম না করে লিখতে বসে গেলেন টেব্‌লে ঝুঁকে পড়ে। ভৃত্য করুণা চা দিয়ে গেল। নীরবে লক্ষ্য করতে লাগলাম ঝুঁকে-পড়া মুখ খানা। সঙ্কল্পের কাঠিন্য ফুটে উঠেছে প্রশান্ত মুখে। নিবিড় চিন্তা আর বিরামবিহীন কর্মতৎপরতা এনে দিয়েছে অবয়বে একটা নতুন ব্যঞ্জনা আর ব্যক্তিত্বের ছাপ।

এপ্রিল থেকে অক্টোবর। মাত্র ছটা মাস। ছমাসে মানুষ এত বদলায়? আনকোরা নতুন আর একটা মানুষ। পুরোনো সব ঝরে পুড়ে গেছে। গেছে নিঃশেষে। কণ্ঠে এঁর নতুন সুর। দৃষ্টিতে নতুন আলো।

ঘষ্‌ঘষ্‌ করে লেখা শেষ করে টাইপিষ্টকে ডাকলেন। ছাপতে দিয়ে চায়ের বাটি টেনে নিলেন সামনে। এক চুমুকে আদ্ধেকটা চা শেষ করে বললেন,—"কলকাতার এ-অবস্থা বাঙালী সইছে কেমন করে?"

বাঙালী, না আমরা? তাঁর অযোগ্য সহকর্মীরা? কেউতো খেয়াল করিনি। ইংরেজের হুকুম মেনে চলেছি স্বাভাবিক ভেবে। অনিবার্য মনে করে। অথচ কলকাতায় পা দিতে-না-দিতে এই মানুষটির মনে সব কথার আগে এই কথাটিই জাগল। শুধু মনেই জাগল না,—সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ-বাসনা হয়ে উঠল উগ্র।

আমার দিকে চেয়ে আবার বললেন,—"কেন, কংগ্রেসের নেতারা কী করছেন? একটা সভাও কি ওঁরা ডাকতে পারলেন না?"

"কংগ্রেসের মূল নেতাই-যে ছিলেন বাইরে।" বললাম আমি।

"আমি ওঁদের কথা বলছি,—এ্যাড্‌ হক্‌ কমিটির কর্তাদের।"

"এ্যাড্‌ হক্‌কে বাঙালী কংগ্রেস বলে না।"

"না বলুক। তা তোমরা?"

"রোজই এক-একজনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এর ওপর—"

কথা আমার শেষ হল না। সেই আশ্চর্য দুটি চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে নিবদ্ধ হল আমার মুখের ওপর। পরক্ষণেই কোমলতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল সেই চোখ। খুব আস্তে বললেন,—"দল পুষে রেখে কী লাভ হবে বলতো, যদি তা কাজেই না লাগল?"

টাইপিষ্ট চিঠি ছেপে দিয়ে গেল। সই করে আমার হাতে দিয়ে বললেন,—"সব কটা কাগজেই যেন বেরোয়। কালকের সভা, হয় হবে আমার শেষ সভা, আর না হয় এই অসহ্য অবস্থার অবসান হবে।"

"কিন্তু—"

ততক্ষণে চিঠির মর্ম আমার পড়া হয়ে গেছে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে পরদিন জনসভা। আলোচনা হবে বর্তমান সমস্যার। বক্তা ও আহ্বায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। বলতে যাচ্ছিলাম অন্তত কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে। বলা হল না। আবার সেই দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ল আমার চোখে আর মুখে। চোখ নামিয়ে নিলাম।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন নেতা। আমার কাঁধের ওপর ডান হাতখানা রেখে বললেন,—"আমি জানি, ইংরেজ এখুনি আমাকে গ্রেপ্তার করবে না।"

"কিন্তু কেন?"

"তার ফলে কংগ্রেসের ভেতরকার গোলমাল মিটে যেয়ে, কী জানি, আবার যদি একজোটে কংগ্রেস ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এই ভয়ে।"

"কিন্তু করতে তো হবেই?"

"তা হবে। কিন্তু দেরি আছে। আর না। ফিরতে রাত হবে অনেক। গাড়ী নিয়ে যাও।"

পরদিন বিকেলে সভা হল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। দুপুর থেকে লাল পাগড়ির বিরাট বহর পার্ক ঘিরে রেখেছিল। দুশ্চিন্তা আমাদের না হয়েছিল, তা নয়। হয়তো হাঙ্গামা বেধে যাবে। আর হুজ্জোতও। বাছা বাছা স্বেচ্ছাসেবক দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে নেতার চারপাশে, মাঝের চক্রে থাকব আমরা কয়েকজন,—এই ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু

বাগ্‌ড়া দিলেন মেয়েরা। মেজ ভ্রাতৃজায়া বিভাবতী দেবী এগিয়ে এলেন এক দঙ্গল মেয়ে নিয়ে। ঘিরে দাঁড়ালেন নেতাকে।

অনল প্রবাহ বেরোতে লাগল নেতার কণ্ঠ চিরে। আন্তর্জাতিক অবস্থার হল নিপুণ বিশ্লেষণ। তারপর দেশের। ওয়ার্ধার কথাও বাদ গেল না। বুদ্ধি আর কথার মারপ্যাঁচ চলছে বড় বড় মস্তিষ্কে। নিক্তি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন জহরলাল। এক রত্তি এদিক ওদিক হবার জো নেই। সনাতন বৃটিশ ডেমোক্রাসী আর আধুনিক মার্কস্‌বাদ,—এ-দুটোর সঙ্গে ভাবনা দেওয়া হয়েছে ভাবালুতা আর ছেঁদো গাল-ভরা দার্শনিক মতবাদের।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাইতে হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তারও তো একটা দিন-ক্ষণ আছে! ইংরেজের এই সমূহ বিপদ, এত বড় দুর্যোগ, এই জীবন-মরণ সমস্যার মাঝখানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী,—লোকে বলবে কী? তাছাড়া ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য? তা কি অটুট থাকবে? স্বাধীনতা নিশ্চয়ই বড় কথা। কিন্তু আন্তর্জাতিক এই সঙ্কট-মুহূর্তে ওটাই কি সব চাইতে বড় কথা? ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্তর্গত না?

সাদামাঠা গান্ধী অত-শত কথার কারচুপি জানেন না। সত্যি কথা সহজ করে বলে ফেলেন। তাঁর আদর্শ আর মানবিকতা, সত্য আর অহিংসা অন্যের কাছে কত বড় বা প্রয়োজনীয়, সে-বিচার তাঁর নয়। তাঁর কাছে মহতো মহীয়ান্। তাই সোজা কথায় তিনি দিতে চেয়েছিলেন নিঃসর্ত সহযোগিতার অঙ্গীকার। অবশ্য নিঃসর্ত সহযোগিতার পেছনেও প্রত্যাশা উঁকি-যে দেয় না, তা নয়। দেয়। কিন্তু সেটা থাকে মনের তলায়। গভীর তলায়। গোপন কোঠায়। বিপদাপন্ন ইংরেজকে স্বতঃপ্রবৃত্ত আর নিঃসর্ত সহযোগিতার আশ্বাস দিলে বিশ্বে গান্ধী আর গান্ধী-বাদের মহিমা শতগুণ বেড়ে যাবেই। কিন্তু এহো বাহ্য। যুদ্ধ-শেষে বিজয়ী ইংরেজ কি একথা এবারও ভুলে যাবে? যদি না যায়,—গান্ধী আর গান্ধী-বাদের এক বিরাট ও সার্থক রূপ আলো

করে ফুটে ওঠে বিশ্বের দিকে দিকে। গান্ধী-বাদের মহান তত্ত্ব আর তারই কল্যাণে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা,—গান্ধীর চাওয়া ওখানেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

কিন্তু জহরলাল? গান্ধী বড়, গান্ধী নেতা, গান্ধী বাপুজিও কিন্তু ঐ নীতিবাদ আর নেতিবাদ জহরলাল আর বরদাস্ত করতে রাজী নন। গান্ধীর পূজো চলবে। লেখায়, ভাষণে, তোষণে চিরদিন তিনি বড় হয়েই থাকবেন। একটা প্রশ্নও উঠবে না। কিন্তু।

কিন্তু চিরদিনই কি থাকতে হবে গান্ধীকে আর গান্ধী-বাদে সায় দিয়ে? নিজের ব্যক্তিত্ব তাঁর অজানা নয়। সে-ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র হয়ে কোনদিনই কি প্রতিষ্ঠা পাবে না? আত্মজীবনী কী ব্যাপক স্বীকৃতিই-না পেয়েছে বিলেতে আর আমেরিকায়। জেটল্যাণ্ড, এ্যালেন, লোথিয়ান, হ্যালিফ্যাক্স, ল্যাস্কি আর ক্রীপ্‌স্; আরও আছে,—টমসন্, উইল্‌-কিন্‌সন্ আর আগাথা। টম্‌-হ্যারী-পলদের কথা না বলাই ভালো। প্রতিদিন চিঠি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। আসে আমেরিকা থেকে। আসে চীন আর ইজিপ্ট থেকে। আপন-জন মেনন বসে আছে খাস বিলেতে। অক্লান্ত মেনন চালিয়ে যায় প্রচার। হুহু করে নাম ছড়িয়ে পড়ে বিলেতের ঘরে ঘরে। গান্ধী-চন্দ্রাতপের বাইরে চলে যায় দৃষ্টি। উন্মুক্ত বিরাট স্বচ্ছ নীল আকাশ চোখে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে অতি সামান্য পার্থক্যই ছিল গান্ধী আর জহরলালের প্রস্তাবের মধ্যে। নিঃসর্ত সহযোগিতার প্রস্তাবে ভবিষ্যৎ-আশ্বাস-দাবী প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। ছিল আড়ালে। আত্মগোপন করে। জহরলাল,—যা গোপনে ছিল, প্রকাশ্যে টেনে আনতে চান সর্ত জুড়ে দিয়ে। যুদ্ধোত্তর স্বাধিকার-সর্ত। উভয়েরই উদ্দেশ্য সহযোগিতা। একজন প্রকাশ্যে। অন্যজন ঘুরিয়ে।

কিন্তু ওয়ার্ধা আর ওয়ার্কিং কমিটিই দেশ নয়। নয় জাতি। নেতা বলে এসেছেন এই মোক্ষম তত্ত্বটা। সংগ্রামী ভারতবর্ষ দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে, প্রাণ-যজ্ঞের আহুতির বিনিময়ে

হয়তো দর্শন ও তত্ত্বকথা শিখেছে একটু কম, কিন্তু বৃহৎ ও ব্যাপক করে এই একটি কথা বুঝতে তার বাকি নেই যে, অতি বড় আর মহৎ আত্মোৎসর্গের রক্ত-রাঙ্গা বেদীর ওপরেই চিরদিন স্বাধীনতার মহিমান্বিত সিংহাসন স্থাপিত হয়েছে। আর ভবিষ্যতেও তাই হবে। সেই ভবিষ্যৎ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একে অভ্যর্থনা না জানালে কৃতঘ্নতা হবে না ?

শোভন হত, সঙ্গত হত, যথাযথ হত যদি কংগ্রেস সব সংশয়, দ্বিধা আর দুর্বলতা পরিহার করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ত। গান্ধী আর তাঁর পার্ষদরা বলতে চান, দেশ তৈরী নয়। দেশকে তৈরী করে কবে তোমরা সংগ্রামে নেমেছ ? ১৯২৩ থেকে ১৯৩০,—তখনও কি ঐ একই কথা তোমাদের মুখে শোনা যায় নি ? কিন্তু ১৯৩০ কী সাক্ষ্য দিয়ে গেল ? দেশ তৈরীই ছিল,—তৈরী ছিলে না তোমরা, নেতারা। তাছাড়া, কবে কোন্ দেশ পুরোপুরি তৈরী হয়ে যুদ্ধে নেমেছে বল তো ? অপ্রস্তুত ইংরেজ নিজের সমস্ত ত্রুটি আর বিচ্যুতি জেনে আর মেনেই-না যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল চোখের ওপর। তবে ?

ফরোয়ার্ড ব্লক ছোট কি বড়, এ প্রশ্ন তোলা বৃথা। ফরোয়ার্ড ব্লক দুর্বল কি সবল, সে কথাও অপ্রাসঙ্গিক। সুভাষ বোস গান্ধী নন,—জহরলালও নন,—এ-কথাও অত্যন্ত জানা। কিন্তু বড় হয়ে প্রধান হয়েও তোমরা এগিয়ে এলেনা কেন ? কেন থাকলে পেছনে পড়ে ? কেন পরম শত্রু ইংরেজ অকস্মাৎ তোমাদের কাছে এমন করে মহৎ আর পরম মিত্র হয়ে উঠল ? শয়তান হয়ে উঠল রাতারাতি দেবতা ? তাকে আঘাত হানবার কল্পনায় তোমাদের হাত কেঁপে উঠল কেন ? কেন কণ্ঠ হল দ্বিধাগ্রস্ত ? জবাব দাও।

তোমরা এলে না। এগোলে না। তাই বলে সারা ভারতবর্ষ এমন সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে ইংরেজকে পরিত্রাণ করবার দুঃসহ কলঙ্ক যুগ যুগ ধরে বহন করে চলবে ? ইতিহাস তাকে ক্ষমা করতে পারবে ? কৃতঘ্ন বলবে না ?

সুভাষ বোস একা হোন্, নগণ্য হোন্, দুর্বল হোন্,—ফরোয়ার্ড ব্লক তুচ্ছ হোক্,—হয়তো সংগ্রামে সুভাষ বোস জয়ী হতে পারবেন না, দুর্বার মত্ত হস্তির পায়ের তলায় পিষে, গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন,—তবু তাঁর এই পরম সান্ত্বনা থাকবে যে, দেশ ও জাতির শত্রুকে তিনি ক্ষমা করেন নি। মুক্তির আসন্ন মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি বিজ্ঞাপনে কালক্ষেপ করতে করেছেন অস্বীকার।

নেতা আসাম পরিক্রমায় রওনা হয়ে গেলেন। সেখান থেকে নাগপুর। সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন নেতা।

প্রথম ও দ্বিতীয়বার গান্ধী রাজ-প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন একা। তার ফলে রাজেন্দ্রবাবুর কাছে এই কারণে ও সুভাষচন্দ্রকে ওয়ার্কিং কমিটিতে আমন্ত্রণ করায় গান্ধীকে নাজেহাল কম হতে হয়নি। তৃতীয়বার গান্ধী গেলেন রাজেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করে। এই সাক্ষাতের পূর্বে কংগ্রেসের দাবীর প্রত্যুত্তরে বড়লাট ঘোষণা করেছিলেন যে, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের প্রতিশ্রুতি তাঁরা ভোলেননি কিন্তু যেহেতু যুদ্ধের সময় ওটা চালু করবার পথে রয়েছে প্রচুর ও বহুবিধ অন্তরায় ও অসুবিধা, সেই হেতু ওরই প্রারম্ভিক সূচনাকারে তিনি একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে রাজী আছেন।

তৃতীয়বার সাক্ষাতের সময় বড়লাট যে-বিবৃতি গান্ধীর হাতে তুলে দিলেন, তার মধ্যে ইংরেজ-চরিত্রের সনাতন বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় ফুটে উঠল। চিরকালের অজুহাত সাম্প্রদায়িক ও সংখ্যালঘু সমস্যার সুমীমাংসা ও সুরাহা না হওয়ায় ইংরেজের দুশ্চিন্তার যে অবধি নেই এই মহান তত্ত্বের আভাষ দিয়ে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির পূর্বে এই একান্ত প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান করতে বড়লাট নেতাদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এমনি আরও কত উচ্চাঙ্গের কথা অনর্গল বলে গেছেন বড়লাট।

এই সাক্ষাৎ ঘটে ৫ই নবেম্বর। ওরা সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই নবেম্বর, দীর্ঘ দুমাস। এই দীর্ঘ ঘটনাবহুল ও একান্ত মূল্যবান দুটি মাস মিথ্যা আশার ছলনায় ভুলে কংগ্রেস নেতারা শুধু নিজেদেরই প্রতারিত করেননি, জাতির কল্যাণ ও স্বার্থের ওপর করেছেন এক অপূরণীয় অবিচার। হৃতদরিদ্র ভারতবাসী পেটের জ্বালায় আর ইংরেজের গালভরা কৌশলী যাদু-কথায় ভুলে দলে দলে সৈন্যদলে নাম লেখাতে লাগল। সৈন্য সংগ্রহের আফিস বসল নগরে, গ্রামে, পাড়ায়। স্কুল-কলেজও বাদ গেল না। যুদ্ধের চাঁদা আর ওয়ারবণ্ডের ভাণ্ডারে পড়তে লাগল ভারতবর্ষের রক্ত নিংড়ানো অর্থ। দেশীয় রাজন্যবর্গ পরম নিশ্চিন্তে ইংরেজের সাহায্যে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। ইংরেজ টিঁকে না থাকলে তাদের টেঁকাও-যে হাওয়া হয়ে যাবে, এই সহজ কথাটা তারা জানত।

বেকার ছেলের দল। কেউ কেউ বার বার জেলেও গেছে কংগ্রেসের ডাকে। দেশ-জননীর উদ্ধার মানসে পাঠ সাঙ্গ হয়ে গেছে। চাকুরীও মেলেনি। কিন্তু ঘর? পেট? জীবনের শত অপূর্ণ কামনা? সিভিক গার্ড এবং এ, আর, পির ডাকে প্রাণ সাড়া দিল না কিন্তু পোড়া পেটের ও তার আনুসঙ্গিক অজস্র দাবী আর কত কাল ওরা উপেক্ষা করবে? হুরহুর করে ঢুকে পড়ে সবাই।

প্রদেশে প্রদেশে রয়েছে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা গদী আঁকড়ে। ওদের হাতেই স্থানীয় শাসন আর ব্যবস্থা। ইংরেজের চাপ এসে পড়ল ওদের ওপরেও। তাছাড়া, যুদ্ধবিরোধী ঐ অবুঝ ফরোয়ার্ড ব্লক আর তার একগুঁয়ে নেতাটি। এদের নিয়েই-না ইংরেজের যা-কিছু দুর্ভাবনা। এদের গতিবিধি আর কার্যকলাপ ইংরেজ পছন্দ করে না। ওদের শায়েস্তা করতে আদেশ দেয় মন্ত্রীদের। মন্ত্রীরা পড়ে বিষম ঝাঁপড়ে। ওরা শ্যাম রাখবে, না কুল রাখবে? দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে। বাধ্য হয়ে ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে বলে।

সুভাষচন্দ্রের আপোষবিরোধী ও উগ্র সংগ্রামমুখী আচরণ ও সমালোচনা সেদিন ইংরেজকে কতখানি উদ্বিগ্ন করেছিল, জানবার উপায় নেই। কিন্তু কংগ্রেস নায়কদের দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল আপোষী মনোভাবের ওপর তীব্র ও তীক্ষ্ণ আক্রমণে তাদের সচকিত, সতর্ক ও সংযত করেছিল বিলক্ষণ, এর ভেতর তর্কের অবকাশ নেই।

নাগপুর থেকে নেতার সফর চলে যুক্তপ্রদেশে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আশার আলো জ্বলে উঠেছিল দেশবাসীর মনে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার চরম ও শেষ সংগ্রাম হয়তো শুরু হবে ভারতের বুকে। কিন্তু জ্বলতে-না-জ্বলতে আলো নিভে গেল। আশা গেল ভেঙ্গে। শুরু হল ক্রীপ্‌সের খেল্।

ক্রীপ্‌স্‌কে কেউ কেউ বলত বিলিতি জহরলাল। কথাটা উঠেছিল এদেশ থেকেই। বস্তুতঃ ক্রীপ্‌স্ জহরলাল অপেক্ষা সর্বাংশেই বড় ছিলেন। আর ছিল তাঁর মধ্যে উন্নততর রাজনীতি-জ্ঞানের প্রাখর্য। নিজের স্বাধীন মতবাদের জন্যে লেবারপার্টি থেকে উনি একবার বহিষ্কৃত হন। কিন্তু এ-সত্ত্বেও ক্রীপ্‌সের কর্মক্ষমতা দলের ভেতর ও সরকারী মহলে ওঁর স্থান নির্দেশ করে দিয়েছিল অনেক ওপরে।

নেতার কাছ থেকে ক্রীপ্‌স্ এদেশের চরমপন্থীদের আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনার আভাষ পেয়েছিলেন। জানতে পেরেছিলেন জহরলাল ও তাঁর বন্ধুদের মতামত ওঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে। গোঁড়া গান্ধী নন,—সুভাষ বোস তো ননই,—ইংরেজের ভরসা করবার মত একটি মাত্র লোকই ছিলেন এদেশে। জহরলাল।

ইংরেজের মতিগতির আমূল না হলেও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে; ভারতীয় সমস্যাকে ইংরেজ দেখতে চায় উদারতা ও সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে; অদূর ভবিষ্যতে সর্বদলীয় প্রতিনিধি ভারতে আসবে ভারত-সমস্যা আলোচনার জন্যে;—এমনি এবং আরও অনেক মুখরোচক, আশাপ্রদ ও গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা ছড়িয়ে ক্রীপ্‌স্ বিদায় নিয়েছিলেন।

ওয়ার্ধা আশ্রমে তিনি খদ্দর পরেছিলেন। মাটিতে নেপ্‌টে বসে সকলের সঙ্গে পংক্তি ভোজন করেছিলেন। গান্ধীর প্রার্থনা-সভায় যোগও দিয়েছিলেন।

ক্রীপ্‌সের কথা আর ব্যক্তিগত প্রভাবের মধ্যে কোন্‌টা সেদিন জহরলালকে বেশি অভিভূত করেছিল, নির্দিষ্ট করে বলতে না পারলেও, ওয়ার্ধায় বসে এই বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্‌ যে-সম্মোহন মন্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, এবং তার ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার গতি সেদিন যে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে সংশয়ের স্থান নেই।

যুক্ত প্রদেশের একটানা পরিক্রমা শেষ করে নেতা যাত্রা করলেন দিল্লীর পথে। পুরাতন বৎসরের জীর্ণবাস খসে পড়েছে অঙ্গ থেকে। ধুলো আর বালি, কালী আর কর্দম ধুয়ে যায় নতুনের বর্ষণ-স্পর্শে। নবতম আশা জাগে প্রাণের কন্দরে। নেতা নতুন বৎসরের প্রথম দিনে, ১লা জানুয়ারী, দিল্লীর ছাত্র সম্মেলনে সকল বাধা ও আবরণ মুক্ত হয়ে আকুল আগ্রহে দেশের নব-যৌবনের দুয়োরে ডাক পৌঁছে দেন বজ্র মন্ত্রে। কণ্ঠে উচ্চারিত হয় কবির ধ্যান-মন্ত্র :

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
মানিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

কে বলে মৃত্যুর লক্ষ্য মরা? নবজীবনের দিশারি মুক্তিদুত মহা বিপ্লবের মহোত্তম উপচার আর আবেদনের মাঙ্গলিক বরণডালা হাতে করে আপন বুকের ওপর ফুটিয়ে তোলে নবসৃষ্টির সুন্দর ও সুষমার অপরূপ ব্যঞ্জনা। তাকে জানাতে হবে মমতার আমন্ত্রণ। নিতে হবে বরণ করে জীবনের গূঢ়তম আবেষ্টনে। মৃত্যু হয়ে উঠবে অমৃত।

মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি,
খিন্ন জীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

একুশ

১৯৪০

"ওখানে থাকবে মুক্তি সংগ্রামের প্রতি যুগের আর প্রতি স্তরের ধারাবাহিক ইতিহাস। শুধু লেখায় নয়,—চিত্রেও। আলেখ্য সংগ্রহ করতে হবে আমাদের পূর্বসূরীদের। বাদ-বাকি এঁকে দেবেন আমাদের শিল্পীরা।

"প্রতিটি জেলার জন্যে থাকবে এক-একখানা ঘর। জীবনী ও আলেখ্য ছাড়া সেখানে থাকবে শহিদদের ব্যবহার করা জিনিষপত্র। তাঁদের রচনা, চিঠি, প্রিয়পুস্তক, অন্যান্য স্মারক চিহ্ন ও বস্তু।

"দেশের সকল মুক্তি-ব্রতী প্রতিষ্ঠানের জন্যে থাকবে একখানা করে ঘর। সেটা হবে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়। নীচের তলায় থাকবে একটা বড় হল ঘর। বসবে সেখানে সভা, হবে নাটক, জলসা, নাচ ও গানের রকমারি প্রদর্শনী। এক কথায় ওটা হবে কৃষ্টিঘর। সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পাঠাগার।

"তেতলায় থাকবে কয়েকখানা ঘরে ভিন্ দেশের আর দেশের অতিথিদের থাকবার স্থান। বিভিন্ন জেলার, বিশেষ করে পল্লীর কর্মীদের জন্যেও কয়েকখানা ঘর রাখতে হবে। কলকাতায় মাঝে মাঝে এসে ওরা যাতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। মিশতে পারে এখানকার কর্মীদের সঙ্গে। থাকবার স্থানের অভাবে ওদের কলকাতায় আসা হয়ে ওঠে না। ওদের জন্যে একটা ব্যবস্থা রাখতেই হবে।

"করবার আরও কতই-না রয়েছে। দেশের লেখক ও সাহিত্যিকদের ডেকে আনতে হবে ওখানে। প্রগতি সাহিত্য পাশাপাশি গড়ে না উঠলে স্থায়ীরূপ নেবে না আমাদের কোন প্রচেষ্টাই। আন্দোলন মূর্তি

গড়ে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য। কুড়িটা বছরেও গান্ধী-আন্দোলন নিয়ে কোন সাহিত্য গড়ে উঠল না। অথচ এর তুলনায় কত সামান্যই না ছিল বঙ্গ-ভঙ্গ রদের আন্দোলন। গানে, কবিতায়, উপন্যাসে, গল্পে ভরে উঠেছিল সাহিত্য।"(১)

রাজনীতির আর কিছু যেন অবশিষ্ট নেই। সাঙ্গ হয়ে গেছে ওর খেলা। স্বাধীনতার সংগ্রামই আর যথেষ্ট নয়। এবার স্বাধীন দেশের নব রূপায়ণে উন্মুখ হয়ে উঠেছে শিল্পী। তদ্‌গত। অনুধ্যানী। দেশ-বিদেশ থেকে আসবে মুক্তি-পথের কত-শত পথিক এই ভারতের সাগরতীরে। তারা দেখবে না ভারতবর্ষের শতাব্দী-ভরা মুক্তি সংগ্রামের আশ্চর্য ইতিহাস? দেখবে না তাদের,—যারা বারুদ-ঠাসা পাঁজরার হাড় দিয়ে তৈরী করেছিল বজ্র?

সভা বসল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। মহাজাতির মহান মন্দিরের পরিকল্পনা পেষ করে নেতা লক্ষ টাকার আবেদন রাখলেন জনতার সামনে। উল্লসিত দেশবাসী একবাক্যে সমর্থন জানাল। ঐ একই দিনে নেতাকে লক্ষ টাকার আর একটি তোড়া উপঢৌকন দেবার প্রস্তাব গৃহীত হল জনসাধারণের তরফ থেকে।

কিন্তু কে করবে এই মহাভবনের নামকরণ আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা? কবির ছন্দোবদ্ধ অপরূপ মহাকাব্যের মূর্ত নায়ক সুভাষ,—কবি এগিয়ে এলেন। সনাতন ভারতবর্ষের মর্মরূপ আর সদ্য বর্তমানের বস্তু-বীর্য হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াল উদার উন্মুক্ত বিচিত্র বাংলার নীল আকাশের নীচে। কবির কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল ভারত-ঋষির ভুলে যাওয়া বাণী, ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্……, সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি আর সঙ্গীতের সুরে প্রতিষ্ঠা পেল মহাজাতি

(১) শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভার পর এলগিন রোডের বাড়ীর ছাতে বসে মহাজাতি-সদন-কমিটির প্রথম সভা। সেইখানে নেতা মহাজাতি-সদনের পরিকল্পিত রূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

সদন। শুরু দেশবন্ধুর নামাঙ্কিত রাজপথের ধারে গড়ে উঠবে পুত্র-শিষ্য সুভাষের স্বপ্ন-বিতান।

মহাজাতি সদনের আফিস বসল গৌরাঙ্গ প্রেসের ওপর তলায়। সুভাষপন্থী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আফিস প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে, মেডিক্যাল কলেজের সামনে। আর ফরোয়ার্ড ব্লকের আফিস হল ধর্মতলার মোড়ে। ফরোয়ার্ড ব্লক কাগজ বেরোল। নেতা স্বয়ং সম্পাদক। আফিসের ভার পড়ল প্রাদেশিক সেক্রেটারী সত্য বক্সীর ওপর।

এছাড়া রামগড়। কিন্তু টাকা ? এ-বিরাট ব্যয় বহন করবে কে ? কোথা থেকে আসবে রসদ ? সম্বল তো ভিক্ষা। ঝুলি হাতে পথে বেরিয়ে পড়েন নেতা। যে যা পারে ঝুলিতে ফেলে দেয়। আসে চূণ, শুরকি, ইট, লোহা, সিমেন্ট। ভিখিরী ভোলানাথ হাসিমুখে ভিক্ষা তুলে নেন সমাদরে। শুরু হয় সদনের কাজ। চলতে থাকে রামগড়ের প্রস্তুতি।

নেতার ডাকে সারা বাংলার কর্মীরা জমা হয় কলকাতায়। প্রথম দিন প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে, দ্বিতীয় দিন নেতার বাড়ীতে, এলগিন রোডে। প্রতিজনের মতামত জেনে নেন নেতা। বিচার চলে পুঙ্খানুপুঙ্খ। বিশ্লেষণ হয় প্রতিটি পদক্ষেপের।

ইংরেজ সহজে রেহাই দেবে না। তারও জীবন-মরণ সমস্যা। সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন অমনি অমনি সে হারাতে চায় না। যদি খোয়াতেই হয়, শেষ আঘাত হানবে সে মরণ-পণে।

কম্যুনিষ্টদের সহানুভূতি আছে, কিন্তু দল হিসেবে তারা নেতার সঙ্গে মিলতে চায় না। ওরা 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' গড়তে চায়। কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে ওরা দল বাড়াবে। ছেলের দলকে ফুসলে আনবে নিজেদের দলে। নিজেদের প্রভাব ফেলবে কংগ্রেসের ওপর। কংগ্রেস ছাড়তে তাই, ওরা রাজী নয়। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ওরা নামবেও না।

সোস্যালিষ্টরাও তাই। ওরা সমালোচনা করে কংগ্রেসের। কঠোর মন্তব্য করে গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আর এগোতে চায় না। হয়তো পারেও না। ওদের অধিকাংশের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল গান্ধী-মতবাদের আওতায়।

কে এল আর কে গেল, এ-কথা ভাববার আর সময় নেই। সমাগত যুগ সন্ধিক্ষণ। যুগের দাবী অঙ্গীকার করে যেতে হবে আগে। সম্মুখে। সমগ্র দেশ জুড়ে একটি আওয়াজ শুধু,—মুক্তি চাই। বলতে হবে ইংরেজকে দুটি কথায়,—চলে যাও। ভারত ছেড়ে চলে যাও।

ডাক আসে বিহার থেকে। আসে যুক্ত প্রদেশ থেকে। রামগড় এসে গেছে। ধারে। সন্নিকটে। কিষাণ নেতা সহজানন্দের বিষাণ বাজে বিহারে।

সামনে জাতীয় সপ্তাহ। জাতির বাৎসরিক মুক্তিপণ আর সংগ্রাম ঘোষণার সপ্তাহ। ঐদিন থেকে শুরু করতে হবে সংগ্রাম। সারা দেশ জুড়ে। ৬ই এপ্রিল থেকে। নেতার ডাক পৌঁছোয় ঘরে ঘরে : "রণ দামামা আর তূর্য শঙ্খ বেজে উঠুক। জাতির যৌবন বক্ষে জাগুক রণোন্মাদনা। ধমনীর রক্ত আনন্দে উদ্দাম হয়ে নৃত্য করুক। মুক্তির মহা মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত। আজ শুধু আমাদের উৎসর্গের উপচার নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে লাভ করতে হবে সেই সুদুর্লভ মুক্তি। বহু যুগের নিবিড় সুপ্তির পর ভারতবর্ষের এই নব জাগরণ। তার জন্মান্তর। তার নব শক্তির উদ্বোধন। জননীর পুত্র আর কন্যারা আজ মহোত্তম সংগ্রামে অভিযান শুরু করেছে। সমগ্র জাতি নিয়ে আসুক তার শুচি-শুভ্র অন্তরের প্রেম আর সাহচর্য।"(১)

(১) ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০, ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় প্রকাশিত স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধ থেকে।

রামগড় পৌঁছোলাম আমরা কয়েকজন সম্মেলনের আগের দিন। নেতা আগেই গেছেন। ১৮ই মার্চ সম্মেলনের দিন। সমগ্র ভারতবর্ষের আপোষবিরোধীরা মিলবে রামগড়ে। সারাদিন কেটে গেল সম্মেলনের শেষ আয়োজনে। প্রদেশ প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসে জমা হয়েচে। জনতার ভিড় শিবিরে শিবিরে। নাম হয়েচে কিষাণ নগর।

ঘন অরণ্য-ঘেরা শিবির। ওরই একটু দূরে কংগ্রেস নগর। বিরাট বিশাল ওর আয়োজন। সকালবেলা পৌঁছেছিলাম। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কংগ্রেস নগর দেখে নয়,—কিষাণ নগর দেখে। অপরিমেয় অর্থবল, লোকবল, ধনীর কৃপা আর বদান্যতা গড়ে তুলেছে কংগ্রেস নগর। তারই পাশে কিষাণ নগর। দীন দরিদ্রের চালা। অর্থ নেই, লোকবলই-বা কোথায়? জনগণ আছে। আছে ছড়িয়ে। ওদের মাথার ওপর গণেশ কৈ? যে-দিকে তাকাই ঐ একটিমাত্র লোক। চরকীর মত ঘুরছেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই, দেহ-জ্ঞানও বুঝি নেই।

একদিকে সম্রাটের প্রভাব নিয়ে গান্ধী,—চারপাশে তাঁর দিক্‌পাল রথী আর মহারথীরা। অন্যদিকে এমন একটি লোক, দারিদ্র্য যার সম্পদ, দরিদ্র যার সাথী, গৃহহীন সম্বলহীন অনামী আর অজানারা যার অনুচর। কৌরব আর পাণ্ডবের শিবির উঠেছে পাশাপাশি। সমগ্র ভারতের বৃহৎ আর শ্রেষ্ঠ রাজন্য ও শূর বীর ঘিরে রয়েছে রাজাধিরাজ দুর্যোধনকে, তারই পাশে ভিখিরী পাণ্ডবের ধূলি-মলিন শতছিন্ন শিবির। একান্ত আত্মীয় ছাড়া আর কেউ এল না পক্ষে। সহায় সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসী। সহজানন্দ।

টিনের আর ত্রিপলের ছাউনি উঠেছে চারদিকে। তাঁবু পড়েছে সারি সারি। মঞ্চ তৈরী হয়েছে মাঝখানের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। অনতি-দূরে চাপ বাঁধা ঘন অরণ্যের শ্যামল ছায়া। তারও ওপাশে পাহাড়ের শ্রেণী।

বিকেল দেখা দেবার আগেই দেখা দেয় নীল আকাশের কোলে কালো মেঘ। কালবোশেখীর অভ্যর্থনা। দেখতে দেখতে কালো মেঘ ঢেকে দেয় গোটা আকাশ কালো রংএ। রাশ-ছাড়া ঘোড়ার মত ছুটে আসে ঝড়। আকাশের কালো কোল দাঁতে চিরে খল্ খল্ করে হেসে ওঠে বিদ্যুৎ। ডমরুর ধ্বনি বাজে মুহুর্মুহু। সবশেষে নেমে আসে জলের ধারা অঝোর ধারায়। ছুটতে থাকেন নেতা। এ-ঘর থেকে ও-ঘর। এ-তাঁবু থেকে ও-তাঁবু। সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। গায়ের জামা লেপটে বসেছে গায়ে। ভ্রূক্ষেপ নেই। পেছনে আমরা ক'জন।

গভীর রাত্রি। নিজের তাঁবুতে বসে চায়ের বাটী হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে নেতা বলতে থাকেন,—"যা ভয় হয়েছিল। যায় বুঝি সব ভেস্তেই।"

চাএ চুমুক দিয়ে আবার বলেন,—"বেশি ক্ষতি করেনি। শুধরে নেয়া যাবে সকালবেলা।"

আবার,—"ভাবলাম, ঝড়ও ইংরেজের কথা শুনবে? দেবে সব ভেঙ্গে? গুঁড়িয়ে?"

আবারও,—"ঝড় আসে, থেমেও যায়। দুর্যোগ আসে, কেটেও যায়। তাই না?"

পরদিন সকাল বেলা। সম্মেলনের সকাল বেলা। মিছিল শুরু হয় সকাল বেলা ১০টায়। পুরোভাগে নেতা। শ্যামলা বনের মত ঘন হয়ে আসতে থাকে জনতা। আসে চাপ বেঁধে। ঝাঁকে ঝাঁকে। সীমা নেই। সংখ্যা নেই।

দুপুর গড়াতে-না-গড়াতে সম্মেলন শুরু হয়। শুরু হয় নেতার ভাষণ। বিরাট জনতা থম থম করছে। উন্মুক্ত প্রান্তরে বসেছে সবাই গায়ে গায়ে। শ্বাস রুদ্ধ করে শোনে নেতার বাণী। মাঝে মাঝে পড়ে করতালি। হর্ষধ্বনি হুঙ্কার ছাড়ে কণ্ঠে। কানে তালা লাগিয়ে দেয়। হাজারো কণ্ঠে ওঠে জয়ধ্বনি। উঁচু মঞ্চের ওপর নেতা। পাশে

সহজানন্দ আর সহকর্মীরা। অনর্গল নেতা বলে চলেন হিন্দী ভাষায়।

কংগ্রেসের প্রস্তাব জানা গেছে আগেই। পাটনায় বসেছিল ওয়ার্কিং কমিটি। খসড়া হয়েছে সেখানে। দীর্ঘ প্রস্তাব। নতুন কোন কথা নেই।(১) ছ-মাসের জাবর কাটা। সেই কনৃষ্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্‌ব্লীর বায়নাক্কা, স্বাধীনতার পুরাণো একঘেয়ে মন্থর প্রার্থনা আর ইংরেজের আচরণের অলস ও দুর্বল সমালোচনা। দীর্ঘ প্রস্তাবের কোথাও নেই, দেশ কী করবে, দেশবাসী যাবে কোন্ পথে, কংগ্রেসের আগামী কালের কী হবে কর্মপন্থা। ইংরেজ আর কংগ্রেসের ভেতর চলেছে কবির লড়াই। বিলেত থেকে ইংরেজ কথা বলে, এখান থেকে বলে ওর ভাইস্‌রয়,—জবাব দেয় কংগ্রেস। কংগ্রেস কথা বলে,—জবাব দেয় ইংরেজ। খেয়ুড় গাইছে দুপক্ষ।(২)

মনে যা'ই থাক, প্রত্যক্ষ সহযোগিতা কিম্বা আপোষের কথা ওয়ার্কিং কমিটি মুখ ফুটে বলতে পারেনি। পারেনি, কেননা বলবার সাহস ছিল না। ছ মাসে দেশের মোড় ঘুরে গেছে। ঘুরে গেছে চাকা। আপোষের কথা সরাসরি বলতে, তাই, ওরা ভরসা পায় নি।(৩)

(১)········there was really nothing new in it········এ প্রস্তাবের ভেতর, সত্যি কথা বলতে কি, নতুন-কিছুই ছিল না।

ডাঃ পট্টভির কংগ্রেস ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ।

(২) প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট চাতুরীর যুদ্ধে মেতে উঠেছে।

ডাঃ পট্টভির কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ।

(৩) মহাত্মাজির ভবিষ্যৎ-সত্যাগ্রহ-কল্পনা বিশ্লেষণ করতে যেয়ে ডাঃ পট্টভি বলেছেন,—"গান্ধীজি সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বহু চিঠি পাচ্ছিলেন। সুভাষবাবুর ভয়ে গান্ধী সত্যাগ্রহের সম্ভাবনার কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন, একথাও বহুলোক বলতে ছাড়েনি।

ডাঃ পট্টভির কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃঃ।

ডাঃ পট্টভি তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন,—"ওঁরা (আপোষ বিরোধীরা) ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের গলদ বের করতে ত্রুটি করলেন না। বিশেষ করে শেষ অংশের। কংগ্রেস-প্রস্তাবের গুরুত্ব এর ফলে নাকি অনেকটা খর্ব হয়েছে। সুভাষবাবু বলেছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পাশ হবার পরক্ষণেই গান্ধীর এক বিবৃতি বের হয়, আর তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, আপোষ-মীমাংসার দরজা বন্ধ হয়নি। মহাত্মা গান্ধীর অতি দীর্ঘ ভাষণ তাঁর মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করতে পারে নি। সুভাষবাবুর মতে এই প্রকার ভাষণের ফলেই ইংরেজের কাছে কংগ্রেসের গুরুত্ব কমে গেছে।"

সম্মেলন সম্পর্কে ডাঃ পট্টভি লিখছেন,—"ভারতীয় কংগ্রেসের পূর্বে সম্মেলনের অধিবেশন বসে। বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। সভাপতি (সুভাষ) যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'আগামী সংগ্রামে যাঁরা অংশ নিতে প্রস্তুত, তাঁরা হাত তুলুন',—সেই বিরাট জনতা এক সঙ্গে হাত তুলে তাদের মনোভাব জানায়।"

রণধারা বাহি জয়গান গাহি যারা এসেছিল রামগড়ে, কাজ শেষ করে সবাই ফিরে গেল যার যার কর্ম-ক্ষেত্রে। শুরু হল কংগ্রেস নগরের জাঁকালো কাজ। কিন্তু বিধি বাম। কংগ্রেস বসবার পূর্বাহ্নে মুশল ধারায় বৃষ্টি শুরু হল। একাকার হয়ে গেল পথ ঘাট মাঠ। কেউ ঘরের বার হতে পারল না। ছাতা মাথায় সভাপতি আবুল কালাম আজাদ একবার বহু কষ্টে দেখা দিলেন। কোমর জলে দাঁড়িয়ে জনা-কয়েক প্রতিনিধি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল,—বন্দে মাতরম্। বক্তৃতা পড়া হল না। ধরে নেওয়া হল, পড়া হয়েছে। প্রথম দিনের অধিবেশন হল সমাপ্ত।

দ্বিতীয় দিনের প্রথমার্ধেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। জাতীয় পতাকার বেদীর ধারটা ছিল একটু ডাঙ্গা। সেখানে সমবেত হল মুষ্টিমেয় প্রতিনিধি। কোন রকমে প্রস্তাবটা পড়া হল। ঘোষণা করা হল,—"গৃহীত হয়েছে।" বিকেলের দিকে জল কমে গেলে

মহাত্মা তাঁর ভাষণ দিলেন। অতিদীর্ঘ সে-ভাষণ। জন বিরল বর্ষণ-স্নাত প্রান্তরের এক কোণে বসে একতারা হাতে উদাসী বৈরাগী আপন মনে গান গেয়ে চলেছেন। সমস্যার গুরুত্ব, কংগ্রেসের প্রাকৃতিক দুর্যোগ-লাঞ্ছিত এত বড় বিপর্যয়, তার ওপর সুভাষ-সম্মেলনের আশাতীত সাফল্য,—তবু তিনি সুভাষকে ভুলতে পারেন নি। কোনদিন কাউকে ভোলবার অবকাশ উনি কি দিয়েছেন?

মহাত্মাজি বলে চলেছেন,—"পুত্রের মতই, আমি মনে করে-ছিলাম, সুভাষকে আমি নিজস্ব করে পেয়েছি। কিন্তু তা হল না। তাঁর ভালোবাসা আমি হারিয়ে ফেলেছি।"(১)

অত বড় রামগড়ের ধকল, কিন্তু বিশ্রামের কথা মনের ধারে-কাছেও ঘেঁষবার অবকাশ পেল না। ৬ই এপ্রিলের বেশি দেরি নেই। সারা দেশের ফরোয়ার্ড ব্লক আর অন্যান্য বামপন্থী সমর্থকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সংগ্রামের কর্ম তালিকা।

কিন্তু তার আগেই ইংরেজ সজাগ হয়ে উঠল। যুদ্ধের বাজারে কলকাতায় ১৪৪ ধারার হুকুম অগ্রাহ্য করে নেতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কেই শুধু বক্তৃতা করলেন না, বক্তৃতা শুরু করে দিলেন কলকাতার নানা স্থানে। ইংরেজ দেখল, ভাবল, চুপ করে থাকল। নেতার কেশাগ্রও স্পর্শ করল না। সেকি ভয়ে? বিশ্বগ্রাসী মহাসমরের অন্যতম নায়ক ও স্রষ্টা ইংরেজ ভয়ে ভীত হয়ে সুভাষ বোসকে বন্দী করতে করবে দ্বিধা,—একথা কে বিশ্বাস করতে চাইবে?

কিন্তু তবুও বলব, ভয় একটু ছিল। ইংরেজ একাগ্র হয়ে লক্ষ্য করে চলছিল কংগ্রেসের প্রতিটি পদক্ষেপ। সুভাষচন্দ্র সেদিন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই শুধু কঠোর সমালোচনা করে

(১) ডাঃ পট্টভির কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ

ক্ষান্ত হন নি, পরন্তু কংগ্রেসের অনিশ্চিত চরম ঔদাসীন্যকেও করেছেন তীক্ষ্ণ আক্রমণে জর্জরিত। কংগ্রেসের দাবী ও দাওয়া ইংরেজ শুনেছে, নেতাদের সঙ্গে এ-নিয়ে নানা ধরনের আলাপ আলোচনা করেছে, মাঝে-মধ্যে উচ্চাঙ্গের ভাবাতিশয্যের কথা বলে বাজারও গরম করে তুলেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ইংরেজ জানত যে, টাল বাহানা করে তাকে সময় কাটাতে হবে। ভারতবর্ষের সমর-প্রস্তুতি করে তুলতে হবে পূর্ণাঙ্গ। আর এ-কথাও সে ভেবে দেখেছিল যে, কংগ্রেস চিরদিন বা দীর্ঘদিন এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটিয়ে নিজের অবলুপ্তি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে চাইবে না। একদিন তাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াতে হবে খানিকটা নিজের-অস্তিত্ব বজায় রাখতে, আর খানিকটা সম্ভবত পরবর্তী অধ্যায় রচনার জন্যে। এরই ফাঁকে কংগ্রেস সুভাষ বোসের আক্রমণে খানিকটা যদি দুর্বল হয়ে পড়ে মন্দ কি? সংগ্রামের ছোঁয়াচ আছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জিদ আছে। চোখের সামনে ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীরা এগিয়ে যাবে, ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করে জনগণের কাছে পাবে সমর্থন, স্বীকৃতি, সম্মান,—আর এর ফলে তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জয়টীকা, —অতিদীর্ঘ দিনের গান্ধী-ভক্তি সত্ত্বেও জনসাধারণ ও অগণিত কংগ্রেস কর্মীর মনে জাগায় দোলা। জাগায় প্রশ্ন। ডেকে আনে জোরালো ও ঘোরালো দুশ্চিন্তা। এমনি করে যদি কংগ্রেসের ভেতর অন্তর্কলহ বেধে যায়, ইংরেজ সে সম্ভাবনায় পুলকিত না হবেই বা কেন?

সুভাষচন্দ্রকে বন্দী না করবার ভেতর নিশ্চয়ই খানিকটা ঝুঁকি আছে। ইংরেজ সে ঝুঁকি নেবে। নেবে আরও বড় ঝুঁকি লঘু করবার জন্যে। তাই, ওঁকে বন্দী করতে যেয়ে কংগ্রেসের এই সম্ভাবিত অন্তর্দ্বন্দ্বের পথে বাগড়া দিতে সে ভয় পায়। বরং প্রয়োজন হলে সে উস্কে দেবে। তাই বলে সুভাষ বোসকেও শক্তি বাড়াতে সে দেবে না। তাঁর দল থেকে তাঁকে বিছিন্ন করে রাখবে। দলের সবাইকে

ওঁকে একে ধরে, আটক করে, ওঁকে করে তুলবে শক্তিহীন, দুর্বল। ঠুঁটো জগন্নাথ একা একা লোহার খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে গরাদে মাথা ঠুকতে থাক। রক্তাক্ত করুক নিজেকে। করুক ক্ষত বিক্ষত। তারপর একদিন ঐ অকর্মণ্য দেহটা গারদের এক কোণে টেনে ফেলে দিলেই সে হবে নিশ্চিন্ত।

বেছে বেছে ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের পাঠানো হল লৌহ কবাটের আড়ালে। কারণে অকারণে চলল গ্রেপ্তার। বন্দীর সংখ্যা দিনকার দিন বাড়তে থাকল ভারতরক্ষা আইনের কল্যাণে। সভা নিষিদ্ধ হল। নিষিদ্ধ হল মিছিল। নানা প্রদেশের আফিসগুলি অতর্কিত আক্রমণে পুলিশ দিল ভেঙ্গে। লুঠ করে নিয়ে গেল তৈজস পত্র। কংগ্রেসের ইতিহাস রচয়িতা ডাঃ পট্টভি লিখছেন,—"...এর মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক চরম পত্রের কল্যাণে বৃটিশ সরকারকে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে বাধ্য করে ফেলেছে। ইচ্ছে করলে সরকার আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে পারত। কিন্তু তা না করে ইংরেজ উল্টো পথ বেছে নিল। ফরোয়ার্ড ব্লক যাতে সংগ্রাম শুরু করতে না পারে তার জন্যে ইংরেজ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। অন্তরীণ করে, নির্বাসনে পাঠিয়ে এবং আরও অনেক রকমে ফরোয়ার্ড ব্লকের সভ্যদের নাজেহাল করতে ইংরেজ দ্বিধা করল না। ইংরেজের এই জুলুমের প্রতিবাদে আত্মসম্মান বজায় রাখতে দলে দলে কারাবরণ করা ছাড়া তাদের আর কোনও গত্যন্তর রইল না।"(১)

বাংলার উপর নেমে এল ইংরেজের প্রচণ্ডতম আক্রমণ। কর্মীদের ওপর চলল আটক আইনের অবাধ প্রয়োগ। জেলায় বহু অফিসে পড়ল তালা। কতকগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল। প্রতিদিন বড়-ছোট শত শত ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী ও তাদের সমর্থকদের ঢোকানো হল ইংরেজের জেলখানায়। শুরু হল সংগ্রাম।

(১) কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ

নেতা গাড়ী পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন অনেক রাতে।

একা বসে ছিলেন ঘরে। সামনে খোলা একটা ফাইল। দূর থেকে দেখলাম, দাগ কেটে চলেছেন ক্রমাগত আর পাতা ওল্টাচ্ছেন। কাছে যেয়ে সামনের চেয়ার ধরে দাঁড়ালাম নিঃশব্দে। নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতা ঘরের ভেতর। পেন্সিলে দাগ কাটবার শব্দটাও কানে লাগছিল। সহসা মুখ তুলে বললেন,—"যতটা খবর পেয়েছি, আমাদের হাজারের বেশি কর্মী ধরা পড়েছে।"

আবার ঝুঁকে পড়লেন ফাইলের ওপর। একটু বাদে আবার বললেন,—"কিন্তু খবর পাইনি এমন আরও অনেক আছে।"

আবার একটু ছেদ। হাতের পেন্সিলটা ডান ধারে সরিয়ে রেখে দুটো কনুইএর ওপর ভর করে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বসলেন। জোড়া করতল কপালে ঠেকিয়ে একটু কী ভাবলেন। পরক্ষণেই বলে উঠলেন, —"এ্যাসেম্ব্লী কি চলছে?"

"নাতো।" উত্তর দিলাম।

"কিন্তু দেহ? পেটের ব্যথাটা সেরেছে?"

"সামান্য আছে।"

কয়েকদিন আগে বাংলার হিন্দুসভা টাউন হলে ফরোয়ার্ড ব্লক ও মুশলিম লিগ-প্যাক্টের প্রতিবাদে এক জনসভা আহ্বান করেছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি করে সভা ডাকা হয়েছিল। সভায় আমরাও গেলাম অনেকে। তুমুল সংঘর্ষের মধ্যে সভা আমরা দখল করে ফেলি। টেবলের ওপর দাঁড়িয়ে যখন আমি বক্তৃতা দিয়ে চলেছি, অতর্কিতে দূরের কেউ ছুড়ে মারে চেয়ারের একখানা হাতল। ওটা এসে পড়ল আমার মুখের ওপর। দুটো দাঁত গেল ভেঙে। ওপরের ঠোঁট কেটে ঝুলে পড়ল অনেকটা। ওদেরই একজনের লাঠিও পড়েছিল আমার তলপেটে। ওরই ব্যথা।

"কাল থেকে তুমি হলে প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী। একটু কষ্ট হবে কিন্তু উপায় নেই।"

আগের সেক্রেটারী সত্যরঞ্জন বক্সী কয়েকদিন পূর্বে বন্দী হয়েছেন।

ফাইলটা গুটিয়ে আবার বললেন,—"এটা নিয়ে যাও। বাড়ীতে রেখো না। সার্চ করে ওরা নিয়ে নেবে। ....হ্যাঁ, ফণী আছে, তোমার বেশি অসুবিধে হবে না। মুকুন্দ বাবুও সাহায্য করবেন।"

ফণী মজুমদার আর মুকুন্দলাল সরকার। দুজনেই আমার শুধু পরিচিত নন, অন্তরঙ্গও। মুকুন্দলাল সরকার,—এস, মুকুন্দিলাল। ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের পুরোধা ও পথিকৃৎ। নেতার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা আর প্রেমই শুধু ছিল না, ছিল তাঁর প্রতি-কার্যের ওপর মুকুন্দবাবুর প্রগাঢ় বিশ্বাস। ফণী মজুমদার ছিলেন আফিস-সেক্রেটারী। মুকুন্দবাবুকে বেশি সময় দিতে হত ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকার জন্যে। মুকুন্দবাবু মারা গেছেন।

ঘরে বসেই শুনতে পেলাম গাড়ীর শব্দ। গাড়ী এসে থামল নীচের গাড়ী বারান্দায়। শব্দ থেমে গেল। নেতা বললেন,—"গাড়ী নিয়ে বাড়ী যাও। রাত হয়েছে।"

সত্যি বেশ রাত হয়েছিল। বারোটার কাছাকাছি। চারদিক ঝিমিয়ে পড়েছে। বাড়ীর ওপর নেমে এসেছে ক্লান্ত নৈঃশব্দ। ধীরে ধীরে নাবছিলাম নীচে। মাঝপথে দেখা হল। দেখা হল একটি নারীর সঙ্গে। কালো মেয়ে। মাথায় কাপড় নেই। চকিতে গভীর দুটি কালো চোখ থমকে দাঁড়াল আমার মুখের ওপর। টানা দুটি চোখ। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। পাশ কাটিয়ে দুখানি চঞ্চল পা ওপরে উঠে গেল। রেখে গেল কবির একটি কথা : কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। বাড়ী ফিরে এলাম। কিন্তু সেই ক্ষণিকের দেখা দুটি আয়ত কালো চোখ আমার দিকে তেমনি করে চেয়ে রইল অপলকে।

জয়ঢাক বেজে উঠল সারা কলকাতার বুকে। ইলেকশনের জয়ঢাক। কর্পোরেশনের ইলেকশন। কলকাতার মানচিত্র সামনে বিছিয়ে হাতে কলম নিয়ে বসলেন নেতা। আমরা চারপাশে। দাগ

পড়ছে মানচিত্রের স্থানে স্থানে। সভার স্থান স্থির করতে হবে। দুর্বল অঞ্চল আগে দখলে আনতে হবে সভা, মিছিল আর তদ্বির দিয়ে। এ্যাড্ হক কমিটি গা ঢাকা দিয়েছে। পাত্তা নেই কোথাও। আমাদের মনোনীত প্রার্থীই বেশি। মাঝে মাঝে স্বতন্ত্র আর হিন্দু-সভার প্রার্থী। মুশলমান প্রায় সবাই মুশলিমলিগের ছাপ-মারা। কলকাতার বাতাস তপ্ত হয়ে উঠল। সভা চলল এক নাগাড়ে। এক-একদিন পাঁচটা, আবার কোনদিন সাতটা। কণ্ঠ হয়ে উঠল গ্রামোফোন। দমে চলছে। চলছে অনর্গল।

নির্বাচনে আমাদেরই জয় হল কিন্তু সামনে দেখা দিল বড় একটা বাধা। মুশলিমলিগের বেশ বড় একটা দল জিতে গেল। ওরা আর কিছু-কিছু ছুটকো স্বতন্ত্র মিলে গেলে ওদের দলই ভারী হয়ে পড়ে। চেষ্টাও চলে ওদের মিতালির।

দেশবন্ধুর পর থেকে কর্পোরেশনে একটানা চলেছে কংগ্রেসের আধিপত্য। তার হবে অবসান? ওখানে ঢুকবে যত সুবিধাবাদী ভুঁইফোড় দালাল? টাকা আর এ্যাডহক কংগ্রেসের সাহায্যে ওরা কেউ কেউ জিতেছে। ওরাই করবে কর্পোরেশনে মাতব্বরি? নেতা চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

সত্যিই সেদিন কর্পোরেশন ছিল আমাদের মস্ত বড় হাতিয়ার। ঐ একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে ইংরেজ-প্রভুত্বের হয়েছে চিরতরে অবসান। এ্যাসেম্ব্লী, কাউন্সিল আর সরকারী দপ্তরখানার দুয়োর যাদের কাছে ছিল চির অবরুদ্ধ, তারা স্থান পেত ওখানে। কত নির্যাতিত দেশ-সেবকের অন্নের সংস্থান হয়েছে। কত ভেঙ্গে-যাওয়া সংসার জোড়া লেগেছে ওখানকার কল্যাণে।

ফরোয়ার্ড ব্লক আর মুশলিমলিগের মধ্যে গড়ে ওঠে প্যাক্ট। নেতা নির্বাচিত হলেন অলডারম্যান। মেয়র হলেন সিদ্দিকী। বহির্ভারতের রক্ত বহন করা সত্ত্বেও আবদার রহমান সিদ্দিকী ভারতবর্ষের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে দিয়েছিলেন অঙ্গাঙ্গী। আলি ভাইদের মহম্মদ আলীর

ছিলেন সহকর্মী, আর তাঁর কাগজ 'কমরেডের' পরিচালক। মুশলিম-লিগের সদস্য হয়েও এই স্বতন্ত্রবাদী মানুষটি মাঝে মাঝে বলে বসতেন অনাবৃত সাংঘাতিক সত্য কথা। মনে প্রাণে ছিলেন ইংরেজ বিদ্বেষী। আর কোন যোগসূত্র না থাকলেও ঐ একটি মাত্র কারণে নেতার মনে তিনি স্থান পেলেন অবলীলায়।

কলকাতার এক শ্রেণীর মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা এটা ভাবতে পারেনি। অকস্মাৎ বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়বার উপক্রম হয়েছিল। বাগ্‌ড়া দিলেন সুভাষ বোস। রাগ হবে না? কংগ্রেসের মহাত্মা থেকে আজাদ সাহেব, সবাই চেষ্টা করেছেন মুশলিম-লিগের সঙ্গে আপোষ করতে। সফল হননি কেউ। গান্ধী জিন্নাকে কায়েদে আজম ডেকেও না। ব্ল্যাঙ্ক চেকে সই দিতে চেয়েছিলেন গান্ধী, তবুও না। সেই মুশলিমলিগের সঙ্গে নিমেষে সুভাষ বোস কত সহজেই-না মিতালি করে বসলেন। উঠল না দ্বিজাতির প্রশ্ন। উঠল না রাজনীতির চুল-চেরা বিচার আর বিশ্লেষণ। দেশ খণ্ড করবার কল্পনা থাকল অনেক পেছনে। সহজ স্বাভাবিক ঘরোয়া কথায় দুটি বিবদমান দল হাতে হাত মিলালো।

বড় বড় ব্যারিষ্টার, টাকার কুমীর আর নানাভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কতক কতক কলকাতার মানুষ হঠাৎ আবিষ্কার করে বসল যে, তারাই একমাত্র সনাতন ঐতিহ্য বহনকারী অকৃত্রিম ও খাঁটি হিন্দু। হিন্দুর চিরকালের শত্রু মুশলমান, সেই মুশলমানের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান মুশলিমলিগের সঙ্গে প্যাক্ট করে যে-মহাপাপের ভাগী হয়ে বসলেন সুভাষচন্দ্র, তার প্রতিবাদ করেই তারা ক্ষান্ত রইল না,—করতে চাইল প্রতিকার। লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে এদের শক্তি জোগাল এ্যাড্‌ হক কংগ্রেস।

বস্তুত দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' আর সুভাষচন্দ্রের 'কর্পোরেশন প্যাক্টের' পেছনে বাংলার নিজস্ব সমস্যা শুধু নয়, পরন্তু সর্বভারতীয় সমস্যা-সমাধানের যে-সহজ ইঙ্গিত সেদিন দেখা দিতে চেয়েছিল একান্ত

সাবলীল ও সুস্থ ভাবে, তাকে অভ্যর্থনা করবার মত দূরপ্রসারী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বাংলার বাইরে তো নয়ই, বাংলায়ও নেতৃস্থানীয়-দের মধ্যে কম ছিল। আর তা ছিল বলেই সমস্যার সমাধান করে নয়,—জাতির হৃদপিণ্ডের অংশ বিনিময়ে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের মুক্তি ক্রয় করতে হয়েছিল।

বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রশ্নও নেতা ভোলেননি। সামনে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আসন্ন। অবশ্যম্ভাবী। তার পূর্বক্ষণে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায়, যদি কোন উপায়ে,—সে উপায় যত দুশ্চর হোক, অপ্রিয় হোক, হোক দামী,—একবার একযোগে হিন্দু আর মুশলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পথ খুঁজে পায়, তার ফলে ইংরেজের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক বাংলার তখনকার চরম প্রতিক্রিয়াশীল হক-মন্ত্রিত্বেরই শুধু অপসারণ ঘটবে না, ইংরেজের মৃত্যুকালও হয়ে উঠবে সন্নিকট। আর এই সংঘর্ষের ভেতর দিয়েই বের হবে হিন্দু-মুশলমানের নয়,—বাঙ্গালী জাতির সংগ্রামমুখী এক নতুন মানস-ভঙ্গী যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের উদার সুন্দর আর দেশ ও সমাজের নতুন পূজারীরা। এই প্যাক্টের ফলে যদি সত্যিই অপচয় কিছু ঘটেই থাকে,—সেদিনের সেই প্রাপ্তি কি তা পরিপূরণ করে দিতে পারবে না?

ভবিষ্যতের এই না-পাওয়া অ-দেখা প্রাপ্তির আশায় রাশিয়া হিটলারের সঙ্গে প্যাক্ট করেছিল,—প্যাক্ট করতে চাইছে আবার মিত্র শক্তি অর্থাৎ ইংরেজ ও আমেরিকার সাথে। কই, তার তো জাত গেল না? নিদ্রাহীন একটা রাত্রিও তো তার কাটল না একথা ভেবে যে লোকে তাকে কী ভাববে? কোন্ চোখে দেখবে তাকে? তবে?

স্বাধীনতা হারায়নি, হয়তো হারাতে হতে পারে, এই ভয়ে ইংরেজের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল,—কম্যুনিজমের চির শত্রু চার্চিল, মরিয়া হয়ে ধর্না দিয়েছেন রাশিয়ার দুয়ারে। তাঁরও কি মতিভ্রম হয়েছিল?

নেতার উদাত্ত কণ্ঠ থেকে বেরোল,—"মুশলিমলিগ, হিন্দুসভা, কংগ্রেস, যে-কেউ, আজকের আসন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রাম-

মুখী ভারতবর্ষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে দাঁড়াবে, বিন্দুমাত্রও সাহায্য করবে আজকের এই মহা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে,—প্যাক্ট তো দূরের কথা,—আমি চিরজীবন তার গোলামী অঙ্গীকার করে নিতেও কুণ্ঠিত হব না। দুশো বছর ইংরেজের গোলামী করে ভারতবর্ষের মৃত্যুর পথ আমরা প্রশস্ত করেছি। ইংরেজের গোলামী নিঃশেষ করতে আমার দেশবাসীর গোলামী যদি আমাকে করতেই হয়, তা হবে আমার সহস্রবার কাম্য।"(১)

ইওরোপের রূপ পাল্‌টাচ্ছে। পাল্‌টাচ্ছে প্রতিদিন। পাল্‌টাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। বিলেতের পুরানো সরকার বিদায় নিয়েছে। উইন্‌স্টন্‌ চার্চিলকে প্রধান মন্ত্রী করে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। ভারত দপ্তরের ভার পড়েছে জেটল্যাণ্ডের পরিবর্তে এ্যামেরীর ওপর।

যুদ্ধের গতি হয়ে উঠেছে দুর্বার। অপ্রতিহত গতি নিয়ে এগিয়ে আসছেন হিটলার। হল্যাণ্ড, বেল্‌জিয়াম, ফ্রান্সের দুর্জয় ম্যাজিনো লাইন সমভূমি হয়ে গেল ওঁর পাষাণ পেষণে। প্যারিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হিটলার-বাহিনী। মৃত্যুর পাংশু ভীতি কাঁপিয়ে তুলেছে সমগ্র ফরাসী জাতকে। ডানকার্কের দিকে পিঠ ঠেকিয়ে যুদ্ধের অভিনয় করছে ইংরেজ।

যুদ্ধের মানচিত্র সর্বক্ষণ খোলা থাকে নেতার টেব্‌ল্‌এ। লাল পেন্সিলের দাগে আর আল্‌পিনের ঘায়ে মানচিত্র হয়ে ওঠে ক্ষত বিক্ষত। ঘন্টায় ঘন্টায় লাল দাগ এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে হিটলারের দম্ভ আর জয়নাদ। ১৪ই জুন হল ফ্রান্সের পরিপূর্ণ পতন। ডান-কার্কের শ্মশান ক্ষেত্রে সর্বস্ব খুইয়ে ইংরেজ ফিরে গেল আপন ঘরে।

(১) কর্পোরেশন-ইলেকশন পর্ব শেষ হবার পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রদত্ত নেতার বক্তৃতা-অংশ।

বিজয়ের প্রশ্ন তার সাঙ্গ হয়ে গেছে। আত্মরক্ষার শেষ প্রশ্নে সে এসে দাঁড়িয়েছে।

এর সামান্য কয়েকটা দিন আগে ক্রীপ্‌স্‌ নিযুক্ত হন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত। বিলেতের রুশ রাষ্ট্রদূত মলোটভকে এই খবর জানিয়ে দেওয়া হল। ক্রীপ্‌স্‌ চললেন রাশিয়ায়।

ভারতবর্ষ থেকে ক্রীপ্‌স্‌ যান চীনে। সেখান থেকে মস্কো। সে-দিন মস্কোর রাজনীতি ধুরন্ধরদের সঙ্গে ক্রীপ্‌সের কী প্রকার সদালোচনা হয়েছিল, তার বিবরণ জানবার উপায় নেই। কিন্তু তার ভেতর এমন কোন নিশ্চিত আশার ইঙ্গিত নিশ্চয়ই ছিল, যার ফলে ক্রীপ্‌স্‌কে রাষ্ট্রদূত হয়ে যেতে হল রাশিয়ায়।

ইংরেজ আশেপাশে চায়। জমাট অন্ধকার ছাড়া তার চোখে আর কিছু পড়ে না। পোল্যাণ্ড থেকে ইংলিশ চ্যানেল,—কোন্‌ ভরসায় সে বাঁচতে চাইবে? সাথী নেই। প্রস্তুতি নেই। উপকরণও যৎসামান্য। নেই নিকট-ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনা। শেষ চেষ্টা হিসেবে আর আত্মরক্ষার দুর্নিবার আগ্রহে ইংরেজ সেদিন ক্রীপ্‌স্‌কে পাঠিয়েছিল রাশিয়ায়। ক্রীপ্‌সের গায়ে রয়েছে খানিকটা সোস্যা-লিজম্‌এর গন্ধ। কণ্ঠে মার্কসএর ভাষা। ও-ভাষা রাশিয়ার চেনা, জানা, আর সহজবোধ্যও। একটুও কি সম্মোহন জাগাবে না?

গালে হাত দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যরা বসে বসে ভাবছেন ওয়ার্ধায়। ভাবছেন সাতদিন ধরে। ফ্রান্স গেল। এইবার ইংলণ্ড। আর কত দেরি? তারপর? কার কাছে জহরলাল ও আজাদ পাঠাবেন স্বাধীনতার আবেদন? ইংলণ্ড বিজিত হলে লেজুড় ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক অবস্থিতি দাঁড়াবে কেমন? কোথায়? তখনও কি ইংলণ্ডে? না, বার্লিনে?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় কংগ্রেস কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারে না। শুধু এক-টানা রোমন্থন চলে গত জীবনের আর অর্থ ও সঙ্গতিহীন প্রবন্ধ রচনায়।

ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলন শেষ করে নেতা ফিরে আসেন

কলকাতায়। ঢাকা-সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন রাজেন দেব। অদূরে নাগপুরের সম্মেলন। ফরোয়ার্ড ব্লকের বাৎসরিক অধিবেশন। কিন্তু তার পূর্বেই নেতার মনে জাগে নতুন এক কল্পনা। ঢাকায় এর সূত্রপাত। সন্ধান পেয়েছেন যাত্রা-পথের। পথ সঙ্কীর্ণ। ঋজুও নয়। তবু পথ। চেয়ে থাকেন নেতা ঐ স্বল্প পরিসর কণ্টকাকীর্ণ পায়ে চলার পথের পানে।

নাগপুর সম্মেলনের ভার নিয়েছিলেন রুইকর। আয়োজন সম্পূর্ণ প্রায়। নেতা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। সকালবেলা এসেছিলাম এলগিন রোডে। আসবার কথা ছিল। বাংলার প্রতিনিধিদের নামের তালিকা হাতে পৌঁছোলাম সকাল আটটায়। নেতা বাড়ী নেই। সকালবেলাই বেরিয়ে গেছেন। সঙ্গে ছিল একটি মেয়ে। কালো মেয়ে। শুনেই চোখের ওপর ভেসে উঠল ছুটি কালো চোখ। নরম টানা ছুটি কাজল কালো চোখ।

বার কয়েক চা খাবার পর বাজল দশটা। নেতা ঢুকলেন ঘরে। একা। জিজ্ঞেস করতে হল না। নিজে থেকেই বললেন, "দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলুম।"

ঠোঁট বুঁজে চেয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে। একটু ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে মুখে। বিষাদের পাতলা পর্দা তার গায়ে। বললেন,—"কিছুতেই ছাড়ল না। নিয়ে গেল।"

"কে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"সেই যে, সেদিন সিঁড়িতে যার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল—"

নিজের অজ্ঞাতেই হয়তো মুখ থেকে বেরিয়ে থাকবে,—হুঁ।

নিজে থেকেই বলে চললেন,—"আনন্দময়ীর কাছে। ঢাকার মা আনন্দময়ীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু"—কথা আর আমার বলা হল না। ঘরে ঢুকলেন বম্বের নাথুরাম পারেখ, গুজরাটের ইন্দুলাল যাজ্ঞিক আর শার্দুল সিং। (১)

(১) 'কালো মেয়ের' কথা আরও বলবার ইচ্ছে থাকল দ্বিতীয় খণ্ডে।

সব-কিছুই যেন ঢিলে হয়ে গেল। গম-গম-করা কলকাতার আফিস, রাস্তা, পার্ক, কারখানা সর্বত্র শুধু একই কথা : ইংরেজ এবার পটল তুলল। সবাইএর মুখ চোখ জ্বলজ্বলে। ইংরেজ হারছে, ইংরেজ ডুবছে, ইংরেজ মার খাচ্ছে। ছুশো বছরের অবিচার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে ওরা পারেনি। অক্ষমতার বেদনা ছিল। ছিল জ্বালা। বুকের অন্তরালে ক্ষুব্ধ প্রতিশোধ-স্পৃহা গুমরে গুমরে গজরাচ্ছিল। এবার সুযোগ এসেছে তা বলবার, প্রকাশ করবার। হিট্‌লারের জয়ে নয়,—আনন্দ ইংরেজের হারে, ওর বিপর্যয়ে। যে-কেউ ইংরেজকে কাবু করত, অন্তর ওদের তাতেই খুশিতে ভরে উঠত।

যুদ্ধের ভাষাও ওরা রপ্ত করে ফেলেছে। মোহনবাগান হেরে গেছে মহামেডান স্পোর্টিংএর কাছে। ওরা আর হারা কথাটা বলে না। বলে, মোহনবাগানের ডানকার্ক হয়ে গেল। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান জব্বর। লুঙ্গী পরে হাতে চাবুক নিয়ে গাড়ী চালায় জব্বর মিঞা। গাড়ী চালায় কলকাতার রাজপথে। সেও জানে কত কথা। অনেক কথা। অস্থিসার পক্ষীরাজ চলতে নারাজ। চাবুক পড়ে পিঠে। যন্ত্রণায় পিছু হটে পক্ষীরাজ। জব্বর মিঞা রাশ টেনে ধ'রে বলে ওঠে,—"শালার ঘোড়া ইংরেজের মতো শুধু পিছু হটতেই জানে".........

ঘরে বসে ম্যাপ খুলে বসে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরানী—সায় দোকানী। সময় নেই, অসময়ও নেই। ঠোঁটের ডগায় সাঁটা রয়েছে একটা কথা : যুদ্ধ। চলে তারই আলোচনা।

বৃষ্টির ধারার ন্যায় বোমা পড়ছে ইংলণ্ডের ওপর। তছনছ হয়ে গেল এত সাধের লণ্ডন। সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। বিজ্ঞের মত একজন বলে ওঠে,—বিলেতের রাজারাণী পালিয়েছেন কানাডায়। ...হিটলার যে আসছে-সপ্তাহেই নেমে পড়ছে খাস বাকিংহাম প্যালেসের দরজায়.........

গণৎকারের পশার অসম্ভব বেড়ে গেছে। পাঁজির বর্ষফল মুখস্থ হয়ে গেল আগাগোড়া। ডেলি প্যাসেঞ্জার পানের খিলিটা মুখে ফেলে দিয়ে বলে,—হবে না? শনি যে মন্ত্রী হয়ে বসেছেন…! হিটলারের ডাইনে বাঁয়ে জোড়া গণৎকার। বিনা গণনায় পাদমেকং উঁহু…হবে না? ওযে ব্রহ্মচারী…বে করেনি, কঠোর নিরামিষাশী… মদ খাওয়া তো দূরের কথা স্পর্শ মাত্রেণ প্রাণদণ্ড……গোপনে জনা কয়েক ভারতীয় যোগী হিটলারের পাশে পৌঁছে গেছে……

কলকাতায় ইংরেজের সংখ্যা দিনকার দিন কমছে। অনেকেই যুদ্ধে চালান হয়ে গেছে। বাদ-বাকির মুখের দিকে চাওয়া যায় না। মুখের হাসি উবে গেছে। গায়ের জামা ঢিলে। পাতলুন ঢল্‌ঢলে। মুখ ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর।

শুধু এদেশে নয়, ওখানেও। বিলেতেও। একজন মন্ত্রী তো সখেদে বলেই ফেলেছেন,—"এদের দেখে মনে হয়, বুঝিবা দেশশুদ্ধ সবাই শবের আনুগমন করছে…"

সবাইএর মুখে মাত্র একটি প্রশ্ন : আর কতদূর? দেরি কত? সাগ্রহে অপেক্ষা করছে ওরা সেই দিনের জন্যে যেদিন নতজানু হয়ে ইংরেজ মার্জনা ভিক্ষে করবে। হবে ইংরেজের বিচার। দুশো বছরের বিচার। জুলুম, ঠগবাজী, বিশ্বাসঘাতকতার বিচার।

কিন্তু জহরলাল আর তাঁর মুষ্টিমেয় সমর্থক দেশবাসীর এই মনোভাব জেনেও বলতে চান না এই কারণে যে ও-কথা সাগর পারের ওরা শুনতে পেলে তাঁর প্রতি এতকালের প্রীতি উবে যাবে। মূলতঃ মুখে সর্বাধুনিক দর্শন ও রাজনৈতিকবাদের প্রশস্তি গাইলেও জহরলালের দৃষ্টিভঙ্গী ভিক্টোরীয় যুগের উদারনৈতিক মতবাদ ঘেঁষা। ইংরেজের তৈরী ডেমোক্রাসীর তিনি অন্ধ স্তাবক। ইংরেজের সংবিধান, তার বিবর্তন-পারম্পর্য, তার বাহ্যিক অনুবর্তিতা, সংরক্ষণশীলতা এবং ইংরেজী ধাঁচের দেশভক্তির প্রাবল্যও তাই তাঁর চরিত্রে পরিস্ফুট।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চাইতেও আন্তর্জাতিক কাব্য-স্বপ্ন বেশী করে জাগে তাঁর মনে এরই পরিপ্রেক্ষিতে। সেদিনের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবিত প্রতিটি দীর্ঘ প্রবন্ধে দেখতে পাওয়া যাবে এই ফেনায়িত, সস্তা, অবাস্তব ভাবাবেগের শাব্দিক সম্প্রসারণ।

ইওরোপের তদানীন্তন পরিস্থিতির আলোচনা করতে যেয়ে তিনি, তাই, অবাধে বলতে পারলেন,……

"There was a powerful current of sympathy for France and for England immediately after Dunkirk during the air blitz over England. Congress which had been on the verge of civil disobedience, could not think in terms of any such movement while the very existence of free England hung in the balance." (১)

ডানকার্কের পলায়ন-লাঞ্ছনা আর বোমার ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের জন্যে প্রচণ্ড সহানুভূতিতে এ দেশের আপামর সবাই হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করেছিল, এই পরম সত্য জহরলাল কোন্ প্রদেশে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এ কথাটা বেমালুম চেপে গেছেন। কিন্তু কংগ্রেস যে সত্যই আইন অমান্যের কল্পনা পরিত্যাগ করেছে ইংরেজের মুখ চেয়ে, এ সত্য তিনি স্বীকারও করেছেন।

জহরলালের এই উপন্যাস সুলভ ইংরেজ-প্রীতিকর রচনা ও রটনার প্রতিবাদ করেছেন তারই একজন বিদেশী অতিথি। ফ্রান্সের ঈভ কুরী লিখছেন,—

"The grim reality was that apart from Nehru and a few others, the politically minded Indians showed little interest in the United Nation's cause, little faith in an allied

(১) দি ডিস্‌কভারী অব্ ইণ্ডিয়া, ৪৬১ পৃঃ

victory and almost no understanding at all of the practical necessity of the war. Many of them rejoiced openly at Britain's temporary weakness, which gave India a chance to blackmail her. They are obsessed by words only: Independence now." (১)

অর্থাৎ "মিত্র পক্ষের অনুকূল স্বার্থ, তাদের বিজয়ের প্রশ্ন অথবা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছে নিয়ে নেহেরু বা ঐ ধরনের দু-চার জন ছাড়া রাজনৈতিক চেতনাশীল ভারতবাসীর মনে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না, এইটাই রূঢ় বাস্তবতা। ইংরেজের সাময়িক বিপর্যয়ে ওরা খুশি হয়ে ওঠে, আর তা বলে ফেলে প্রকাশ্যে। পাঁকে-ডোবা ইংরেজের উদ্দেশ্যে ওরা ব্যবহার করে কটূক্তি। একটি মাত্র কথাই ওদের সবাইএর অন্তর আচ্ছন্ন করে রেখেছে :

"এইবার আমাদের মুক্তি"।

সদ্যাগতা একজন বিদেশিনীর পক্ষে এই সহজ সত্য বুঝতে সামান্য কটা দিনই যথেষ্ট বলে মনে হল, কিন্তু জহরলাল এ দেশের লোক হয়ে, জননায়ক হয়ে, কংগ্রেসের পরিচালক হয়ে সত্যই কি ধরতে পারেন নি তাঁর দেশবাসীর মনোভাব? পেরেছিলেন। আর পেরেছিলেন খুব ভালো করেই। পাছে বন্ধু ইংরেজ ও তার মিত্রেরা বিরূপ হয়ে ওঠে শুধু এই আশঙ্কায় জহরলাল সেদিন কংগ্রেসকে এই পরম সত্য স্বীকার করতে দেন নি। উপরন্তু এই উল্টো কথাই তাঁর প্রিয় বন্ধুদের শোনাতে চাইলেন যে, ইংলণ্ডের এই দোদুল্যমান অদৃষ্টের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, কংগ্রেসের লক্ষ্য আইন অমান্য হলেও, ও কথা কংগ্রেস আর ভাবতেও পারে না।

(১) জার্নি এ্যামোং ওয়ারিয়ার্স, ৪৪৭ পৃঃ। এ-কথা উল্লেখযোগ্য যে, মিস্ কুরী এদেশে এসেছিলেন মিত্রপক্ষের সামরিক সংবাদ পরিবেষনকারিণী রূপে।

শুধু দেশবাসীর মনের কথাই-বা কেন, অন্তরে অন্তরে জহরলালও কি ইংরেজকে জানেন না ? ধরতে পারেন নি ইংরেজের প্রকৃত রূপ ? সবই জানতেন জহরলাল। আর ভালো করে চিনতেনও ইংরেজকে। রামগড় কংগ্রেসের কিছুদিন পর, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০, জহরলাল এলাহাবাদ থেকে এক চিঠিতে আজাদকে লিখছেন, "যুদ্ধের শুরু থেকেই বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ও নীতি প্রমাণ করেছে যে তারা অনেক চিন্তার পর সুপরিকল্পিত ভাবে সাম্রাজ্যবাদী পন্থা অনুসরণ করেছে। যুদ্ধের পূর্বে চেম্বারলেন-সরকার অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে কয়েকটি ক্ষেত্রে নাৎশি ও ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করেছিল। এবং ইওরোপের গণতন্ত্র ধ্বংসও করেছিল। আবিসিনিয়া, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং আল্‌বেনিয়া তার দৃষ্টান্ত। মাঞ্চুরিয়ার বেলায়ও তারা এই একই নীতি অবলম্বন করে। চেম্বারলেন-সরকারের মত প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী সরকার বিগত একশো বছরের মধ্যে ইংলণ্ডে দেখা দেয় নি।

"অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিজেদের সাম্রাজ্য যখন বিপন্ন হল, গণতন্ত্রের ধুয়ো তুলতে আটকাল না ওদের কোথাও। আর তারই আড়ালে গা ঢেকে যুদ্ধে নেমে পড়ল। রাতারাতি গণতন্ত্রের প্রতি ওদের এই ভক্তির আতিশয্য মেনে নেওয়া একটু কষ্টকর বই কি !"

এত সব জেনে এবং কংগ্রেস সভাপতি আজাদ সাহেবকে বলেও ছমাস যেতে-না-যেতে জহরলাল ইংরেজ-প্রেমে অমন করে হাবুডুবু খাবেন,—মনে করতে দ্বিধা ও বিস্ময় জাগে প্রচুর। কিন্তু তবু একথা নিয়তির মতই নিষ্ঠুর ও সত্য।

২৫শে মে, ১৯৪০, আজাদ সাহেব নৈনিতাল থেকে জহরলালকে লিখছেন,—"রাজেন বাবুকে লেখা চিঠিতে আপনি লিখেছেন,—'আমরা প্রস্তুত থাকলেও সত্যাগ্রহের নির্দেশ এখন দেয়া যেতে পারে না। ঠিক এই সময়ে তা করা ভুল হবে। বৃটেন এখন দুর্দশাগ্রস্ত। তার দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরা ঠিক হবে না।' আপনার লক্ষ্ণৌ-এর

বক্তৃতাতেও এই ধরনের মত প্রকাশ পেয়েছে। 'পাওনিয়র' আপনার মূল কথাগুলি উদ্ধৃত করে দেয়া সঙ্গত মনে করেছিল, 'ইয়ে বাত হিন্দুস্থান কি শান্ কে খেলাপ হৈ, ক্য উহ্ ইংলণ্ড কি কমজোরীসে ফয়দা উঠা কর্ ইস্ বক্ত সত্যাগ্রহ শুরু কর্ দে'।"(১)

সব জেনে ও বুঝে কিসের তাগিদে অথবা কোন্ প্রয়োজনে সেদিন জহরলাল ইংরেজের সমর্থনে অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তা আজ আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু ইতিহাস একদিন হয়তো একথা জানতে চাইবেই।

শুধু বাংলায় নয়, নাগপুরের পথে পেলাম এই একই পরিচয়, আর নাগপুরেও। ট্রেনের কামরায় কামরায় জটলা, গভীর ও গম্ভীর আলোচনা ও নিখুঁত সমর পরিস্থিতির বিশ্লেষণ শুনতে শুনতে পৌঁছে গেলাম নাগপুর।

বাংলা থেকে গিয়েছিল এক বিরাট বহর নাগপুরে। বৃদ্ধ রাজেন দেব, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, বসন্ত মজুমদার, কালী বাগচী, হরেন ঘোষ, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, হেমপ্রভা দেবী, লীলা রায়—আরও অনেকে। কিন্তু আর কত-অনেকে থাকল পেছনে পড়ে, তার হিসাবও আমাদের কাছে ছিল। তারা থাকল চেয়ে নাগপুরের দিকে। কারা-প্রাচীরের অন্তরাল থেকে।

"কংগ্রেসের দেশ নয়, দেশের কংগ্রেস। দেশের আসন্ন মুক্তি সংগ্রামে যে-কংগ্রেস নির্বিকার চিত্তে ঔদাসিন্য উপভোগ করবে পরম আরামে,—প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে। ব্যক্তির মত আর খেয়াল,—তা যত বড় হোক আর হোক মহান,—দেশ ও জাতির মুক্তির তুলনায় তার মূল্য সত্যিই কি খুব বেশী?" চকিত হয়ে উঠল বিরাট জনতা। যে কথা বলতে পারে না, বলতে শেখেনি, কণ্ঠের কাছে জমা হয়ে রয়েছে কত দীর্ঘ দিন,—তাকে যে-ব্যক্তি দিল এই অনবদ্য রূপ,

(১) জহরলাল সম্পাদিত পত্রগুচ্ছ। ৩৭৭ ও ৩৮১ পৃঃ

সহর্ষে সম্বর্ধনা না জানিয়ে ওরা স্থির থাকবে কেমন করে ? করতালি আর কণ্ঠের পুলক উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে সভাস্থল।

"সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। প্রয়োজন শুধু একে সম্প্রসারিত করা, ব্যাপক করা, দুর্বার করা। গান্ধী কিংবা জহরলাল কিম্বা আজাদ,—দেশ শুধু এঁদেরই নয়। দেশ আমাদেরও। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর। কে এল আর কে এল না, এ হিসেব-নিকেশ শেষ হয়ে গেছে। যদি আর কেউই না আসে, আমি একা হব আমার মুক্তিকাম দেশের সংগ্রামী প্রতিনিধি। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহী ভারতবর্ষ ইংরেজের প্রভুত্ব অস্বীকার করে যে ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরেছিল নিজের বুকের ওপর, সেই ঝাণ্ডা বহন করে চলব একা…" ।(১)

একটা প্রদীপ্ত মশাল জ্বলে উঠল আঁধার-ঘেরা ভারতের বুকের ওপর। আলোকের ঝর্ণা ধারায় পরিস্ফুট হয়ে উঠল চলার পথ, ইসারায় যে পথ হয়ে উঠেছে উন্মুখ।

নাগপুর-সম্মেলন সমাপন করে নেতা চললেন ওয়ার্ধার পথে। গান্ধীর ওয়ার্ধা। ভারতবর্ষের গান্ধী।

১৯৪০ এর ২০শে জুন।

শেষবারের মত বর্তমান ভারতের দুজন শক্তিমান স্রষ্টা মুখোমুখী বসে আছেন আশ্রমের এক নিভৃত কক্ষে।

নিঃশব্দ কিন্তু মুখর শান্তি আশ্রমের চারদিকে। মুখরতা শব্দের নয়,—কর্মের। মুখরতা চিন্তার। কুটীরে কুটীরে চলে নীরব কর্মের একাগ্র সাধনা। সদ্য বর্তমানের রূঢ় বাস্তবতা আর অজানা ভবিষ্যতের কল্পরূপ ফুটে ওঠে কর্মীদের মনের কন্দরে।

হারিয়ে যাওয়া সনাতন ভারতবর্ষের জীবন-তন্ত্রীর ক্ষীয়মান প্রত্যন্ত

(১) নাগপুরে সম্মেলন-শেষের উপসংহার-বক্তৃতার অংশ।

আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এক নগ্ন-তনু পরিশ্রান্ত পথিক,—একক, সঙ্গীহীন, সমর্থকহীন। চারিদিকে পাঁতি পাঁতি করে খোঁজে দুটি শ্রান্ত আঁখি। ব্যথা-কাতর দুটি চোখের কোণে উদাস বিষণ্ণতা ঘন হয়ে আসে। জহরলাল, প্যাটেল, রাজেনবাবু,—কেউ নেই পাশে। সবাই হারিয়ে গেল। কর্মযোগের শেষ অধ্যায় কি ঘনিয়ে এল ?

সামনে ব'সে সুভাষ। প্রদীপ্ত যৌবন। অস্থির উন্মাদনায় টগ্‌বগ্‌ করে। অসহিষ্ণু, বেপরোয়া, উদ্দাম সুভাষ। কিন্তু উনিও একা। কেউ নেই সাথী। ওঁর ঐ দুর্দান্ত স্বপ্ন আর কল্পনার সঙ্গী হবে কে ? কেউ কি আছে ?

তাকিয়ে থাকেন গান্ধী অপলক চোখে সুভাষের দিকে। ঢল ঢল লাবণ্য-ভরা মুখ,—কিন্তু ওর নীচে ? পীড়নের, অবিচারের, আঘাতের ক্ষত-চিহ্ন রয়েছে না ওর পরতে পরতে ? তাকিয়ে থাকেন গান্ধী। ভালোবাসতে চেয়েছেন ঐ রূপকে, কিন্তু গান্ধী জানেন তিনি তা পারেন নি।

কংগ্রেস ওঁর আসন কেড়ে নিয়েছে। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে তার এলাকা থেকে। তবু উনি আসেন। ডাকলে আসেন। আর না ডাকলেও। কিন্তু কেন ? কেন আসেন ? কেন গান্ধীকে ভুলতে পারেন না ? কেন ওঁর মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগে না ? গান্ধী আরও নিবিড় হতে থাকেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেতরে যেয়ে খুঁজতে থাকে অন্তরের অদেখা অলিগলি।

একটার পর একটা। ছেঁড়া নয়। পারম্পর্যে গাঁথা। বিশ্লেষণে, যুক্তিতে অকাট্য। গান্ধী কান খাড়া করে শোনেন সুভাষের প্রতিটি কথা। ইতিহাসের নিঃসংশয় ইঙ্গিত আর উপসংহার ফুটে ওঠে কথার ভেতর দিয়ে। ইংরেজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, তার ঐতিহ্য, তার অতীত ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী,—কোনটাই বাদ যায় না।

ইংরেজ গান্ধীকে চায়। কিন্তু সভয়ে পরিহার করে চলে গান্ধী-বাদ। গান্ধী-বাদের মূল সূত্রের সঙ্গে রয়েছে অবিনাশী ভারতবর্ষের শাশ্বত রূপের

খানিকটা সম্পর্ক। ওকে পুনর্জীবিত দেখতে ইংরেজ চাইবে কোন সাহসে? কিন্তু জননায়ক লোকপ্রিয় গান্ধীকে সে অমনি চায় না,—চায় একান্ত প্রয়োজনে। আত্মরক্ষার চাহিদায়। ইংরেজ গান্ধীকে অবজ্ঞা করে দেখেছে। অপমানিত করে দেখেছে। দেখেছে ব্যঙ্গ আর বিদ্রুপের রঙ্গীন আলোয়। সেই গান্ধীকে তুষ্ট করে যদি বর্তমানের এই দুর্নিবার বিপদে সে বিন্দুমাত্রও স্বস্তি পায়, তা সে অগ্রাহ্য করতে চায় না।

চিরদিন ইংরেজের দুটো হাত থাকে দুধারে। একহাত থাকে বিপক্ষের গলায়, অন্য হাত পায়ে। প্রয়োজনে পায়ে-রাখা হাতখানা গলায় উঠে আসতে সময় লাগে না। দুহাতে টিপে ধরে বিপক্ষের কণ্ঠনালী। শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করে। আবার গলার হাতখানা পায়ে অবলীলায় নাবিয়ে আনতেও তার জুড়ী নেই। যে-দুটো হাত জোড় হয়ে দাঁড়িয়েছে গান্ধীর সামনে, সেই হাত দুখানাই একদিন গান্ধীর গলা টিপে ধরেছিল।

১৯২১ থেকে ১৯৪০। দীর্ঘ বিশ বছরে ওর কি বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়েছে? হয়েছে কি হৃদয়ের পরিবর্তন? ১৯৩৫এর অসার শাসন সংস্কার: অমন ছিটে-ফোটা বদান্যতা আর দাক্ষিণ্য গান্ধী পেতে পারতেন ১৯২১এ, ১৯২৪এ, ১৯৩০এ।

জহরলাল ইংরেজের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। যারা ছিল গান্ধীর একান্ত ভরসা আর বিশ্বাসের পাত্র তাদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি জাঁকিয়ে বসেছেন। গান্ধীর প্রস্তাব উপেক্ষা করতে ১৯৪০এ ওয়ার্কিং কমিটির আর বাধে না। অসহায় ইংরেজ যদি কংগ্রেসের দাবী শোনবার ও মানবার প্রয়োজনীয়তা বোধ না করে, সত্যিই যদি ইংরেজের দুর্দিন কেটেই যায়,—তখন? বিজয়ী ইংরেজের গর্ব ও স্পর্ধার সেই অসহ্য প্রভুত্বের সামনে আরও কি কংগ্রেসের দাবী বলে কিছু থাকবে?

কংগ্রেস হাত গুটিয়ে বসে আছে। কিন্তু ইংরেজ? বিনা বিচারে

বিনা অজুহাতে খেয়াল আর খুশি মত সে তার অবাধ চণ্ডনীতি প্রয়োগ করে চলেছে। হাজার হাজার কর্মী কারাগারে আর নির্বাসনে। ইংরেজ-বিরোধী আওয়াজের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সভা নেই। মিছিল নেই। সংবাদ পত্র জড়সড়। লেখনী স্তব্ধ। লেখক সন্ত্রস্ত। সত্যিই যদি গান্ধীর আকাঙ্ক্ষিত সত্যাগ্রহের সম্ভাবনা দেখা দেয়ই, কাদের নিয়ে সেদিন তিনি সংগ্রামে নামবেন? সংগ্রামী ভারতবর্ষ সেদিন-যে থাকবে ইংরেজের কারা-প্রাচীরের অন্তরালে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে গান্ধীর সমগ্র সত্তা। জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস আর অনন্য সঙ্কল্প রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে গান্ধীর সম্মুখে। গান্ধী চোখ ফেরাতে পারেন না। নিমেষহীন দৃষ্টি তাঁর পড়ে থাকে সুভাষের মুখের ওপর। গান্ধী শোনেন। গান্ধী বোঝেন। গান্ধী জানেনও। কিন্তু।

কিন্তু গান্ধী নিরুপায়।

বিদায়ের ক্ষণ এসে পড়ে। নেতা বিনত হয়ে গান্ধীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেন,—"আমার মতে আপনাকে ভেড়াতে আমি আসিনি। আমি এসেছি আপনার আশীর্বাদ নিতে।"

বিস্ফারিত দুটি চক্ষু সজল হয়ে উঠতে চায়। তাকিয়ে থাকেন মহানায়ক প্রদীপ্ত চঞ্চল রূপ-ধরা সদ্য বর্তমানের দিকে। সুভাষের দিকে। সুভাষ উঠে দাঁড়ান। আবার বলেন,—"চলতে আমায় হবেই। একা হলেও। তাই চাই আপনার আশীর্বাদ।"

উঠে দাঁড়ান গান্ধী। হাতে তুলে নেন যষ্ঠী। চলতে চলতে বলেন,—"আশীর্বাদ থাকবে আমার চিরদিন। তোমার এই যাত্রা যদি সফল হয়, সকলের আগে আমিই করব তোমায় সাদর অভ্যর্থনা।"(১)

ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তখনও তার পরিপূর্ণ রূপ ফুটে ওঠেনি। তবু এটা বুঝতে পারা গিয়েছিল যে,

(১) ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্ ১৯৩৫—৪২, ৩৪ পৃঃ

এমন একটা কিছু করতেই হবে যার ফলে একদিকে বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল লিগ-মন্ত্রী-সভার গায়ে লাগবে তীব্র আঘাত, অন্যদিকে দেশের বুকে যে অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছিল, তাও অনড় হয়ে থাকবে না। কংগ্রেসের মৌনতা ইংরেজকে সাহসী করে তুলেছিল। নেতাদের, বিশেষ করে জহরলালের দ্বিমুখী বচন-ভঙ্গী শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার পক্ষেই যথেষ্ট বলে সেদিন মনে হয়নি, পরন্তু অপ্রস্তুত ও মার-খাওয়া ইংরেজকে প্রস্তুত হতে এবং সৈন্য ও রসদ সংগ্রহে প্রত্যুৎসাহীও করেছিল বিলক্ষণ।

নাগপুর-সম্মেলনে নেতার কণ্ঠে এক বিশেষ ও নতুন বাণী ফুটে উঠল। আর দ্বিধা নয়। নয় কোনও অসংলগ্ন অস্পষ্ট ঘোলাটে মতবাদ। অনাবৃত নিষ্কলুষ সত্য নিজের রূপে স্বমহিমায় ফুটে উঠুক। বিশ্বের সবাই জানুক ভারতবর্ষ কী চায়।

"'ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেবলমাত্র ভারতবাসীর।' (All Power to the Indian people.) এই অগ্নিগর্ভ কথায় সমগ্র দেশ চকিত হয়ে উঠবে। এই দাবী অপ্রতিহত ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে চাই জাতির সামগ্রিক একপ্রাণতা।"(১)

ঢাকার বহু মুশলমান যুবক এ-আশ্বাস নেতাকে দিয়েছিল যে, যদি অন্ধকূপহত্যার মিথ্যা ও কলঙ্কী স্মৃতিচিহ্ন অপসারিত করতে কোন প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলা হয়, তার ন্যায্য অংশ মুশলমান ছেলেরাও হৃষ্ট মনেই গ্রহণ করবে।

ইংরেজের সমর-প্রচেষ্টা বানচাল করবার জন্যে অথবা স্বাধীনতার শেষে সংগ্রামের পক্ষে হয়তো এ-আন্দোলন আদৌ যথেষ্ট নয়, কিন্তু দেশের নিস্তরঙ্গ বুকে একটা ঢেউ তোলবার কাজে এই আন্দোলন যে মোটেই নগণ্য বা অকিঞ্চিৎকর নয়, নেতার মনে এ ধারণা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আগুনের মত রাজনৈতিক আন্দোলনেরও মারাত্মক

(১) নাগপুর-সম্মেলনের সভাপতি-ভাষণের অংশ

সংক্রামকতা আছে। সামান্য একটু বাতাস, একটু ছোঁয়াচ,—দাউ দাউ করে জলে ওঠে, ছড়িয়ে পড়ে।

নাগপুর থেকে ফিরেই নেতা একটি বিবৃতির মাধ্যমে তৎকালীন পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি এবং নিজের মানস-ভঙ্গী পরিস্ফুট ও প্রাঞ্জল করে তুললেন :

"দশদিন পূর্বে আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। দেশের গণ্যমান্য অনেক রাজনীতিবিদ্ এবং নেতার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। তাছাড়া নানা প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধি-দের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেছি। ফরোয়ার্ড ব্লকের নীতি ও কর্মধারা আমি এঁদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছি এবং আলোচনার মাধ্যমে নিজেও কম উপকৃত হইনি। সব বিষয়ে মতৈক্য সম্ভবপর হয়নি নিশ্চয়ই কিন্তু বহু বিষয়ে আমরা যে-ভাবে একমত হয়েছি, তাও আমাকে কম বিস্মিত করেনি। এবং এর ফলে, আমাদের সম্মুখে যে বিরাট কর্তব্য আজ সমুপস্থিত, সে সম্বন্ধেও স্পষ্টতর ধারণা আমার মনে ফুটে উঠেছে।

"প্রথমত একটি অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেন্ট কালবিলম্ব না ক'রে আমাদের গঠন ও ঘোষণা করতে হবে। এরই প্রমুখাৎ ইংরেজ সরকারের কাছে এই মুহূর্তে দাবী জানাতে হবে যে, ভারতীয় জনগণের হাতে ভারত শাসনের সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। সমস্বরে যদি ভারতবাসী এ-দাবী জানাতে পারে, তা হবে অপ্রতিরোধ্য। আজ আর ভুয়ো প্রতিশ্রুতি নয়, কিম্বা আংশিক স্বাধিকারও নয়। আজ আমরা নির্দ্বিধায় এই ঘোষণা জানাব : 'ভারত শাসনের অধিকার এক-মাত্র ভারতবাসীর'।—All power to the Indian people.

"কেন্দ্রে মন্ত্রী-সভা গঠন করবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রদেশেও জাতীয় মন্ত্রী-সভা গড়ে তুলতে হবে। প্রাদেশিক সরকারের আনুগত্য থাকবে কেন্দ্রে। প্রাদেশিক সরকার দেশের শৃঙ্খলার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এই পরিবর্তনের সময় এবং এরই ভেতর দিয়ে হিন্দু-মুশলমানের একটা স্থায়ী

মিলন-সেতু সম্ভবপর করে তুলতে হবে। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান আদৌ যে অসম্ভব নয় এ-কথা আমি সর্বথা বিশ্বাস করি।......

"রামগড়ে যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছে তা চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম। সংগ্রামের গতি যেন শ্লথ না হয়। আমরা বিশ্বাস করিনে যে, স্বরাজ আকাশ থেকে পড়বে। আমরা আরও বিশ্বাস করিনে যে, বিনা সংগ্রামে স্বরাজ সম্ভবপর হবে। সংগ্রাম পরিত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে আব-হাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠবে। আবার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করবার মনোভাব মাথা খাড়া করে দেখা দেবে।

"ভাগ্যলিপি জাতির ললাট-ফলকে খোদিত হতে চলেছে। আমাদের চোখের সামনে রচিত হয়ে চলেছে নবতম ইতিহাস। এই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের সমগ্র ধ্যান ও ধারণা জুড়ে থাক একটিমাত্র কথা : ভারতবর্ষ। কোন দল নয়, সম্প্রদায় নয়, ব্যক্তি নয়। ভারতবর্ষের মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও দল বা ব্যক্তির ত্যাগ ও দুঃখ বরণই যথেষ্ট নয়, এই কথাটা সর্বক্ষণ আমরা যেন জপ করতে পারি।"(১)

কিন্তু ইংরেজ ? হয়তো আরও কিছুকাল ইংরেজ চুপ করেই থাকত কিন্তু থাকতে দিলেন না নেতা। ২৯শে জুন ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় লিখলেন নিজের নাম-সই করা এক প্রবন্ধ :

"আমাদের এ-সংখ্যা বের করতে অপরিহার্য কারণে দেরি হয়ে গেল। একটা সপ্তাহ নষ্ট করতে আমরা বাধ্য হয়েছি এবং এটা ঘটেছে আমাদের সদাশয় বঙ্গীয় সরকারের বদান্যতায়। আমাদের আফিসে খানাতল্লাসি চালানো হয়েছিল। আমাদের জামিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যা বের করবার পূর্বে নতুন ক'রে আরও দুহাজার টাকার জামিন জমা দিতে হয়েছে।

"ভালোই হয়েছে। এতে ক'রে আমাদের সঙ্কল্প হয়ে উঠবে আরও দৃঢ়তর। আমাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে আমরা আরও

(১) নেতার ইস্তাহার : ২৯শে জুন, ১৯৪০

বেশি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠব। প্রাণে বইবে আমাদের উদ্দীপনা আর প্রেরণার বন্যা।

"ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলন হলওয়েল মনুমেন্ট উৎখাত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। সে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করবার দায়িত্ব আমাদের। ৩রা জুলাই (১৯৪০) সমগ্র বাংলায় সিরাজদ্দৌলা-দিবস প্রতিপালিত হবে। বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি আমরা ঐদিন পুজো করব। হলওয়েল মনুমেন্ট শুধু নবাব সিরাজদ্দৌলার স্মৃতিকেই অকারণে মসীলিপ্ত করেনি, পরন্তু বিগত দেড়শত বৎসর ধরে সমগ্র জাতির দাসত্ব ও অবমাননার সাক্ষ্য হয়ে কলকাতার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওর চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলতে হবে।

"আগামী ৩রা থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে। আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, প্রথম দিনের বাহিনী পরিচালনা করব আমি নিজে।"

৩রা জুলাই, ১৯৪০, এগিয়ে আসে দ্রুত। প্রকাশ্য আলোচনা আর গোপন সভায় ভরে ওঠে কলকাতার মাঠ-ঘাট, আনাচ-কানাচ। জেলায় জেলায় পৌঁছে যায় নেতার সঙ্কল্পের কথা। কর্মীরা তৈরী হয়।

২রা জুলাইএর সংবাদ পত্রে বিশেষ স্থানে প্রকাশিত হয় নেতার কর্মসূচী। ৩রা মধ্যাহ্নে প্রথম অভিযান। অপরাহ্ণে এ্যালবার্ট হলে জন সভা। ভাষণ দেবেন নেতা একা। সেখান থেকে টাউন হলে, মুশলিম ছেলেদের সভায়।

* * *

৩রা জুলাইএর প্রভাতী সংবাদ : সুভাষচন্দ্র বন্দী।

সাহায্য নেওয়া বই ও পত্র-পত্রিকার তালিকা :—

সুভাষচন্দ্র বসু— ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল, ১ম ও ২য় খণ্ড,
এ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম,
ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের
সভাপতির ভাষণ (১৯৩৩),
সভাপতির ভাষণ, ফিয়ার্স হল, লণ্ডন। (১৯৩৩),
এডেন ও মধ্য প্রাচ্য,
ইজিপ্ট ভ্রমণ-কাহিনী,
ইজিপ্টের পিরামিড,
কালচারাল কংকোয়েষ্ট,
মাই ষ্ট্রেন্‌জ্‌ ইল্‌নেস,
গান্ধী ও রোমা রঁলা,

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু—ডিস্‌কভারী অব ইণ্ডিয়া,
বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স,
আত্মজীবনী,
পত্র-গুচ্ছ,

আবুল,কালাম আজাদ—ইণ্ডিয়া উইন্‌স্‌ ফ্রীডম্‌,

ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া—কংগ্রেসের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড,

জন গান্থার— ইনসাইড এশিয়া,

ঈভ কুরী— জার্নি এ্যামং ওয়ারিয়ার্স,

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য—কংগ্রেস-সংগঠনে বাংলা,

শ্রীদুর্লভ সিং— দি রিবেল প্রেসিডেন্ট,

গান্ধীজিকে লেখা খাজা নাজিমুদ্দীনের পত্র, ১৯৩৮,
খাজা নাজিমুদ্দীনকে লেখা গান্ধীজির পত্র, ১৯৩৮,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
অমৃতবাজার পত্রিকা,
বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত
বিবৃতি, বিবরণ ও মন্তব্য ইত্যাদি,
ফরওয়ার্ড ব্লক (সাপ্তাহিক)

এই গ্রন্থকারের লেখা :

দেশের ডাক

বিদ্রোহী আয়র্লণ্ড

বক্তৃতা বিজ্ঞান

বাংলার মন্বন্তর